গল্প-সংগ্রহ

কমলকুমার মজুমদার প্রণীত

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা ৯

উ ৎ স র্গ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহকে

সূচিপত্র

লাল জুতো

গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার দরুন কিছু ভাল লাগছিল না। মনটা বড্ড খারাপ,— নীতীশ ভাবতেই পারছে না, দোষটা সত্যিই কার। অহরহ মনে হচ্ছে— আমার কি দোষ? জীবনে অমন মেয়ের সঙ্গে সে কখনই কথা বলবে না।

দক্ষিণ দিককার বারান্দা দিয়ে যতবার যায় ততবারই দেখে, গৌরী পর্দা সরিয়ে এদিক পানে চেয়ে আছে, ওকে দেখলেই পলকে পর্দা ফেলে দেয়। এ চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মনটা সদা চঞ্চল হয়ে রয়েছে; কি করে, কোথায় বা যায়? কোন কাজেই মন টিঁকছে না! অবশেষে বিকেল বেলা মনে পড়ল— জুতোজোড়া নেহাৎ অসম্মানজনক হয়ে পড়েছে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে ঠাকুমার কাছে ব্যাপারটা বলতে— টাকা পাওয়া গেল।

নিজের জিনিস নিজে কেনার মত স্বাধীনতা বোধ হয় আর কিছুতেই নেই, অথচ মুশকিলও আছে যথেষ্ট। যদিও সরকার মশায়ের গ্রাম্য পছন্দের আওতায় নিজের একটা স্বাধীন পছন্দ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে বিশ্বাস নেই— কি জানি যদি ভুল হয়? যদি দিদিরা বলে, 'ওমা এই তোর পছন্দ?' সিদ্ধান্ত যদি হয়— 'তা মন্দ কি বাপু বেশ হয়েছে, ঘষে-মেজে অনেক দিন পায় দিতে পারবে 'খন!' এর চাইতে গুরু শ্লেষ আর কি হতে পারে? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে নীতীশ রাস্তা দিয়ে চলেছে। ছোট দোকানে যে তার পছন্দসই জুতো পাওয়া যেতে পারে না, এ ধারণা তার বদ্ধমূল, তাই বেছে বেছে একটা বড় দোকানে গিয়ে উঠল।

জুতোওয়ালা এমন করে কথা বলে, যে তার উপর কথা বলা চলে না, মনেহয় যেন ও কথাগুলো নীতীশের। যে জুতোজোড়া পছন্দ হল, সেটা সোয়েড আর পেটেন্ট লেদারের কম্বিনেশান। ক্লাসের ছেলেরা হিংসে করে মাড়িয়ে দিতে পারে, গৌরীর মনে হতে পারে, কেন ছেলে হয়ে জন্মালুম না?

দাম ছ-টাকা; ঠিক পাঁচ টাকাই তার কাছে আছে। দর-কষাকষি করতে লজ্জা হয়, পছন্দ হয়নি বলে যে অন্য দোকানে যাবে তারও জো নেই, কারণ

শুধু তার জন্যে অতগুলো বাক্স নামিয়ে দেখিয়েছে। আজকাল তো সবকিছুই শস্তা, কিছু কম বললে দেয় না? ইচ্ছে আছে, কিছু পয়সা যদি সম্ভব হয় তো বাঁচিয়ে একখানা মোটা খাতা কিনবে, গৌরীর হাতের লেখা ভাল, ভাব হলে, তার উপর সে মুক্তোর মত অক্ষরে বসিয়ে দেবে— নীতীশ ঘোষ— সেকেণ্ড ক্লাস… অ্যাকাডেমি।

লজ্জা কাটিয়ে বলে ফেললে, সাড়ে-চারে হয় না?

জুতোওয়ালা বললে, আপনার পায়ে চমৎকার মানিয়েছে, একবার আয়নায় দেখুন না, দরাদরি আমরা করি না।

নীতীশ পিছন ফিরে আয়নার দিকে যেতে গিয়ে দেখে, নিকটে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, যার বয়েস সে আন্দাজ ঠিক করতে পারে না, তবে তার দাদার মত হবে; যাকে আমরা বলব আটাশ হতে তিরিশের মধ্যে; তাঁর হাতে ছোট্ট ছোট্ট দুটি জুতো, কোমল লাল চামড়ার। দেখে ভারী ভাল লাগল— জুতোজোড়া সেই নরম কোমল পায়ের, যে পা দু'খানি আদর করে স্নেহভরে বুকে নেওয়া যায়, সে চরণ পবিত্র, সুকোমল, নিষ্কলুষ।

সহসা যেমন দুর্ব্বার দখিন হাওয়া আসে, তেমনি এল অজানা মধুর আনন্দ, ওই কিশোর নীতীশের বুকের মধ্যে ছোট লাল জুতো দেখলে ওর যে বিপুল আনন্দ হতে পারে, একথা ওর জানা ছিল না— জানতে পেরে আরও খুশি হল, খুশিতে প্রাণ ছেয়ে গেল। ইচ্ছে হল, জুতোজোড়া হাতে করতে, ইচ্ছে হল হাত বুলোতে। কোন রকমে সে লজ্জা ভেঙে বললে, মশাই দেখি, ওই রকম জুতো।

ক-মাসের ছেলের জন্যে চান?

ভীষণ সমস্যা, ক-মাসের ছেলের জন্যে চাইবে? বললে, ছ-সাত, না না, আট-দশ মাসের আন্দাজ।

একটি ছোট্ট বাক্স, তার মধ্যে ঘুমন্ত দুটি জুতো, কি মধুর! নীতীশের চোখের সামনে সুন্দর দুটি মঙ্গল চরণ ভেসে উঠল। মনে হল, ও পা-দুটি তার অনেক দিনের চেনা, অনেক স্বপ্নমাখা আনন্দ দিয়ে গড়া। হাসি চাপতে পারলে না, হাসি যেন ছুটে আসছে, না হেসে থাকতে পারল না।

মনে করতে লাগল, কার পায়ের মত? কার পা? কিছুতেই মনে আসছে না, টুটুল? না— টুটুল তো বেশ বড়। ইচ্ছে হল জুতোজোড়া কিনে ফেলে। জিগ্গেস করল, ওর দাম?

এক টাকা।

নিজের টাকা দিয়ে কিনতে ইচ্ছে হল, কিন্তু সাহস হল না। কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকাও যে তার কাছে এখন নেই, হয়ত কিছু শস্তায় হতে পারে। কি করা যায়, ‘কি হবে কিনে?’ বলে বিদায় দেওয়া যায় না? যা[illegible] পেলে কেনা যাবে। নিজের জুতো কেনাও হল না, দরে পোষা[illegible] সে উঠে যাচ্ছে, তখন তার মনে হল, পিছন থেকে জুতোজোড়া তাকে টানছে, বিপুল তার টান! যেন ডাকছে, কি মোহিনী শক্তি! একবার মনে হল কিনে ফেলে, কি আর বলবে, বড়জোর বকবে, তবুও সাহস হল না।

চিরকাল সে ছোট ছেলে দেখতে পারে না, ছোট ছেলে তার দু’চক্ষের বিষ, ভেবেই পেত না টুটুলকে কি করে বাড়ির লোকে সহ্য করে…কি করে লোকে ছোট ছেলেকে কোলে নেয়? নিজের ওই স্বভাবের কথা ভেবে লজ্জা হল, তবু—তবু ভাল লাগছিল, যতবার ভুলবার চেষ্টা করে ততবার ভেসে আসে সেই লাল জুতো— মধুর কল্পনা। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই লাল জুতোর পানে দেখে সে আস্তে আস্তে দোকান থেকে বার হয়ে এল।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত অসম্ভব কল্পনাই না তার মনে জাগছিল। তার মনে তখন, পিতা হবার দুর্ব্বার বাসনা। গৌরীর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তাহলে? বেশী ছেলে-মেয়ে সে পছন্দ করে না, একটি মেয়ে সুন্দর ফুটফুটে দেখতে, কচি-কচি হাত-পা, মনের মধ্যে অনুভব করল, যেন একটা কচি-কচি গন্ধও পেল। গৌরী সন্ধেবেলায়, প্রায় অন্ধকার বারান্দায় বসে, রূপোর ঝিনুকে করে তাকে দুধ খাওয়াবে: ঝিনুকটা রূপোর বাটিতে বাজিয়ে বাজিয়ে বলবে, আয়-চাঁদ আয় চাঁদ— কি মধুর! আকাশে তখন দেখা দেবে একটি তারা।…আমায় বাবা বলে ডাকবে, শুনতে পেল— ছোট দুটি বাহু মেলে আধো-আধো গদ্‌গদভাবে ডাকছে, বাবা— হাতে দুটি সোনার বালা। দেখতে যেন পেল, গৌরী তাকে পিছন থেকে ধরে দাঁড় করিয়েছে, মাঝে-মাঝে শিশু টাল সামলাতে পারছে না, উল্লাসে হাতে হাত ঠেকছে, হাসি-উচ্ছল মুখ। আমি হাত দুটো ধরে বলব, ‘চলি-চলি পা-পা টলি-টলি যায়, গরবিনী আড়ে আড়ে হেসে হেসে চায়।’…

কি নাম হবে? গৌরী নামটা পৃথিবীর মধ্যে নীতীশের কাছে মিষ্টি, কিন্তু ও নামটা রাখবার উপায় নেই, লক্ষ-লক্ষ নাম মনে করতে করতে সহসা নিজের লজ্জা করতে লাগল, ছি-ছি সে কি যা-তা ভাবছে! কিন্তু আবার সেই বাহু মেলে কে যেন ডাকল—‘বাবা’।

না, ছেলেমেয়ে বিশ্রী, 'বিশ্রী' শুধু এই ওজর দিয়ে প্রমাণ করতে হল যে— যদি টুটুলের মত মধ্যরাতে চীৎকার করে কেঁদে উঠে— উঃ কি জ্বালাতন!

যে জুতো দেখে ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল সেই লাল জুতো-জোড়ার কথা সকলকে বলে, কিন্তু সঙ্কোচও আছে যথেষ্ট, পাছে গৌরীকে নিয়ে যা কল্পনা করেছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদিও প্রকাশ হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তবুও মনে হচ্ছিল, হয়ত প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। একেই তো গৌরী এলে, ঠাকুমা থেকে আরম্ভ করে বাড়ির সকলে ঠাট্টা করে। ঠাট্টা করার কারণও আছে: একদা স্নানের পর তাড়াতাড়ি করে নীতীশ ভাত খেতে গেছে, ঠাকুমা বললেন— নীতীশ তোর পিঠময় যে জল, ভাল করে গাটাও মুছিস নি? পাশেই গৌরী দাঁড়িয়েছিল, সে অমনি আঁচল দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিলে পরম স্নেহে— অবশ্য নীতীশ তখন ভীষণ চটেছিল। এই রকম আরও অনেক ব্যাপার ঘটেছিল যাতে করে বাড়ির মেয়েদের ধারণা, নীতীশের পাশে গৌরীকে বেশ মানায়— বিয়ে হলে ওরা সুখী হবে এবং তাই নিয়ে ওঁরা ঠাট্টাও করেন।

কি করে, আর কাউকে না পেয়ে নীতীশ তার বড়বৌদিকে বললে, জানো বড়বৌদি, আজ যা একজোড়া জুতো দেখে এলুম, ছোট্ট জুতো, টুটুলের পায়ে বোধহয় হবে— কি নরম, তোমায় কি বলব! দাম মাত্র একটাকা! অবশ্য নীতীশের ভীষণ আপত্তি ছিল টুটুলের নাম করে অমন সুমধুর ভাবনাটাকে মুক্তি দেওয়ার, কিন্তু বাধ্য হয়ে দিতে হল।

বৌদি বললেন, বেশ, কাল আমি টাকা দেব'খন— তুমি এনে দিও।

মনটা ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হল, কি জানি সত্যি যদি আনতে হয়— শেষে কিনা টুটুলের পায় ওই জুতোজোড়া দেখতে হবে! তবে আশা ছিল এইটুকু যে, বৌদি বলার পরই সব কথা ভুলে যান।

নীতীশ পড়ার ঘরে গিয়ে বসল। পড়ায় আজ তার কিছুতেই মন বসছিল না, সর্ব্বদা ওই চিন্তা। তার কল্পনা অনুযায়ী একটি শিশুর মুখ দেখতে ভয়ানক ইচ্ছে হল— এ বই সে বই ঘাঁটে, কোথাও পায় না, যে শিশুকে সে ভেবেছে তার ছবি নেই— কোথায়? কোথায়?

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে গৌরীর গলা পাওয়া গেল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে কথা বলছে। প্রতিবার ঝগড়ার পর নীতীশ এ ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেছে, গৌরীকে সে বুঝতে পারে না। হয়ত গৌরী আসতে পারে, এই ভেবে সে বইয়ের

দিকে চেয়ে বসে রইল।

উদ্দাম দুর্ব্বার বাতাসে ত্রাসে কেঁপে ওঠে যেমন দরজা জানলা, গৌরী প্রবেশ করতেই পড়ার ঘরখানা তেমনি কেঁপে উঠল। হাসতে হাসতে ওর কাঁধের উপর হাত দিয়ে বললে, লক্ষ্মীটি আমার উপর রাগ করেছ?

কথাটা কানে পৌছতেই রাগ কোথায় চলে গেল!

রাগের কারণ আছে। গৌরী ফোর্থ ক্লাসে উঠে ভেবেছে যে সে একটা মস্ত কিছু হয়ে পড়েছে— অঙ্ক কি মানুষের ভুল হয় না? হলেই বা তাতে কি? প্রথমবার নয় পারেনি, দ্বিতীয়বার সে তো রাইট করেছে। না পারার দরুন গৌরী এমনভাবে হাসতে লাগল এবং এমন মন্ত্র উচ্চারণ করলে যে অতি বড় শান্ত ভদ্রলোকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, নীতীশের কথাতো বাদই দেওয়া যাক।

নীতীশের রাগ পড়েছিল, কিন্তু সে মুখ তুলে চাইতে পারছিল না; সেই কল্পনা তার মনের মধ্যে ঘুরছিল।

রাগ করেছ? আচ্ছা আর বলব না, কক্ষনো বলব না— বাবা বলিহারি রাগ তোমার! কই আমি তো তোমার উপর রাগ করিনি?

মানে? আমি কি তোমায় কিছু বলেছি যে রাগ করবে?

গৌরীর এইসব কথাগুলো শুনলে ভারী রাগ ধরে, কিছু বলাও যায় না।

চুপ করে আছ যে? এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না ভাই···

অঙ্ক-টঙ্ক হবে না—

লক্ষ্মীটি তোমার দুটি পায় পড়ি!

এতক্ষণ বাদে ওর দিকে নীতীশ চাইল। ওকে দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না, সেই শিশুর মুখ; যাকে সে দেখেছিল নিজের ভিতরে, অবিকল গৌরীর মতই ফর্সা— ওই রকম সুন্দর চঞ্চল, কাল চোখ!

কি দেখছ?

লজ্জা পেয়ে ওর অঙ্কটা করে দিলে। তারপর নানান গল্পের পর, লাল জুতো-জোড়ার কথা ওকে বলে বললে, কি চমৎকার! মনে হবে তোমার সত্যি যেন ছোট্ট ছোট্ট দুটো পা।

ছোট্ট দুটি চরণ কল্পনা করে গৌরীর বুকও অজানা আনন্দে দুলে উঠল— যে আনন্দ দেখা দিয়েছিল নীতীশের মনে। গৌরী বললে, আচ্ছা কাল তোমায় আমি পয়সা দেব, আমার টিফিনের পয়সা জমানো আছে— কেমন?

নীতীশ ভদ্রতার খাতিরে বললে, তোমার পয়সা আমি নেব কেন?

কথাটা গৌরীর প্রাণে বাজল, সে অঙ্কের খাতাটা নিয়ে, বিলম্বিত গতিতে চলে গেল। নীতীশ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

দিন দুয়েক গেল পয়সা সংগ্রহে। এই দু'দিনের মধ্যে গৌরী এ বাড়ি আর আসেনি। ঠাকুমা জিগ্‌গেস করলেন, নীতীশ, গৌরী আসে না কেন রে ?

আমি কি জানি ?

কথাটা ঘরে থেকে শুনেই গৌরী তৎক্ষণাৎ গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল।

ঠাকুমা বললেন, আসো না কেন ?

জ্বর।

জ্বর কথাটা নীতীশকে মোটেই বিচলিত করল না, ও জানে, ওটা একটা ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয়।

টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জুতোজোড়া আনতে। রাস্তা থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে নিলে, কারণ হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, প্রতি মোড়ে মোড়ে গুণে দেখতে লাগল পয়সা ঠিক আছে কিনা।

জুতোর দোকানে ঢুকেই বললে, দিন তো মশাই সেই লাল জুতো ; সেই যে, সেদিন দেখে গিয়েছিলুম ?

দোকানদার একজোড়া দেখালে। ও বললে, না— না, এটা নয়, দেখুন তো ওই শেলফে ?

পাওয়া গেল সেই স্বপ্নময় জুতো ! কি জানি কেন আরো ভাল লাগল— ওর মধ্যে কি যেন লুকিয়ে আছে। চিত্তের মধ্যে একটি হিংস্র আনন্দ দেখা দিল— দর নিয়ে গোল বাধল না, একটি টাকা দিয়ে জুতোজোড়া নিলে। জুতোওয়ালা বললে, আবার আসবেন। মনে হল বোধহয় ঠকিয়েছে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেক বার ইচ্ছে হল বাক্সটা খুলে দেখে— কিন্তু পারল না। একবার মনে হল, এ দিয়ে কি হবে ? কার জন্যেই বা কিনল ? সে কি পাগল ! মিথ্যে মিথ্যে টাকা তো নষ্ট হল ?

ভিতর হতে কে যেন উত্তর দিল, 'কেন, টুটুলের পায় যদি হয় ?' টুটুলের কথা মনে হতেই একটু ভয় হল, যদি তার পায় সত্যিই হয়, তাহলেই তো হয়েছে। আবার প্রশ্ন, কিন্তু কার জন্যে সে কিনেছে ? বেশ ভাল লাগল বলে কিনেছি ! ভাল লাগে বলে তো মানুষ অনেক কিছু করে, বাজী পোড়ায়, গঙ্গায় গয়না ফেলে— এ তবু, একজোড়া জুতো পাওয়া গেল তো। বাজে খরচ হয়নি,

বেশ করেছে, একশো বার কিনবে। সহসা জিহ্বায় দাঁতের চাপ লাগতেই মনে পড়ল, কেউ যদি মনে করে তাহলে জিব কাটে, কে মনে করতে পারে? গৌরী? আজ গৌরীকে ডেকে দেখতে হবে।

বাড়িতে পৌঁছে, সকলকে মূল্যবান জিনিসটা দেখাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস হল না, যদি ঠাট্টা করে? প্রথমত সে নিজেই ঠিক করতে পারছে না, —করে জন্যে কিনল, কেন কিনল?

টুটুল বারান্দায় তখন খেলা করছিল, তার পায়ের মাপটা নিয়ে জুতোটা মেপে দেখল, টুটুলের পা কিঞ্চিৎ বড়— কিন্তু ওর মনে হল অসম্ভব বড়! শঙ্কিত চিত্তে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বললে, তোমাদের সেই লাল জুতোর কথা বলেছিলুম, এই দেখ।

ভাঁড়ার ঘর হাসি উচ্ছলিত! ঠাকুমা বললেন, ওমা— কোথায় যাব, ছেলে না হতেই জুতো! হৈ-হৈ পড়ে গেল। নীতীশের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বললে, আমি টুটুলের জন্যে এনেছিলুম···

কে শোনে তার কথা! বুঝতে না পেরে, পড়ার ঘরে গিয়ে আলোটা জেলে বসল। সামনে জুতোজোড়া, প্রাণভরে দেখতে লাগল। এ দেখা, যেন নিজেকে দেখা। ভাবলে, গৌরীকে কি করে ডাকা যায়?

গৌরী গোলমাল শুনে, জানলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখছিল— ব্যাপারটা কি সে বুঝতে পারেনি। মনে হচ্ছিল, নীতীশ একবার ডাকে না?

সহসা চিরপরিচিত ইশারায়— না থাকতে পেরে নেমে এল, আসতেই নীতীশ বললে, তোমায় একটা জিনিস দেখাব, দাঁড়াও।

গৌরী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর দিকে চাইল। নীতীশের শার্ট বোতাম-হীন দেখে বললে, তোমার গলায় বোতাম নেই, দেব?

দাও।

গৌরীর চুড়িতে সেফটিপিন ছিল না, শুধু একটি ছিল ব্লাউজে, বোতামের পরিবর্তে— না ভেবেই সেটা দিয়ে বুঝল ব্লাউজ খোলা, বললে,— দাও ওটা, তোমায় একটা এনে দিচ্ছি।

থাক।

থাক কেন, এনে দিই না? কাতর কণ্ঠে বললে।

থাক, বলে হাসিমুখে সে জুতোর বাক্সটা খুলে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল।

সুনিবিড় প্রেমে কালো চোখদুটো স্বপ্নময় হয়ে এল। গৌরী জুতোজোড়া দেখে, কেঁপে উঠল! তার দেহে বসন্ত-মধুর শিহরণ খেলে গেল। মনে হল, এ যেন তারই শিশুর জুতো! অস্পষ্টভাবে বললে, আঃ···! তার দেহ আনন্দে শিথিল হয়ে আসছিল। যেন কোন রমণীয় সুখ অনুভব করে, আবার বললে, আঃ।···সব কিছু যেন আজ পূর্ণ হল। নিজেদের কল্পনায় যে সুন্দর ছিল, যেন তাকেই রূপ দেবার জন্যে আজ দু'জনে আবদ্ধ হল।

নীতীশ বিস্ময় ভরে দেখে ভাবছিল, একি! পাশের বাড়িতে তখন সেতারে চলছিল তিলক-কামোদের জোড়— তারই ঘন ঝঙ্কার ভেসে আসছিল। ওই সঙ্গীত এবং এই জীবনের মহাসঙ্গীত তাদের দু'জনকে আড়াল করে রাখলে, হিংস্র বাস্তবের রাজ্য থেকে। যে কথা অগোচরে অন্তরের মধ্যে ছিল, সে আজ দুলে-দুলে উথলে উঠল। বহু জনমের সঞ্চিত মাতৃস্নেহ— মাতৃত্ব।

দেখতে পেল, সুন্দর অনাগত শিশু, যে ছিল তার কল্পনায়; অঙ্গটি তার মাতৃ-স্নেহের মাধুর্য্য দিয়ে গড়া, যাকে দেখতে অবিকল নীতীশের মত; তার আত্মা যেন শিশুর তনুতে তনু নিল। ইচ্ছে করল বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে— বুকে জড়িয়ে ধরে বেদনা-মাখা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে। জুতো দুটোয় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে সহসা গভীর ভাবে চেপে ধরল, তারপর বুকের মধ্যে নিয়ে যত জোরে পারে তত জোরে চেপে, সুগভীর নিশ্বাস নিলে, মনে হল যেন তার সাধ মিটেছে। ভগ্নস্বরে কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল, আঃ···

আনন্দে বিস্ফারিত আঁখিযুগল। নিজেকে যেন অনুভব করলে। আজ শান্ত হল তার লক্ষ বাসনা লক্ষ বেদনা— লক্ষ স্বপ্ন মূর্ত্তি পেল।

বিশ্বগত অপূর্ণতা তারা এই তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করলে; পূর্ণতার সম্ভাবনায় দু'জনেই মহা-আনন্দ-মদে মত্ত হয়ে উঠল।

গৌরীর হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, ওই লাল জুতো পরে, নীতীশ টলমল করে চলল, আর— গৌরী চলতে শুরু করলে, নীতীশের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে পথ করে। আচম্বিতে সশব্দে জুতোজোড়াকে চুম্বন করলে। তারপর নীতীশের দিকে চেয়ে, ঈষৎ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে জিগ্‌গেস করলে, কার জন্যে গো?

মৃদু হেসে বললে, তোমার জন্যে!

বারে, তুমি যেন কি! অতটুকু জুতো, আমার পায় কখনও হয়? কার লক্ষ্মীটি বল না? তোমার বুঝি?

ধেৎ! আমার হতে যাবে কেন?

ভুরু কুঁচকে বললে, তবে কার ? চোখের তারা নেচে উঠল।

তোমার পুতুলের ?

ওমা— তা হতে যাবে কেন ? তুমি এনেছ, নিশ্চয় তোমার ছেলের ?

আচ্ছা, বেশ দু'জনের—

হ্যা— অসভ্য, বলে গ্রীবাটাকে পাশের দিকে ফিরিয়ে নিজের মধুর লজ্জাটা অনুভব করলে। লাল জুতোজোড়া তখনও তার কোলে, যেন মাতৃমূর্ত্তি।

(উষ্ণীষ, ১৩৪৪ ভাদ্র)

জ ল

তবু এবার একবার সে চেষ্টা করল, ছোট টিনের ল্যাম্পের মধ্যে তেল ছিল না। ছোট একটু আলো হল, তখন সে ছোট ঘরটার চারিদিকে চাইল, অন্ধকার নেই, আবছায়া হয়েছিল, তেকোনা হয়ে যাওয়া খড়ের ছাওয়া বহুখানে সরে গেছে; সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য;– যেমন আছে– এইভাবে যত্নসহকারে তবু সে চতুর্দিকে চেয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই এরপর সে বসেছিল। ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখছিল, শীর্ণ, পদদ্বয়– তাই। এবং নিজের পরনের কাপড় নড়লে-চড়লে যেমন খসে পড়বে এরূপ সে হয় রুগ্ন, সে বাহিরের দিকে চাইলে, বাহিরে ক্রমাগত অন্ধকার, যত দেখ তখন মনে হয় ভয়ঙ্কর! নোনা জলের উপর অন্ধকার ভয়ঙ্কর আর যদি ঝিল্লির শব্দ– তাও ছিল। ফতিমার বুক দুরু-দুরু করে উঠল– এ জল কবে সরবে?

সমগ্র লাটই জলে ডুবেছে, ভেঙেছিল ভেড়ি– নূতন গইপথের পাশে। সকলের সবই গেছে, নন্দ কয়ালের ভিটে, মোল্লার আর তাদের ভিটে ছিল। কাদের একটা ঢেঁকি কুমীরের মত জলে ভাসে, ভাঁটায় সরে যায়– জোয়ার ভাঁটা খেলে রীতিমত। আর কি তিন-চার বছরের মধ্যে ধান হবে, সব চামটে ধরে যাবে। ধোয়ানি দুটো– তারপর যদি ফসল হয়। জমি জলা হয়ে গেছে এখন। ফজল ভাঙা শালতি বয়ে আসে যায়। ওই দূরে জয়নার ভেড়ি, তারপর পথ, রোজগারের আশা কোথাও নেই। জয়নার লোকেরাই দু'মুঠো পায় কি পায় না।

এ গ্রামের নাম বোলদে, বোলদেতে লোক নেই। তখন শুধু ফজল, ফজলের মা ফতিমা আর ছোট মেয়েটা। ওদিকে নন্দ কয়াল, তার হেঁপো বাপটা আর নন্দর বউ। মোল্লার ভিটে ছিল, মোল্লারা ছিল না; কেননা তারা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল সেইহেতু তারা, এখানে চারিদিকে জল, তাই ছিল না। জল কিছু সরেছে; তবু এখনও স্যাঁতসেঁতে। ফতিমা বাইরের দিকে চাইল, রাত্রি নিশীথিনী, নিথর বিস্তারিত জলরাশি– কেবলমাত্র অন্ধকার; মেয়েটা ঘুমোয়–

ম্যালেরিয়ার আর অনাহারের ঘুম ; ফতিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, সে ভয় পেয়েছিল, ফজল তো সেই গেছে, এখন কত রাত হবে। অনেক রাত হয়েছিলই। সত্যই।

নন্দ বললে, 'দুর শালা তুই অপয়া।'

ফজল ঠিক যেমন কালির বোতলের মত, সে ভয়ে ছম-ছম করছিল। সে যেমন বেঁচে গিয়েছে, এবং সেইহেতু বললে, 'তাঁহালি আর দরকার নেই।' সে ভীতু প্রকৃতির নয় এমন জোর করে বলা যায় না, এই সমস্ত কাজের সাহস অন্য, তাই জন্যে।

'দাঁড়া, দাঁড়া, অত হড়বড় করলি কি চলে। আগে-আগে বুঝলি ফজল, রোজ একটা না একটা জালে পড়ত। এখন সব শালা জেনে গেছে, রাগ করিস নি, দাঁড়া।...'

'এসব কি ভাল আল্লা...' বলে কথার মধ্যেই সে থমকাল, কেননা কথাটা যে নেহাৎ বোকার মত হয়েছে এ সে চমকেই বুঝেছিল, বুঝেছিল।

নন্দ এমত কথায় নিজের গায়ের দিকে তাকালে, 'শালা, তুই যে সৎ হয়ে উঠলি– অ্যাঁ...' এছাড়া আর কিছুই সে উত্তর দিতে পারেনি। লজ্জায় ফজল অপৌরুষেয় অনুভবে বললে, 'ও এমনি বললাম– তা খুড়ো– আমার খড় জোগাড় কোরে দেবা তো... দিতি হবে– না হলি...'

'কিছু পেলি তোর ডোঙা নে যাব গাঙের মুখে তারপর– দশ কাহন খড়।'

'ধর যতি কোন ব্যাপারী হয়...' নন্দকে খুসী করার জন্যেই সে বলেছিল।

'উঃ রে সাবাস্ তাহালি তো শালা সত্যনারায়ণ করব... উইরে শালা... একটা আলো...' নন্দ এবার জলে উঠেছিল, হতে পারে। তখন ফজল ঘেমে উঠেছে ; দূরে লাল একটা বুড়ো আঙুলের মত আলো, অতঃপর সে উপরের দিকে চেয়েওছিল। ফজল আর পারল না, ঝোপের পাশে বসে সে তামাক খেতে লাগল, তারপর চিক করে মুখে উঠে আসা জলটা ফেলে বললে, 'খুড়ো লণ্ঠনটা কিন্তু আমারে দিতি হবে হ্যাঁ...।' শেষের 'হ্যাঁ' শব্দের উপর সম্ভব জোর দিয়েছিল।

এখন উচ্ছুসিত, নন্দ বললে, 'যা যা ভাল জিনিস সব তোর ; তুই আজ প্রথম এয়েছিস– বুঝলি ফজল, একদিন যদি মোট কিছু পাওয়া যায় ব্যস্– শালা জমিদারির টাকা ফেলে না দে' আরও দশবিঘে জমি না নে' ঘরে দোল দুগ্‌গোচ্ছব লাগাব–তুই...?'

'আচ্ছা খুড়ো লাটের জল না সরলি তো—'

'সরবে সরবে···'

'আচ্ছা খুড়ো, বাবুরা তোমায় কি বলিলো—'

'বললে, "ভগবান মেরেছেন, খাও শালারা, ধান খাবা, খাও; বেশ হয়েছে, মাছ ধর নোনা জলে, বিল্‌সে মাছ— ভাজ আর খা"— ঘাসের জমি ও লাটে নেই।'

আবার সব চুপ। আলো মাঠ ভাঙতে এবার শুরু করেছে সবে। আর সব নিথর।

'আমরা দু'জন, আর জন কয়েক হয়ত গে শালা বড়বাবুর মুণ্ডু কেটে আনি···'

'এ পথে আসে নারে···'

'খুড়ো,' ধরা গলায় বললে।

'কি?'

'ওরা যদি জনে বেশি হয়— তাহলি···'

দূরে আলো নিরীক্ষণ করত নন্দ উত্তর দিয়েছিল— 'আ তুস ওসব কথা বলতি আছে!'

ফজল চুপ করে ছিল সেইহেতু। নন্দ হয় বলশালী, তার পেশীগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছিল। ফজল ভাবছিল— ভাবছিল যদি ধরা পড়ে। তার উত্তর নন্দ দিয়েছে— ঢের ভাল শালা, পাথর ভাঙব, দু'বেলা দুটো খেতে পাব— বাপ আর বউটা আমারে আর দায়িক করতে পারবে না, লাটে জল, ধান গেছে— খাব কি?

'শালারা হাঁটছে দেখ— কলকাতার বাবু, এস না বাছারা···আমার চেঁচিয়ে ডাকতি ইচ্চে হচ্চে— নে ফজল ভাই, তেল মাখ, বেশ চপচপ করে তেল মাখ্, —এখন আর ভেড়ির উপরে দাঁড়িয়ে থাকলি চলবে না। তুই দা নে···'

তখনই সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখল তারা দু'জনেই, সেইহেতু অন্ধকার ওদের গায়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল। নন্দ দাটা তুলে এগিয়েই দিয়েছিল, দাটা নেবার আগেই পড়ে গেল, তাই এইজন্যেই নন্দ বললে, 'কি ভাবছিস মোল্লার পো··· ভয় করে?' 'না,' এমনভাবে সে বললে— 'ভাবছি কি শাল্‌লাদের কেটে দুটুগ্‌রো করে ফেলব না—' দাটা সে নিয়েছে, তার হাতটা কিয়ৎক্ষণ আপনকার থেকে বলশালী, অতঃপর কাঁপতে থাকল।

'চ দিনি তুই থাকবি ঝোপের পাশে···আমি থাকব ওই ছোট শুকনো ডোবার মদ্দি···লোক বেশি হলে চুপ করে থাকবি– লোক কম হলে আমি যেই না ডাক দেব– "কেডা দাঁড়াও"– তুই পিছু থেকে আসবি। ভালয় ভালয় দেয় তো···জায়গাটা খুব পয়মন্ত।'

ফজলকে নন্দ এইবার ঝোপের দিকে পাঠিয়ে দিলে। সামান্য পথটুকু যেতেই ফজল হয় একা। সন্নিকটের ডোবার দিকে নন্দ এগিয়ে চলল। হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখ, নাম ধরে ডাকবি না, তোর নাম কানাই, আমার নাম ঐ, আমার নামও কানাই। খবরদার দেখিস মোল্লার পো।' এবার তার বুকটা বড় বলে মনে হয়েছে– সে যখন এগিয়ে যায়, তখন সে কালো– ছায়া। ফজল একবার ভেবেছিল, নন্দ পালাচ্ছে না তো ? নিজের গায়ের উপর অন্ধকার দেখে তার তখন ভয় রিমরিম করছিল– 'দুস্' বলে চলে যাবার কথা সে না যে ভেবেছিল এমন তাও নয়।

ভয় ঠিক নয়, তবে অন্য কিছু তার মুখের চারপাশে শব্দ করছিল। নন্দ গুন-গুন করে গান করে বুঝি, এখন আর নন্দকে দেখা যায় না। পা দুটো ঠাণ্ডায় কনকন করছিল। ঝোপের পাশে ফজল কেমন এক, একা এখানে। 'খুড়ো' চাপা গলায় ফজল না ডেকে পারল না। নন্দ রাগে গিস্-গিস্ করে উঠেছিল। আলোটা যখন তিন-চার রশি দূরে— এবং তার এরূপ রাগ দেখা দিয়েছিল, তাকে অধৈর্য্যও করেছিল– মনে করলে, যাই বেটার গলায় হেঁসোটা চালিয়ে দি'গে। তারপর সে মাঠের দিকে চাইল, কুয়াশায় উপরে অন্ধকার, আঙুলের টিপটা কাপড় দিয়ে মুছে চোখ দুটো কচলে নিয়েছিল। অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছিল এবার,—জয় মা কালী। একটা দুটো চারটে পা, ছোট বাঁকা আল্‌টা ঘুরুক, এক দুই তিন চার– এবার ছোটনালা খালটা পার হবে– ছাগলের মত তখন ওরা সেটা ঠিক পার হচ্ছিল, পার হল।

ফজল এখন ঝোপের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিল, এখন সে ভুলেইছিল ; তার হাতে একখানা ধারাল দা আছে, আর সে হয় ফজল। অতঃপর ইত্যবসরে হঠাৎ সে অধৈর্য্য অস্থির যে সে কি সে করে, এবং হস্তধৃত দা দিয়ে ছোট একটা কোপ দিয়েছিল, ঝোপের একটা ডালে, সঙ্গে সঙ্গে ডালটা মাটিতে পড়ে। এবার সে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে থাকল, ভয় নেই।

অন্যপক্ষে নন্দ ঘাপটি মেরে আছে, বিড়ালের যেমন চোখ তেমনি আপনকার চক্ষুদ্বয়,– আশ্চর্য্য। সরল সরল নিশ্বাস এখনও যখন এমনিধারা মুহূর্ত্তে বয়, শুধু

একটি কথা বস্তুত তাকে উচাটিত করেছিলই— সুতরাং ফজল যদি কিছু একটা বেগোড় করে বসে, – সত্যি এটা তার ভয়ের সত্য কারণ। তখন যখন তার এবার একবার মনে হয়েছিলই, 'ওকে না আনলেই সেই ছিল ভাল' সে ভাবছিল, ভাবছিল, এবং নিরীক্ষণ করত বুঝে খুশি হল, প্রথম লোকটা রোগা, গায়ে চাদর আছে।

'না আমি কিছুই চাই না সব নন্দ খুড়ো নিক্। পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুনে নি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।'

এখন ওপাশে জয়না, এ পাশে জয়নার অন্তঃপাতী বেলটিকুরী, উত্তরে বাণীবাদ, মধ্যে এই দশহাজার বিঘের লাট। ধান কাটা হয়েছে, এইখানেই ফজল ছিল না, সে শূন্যে আশ্রয় চেয়েছিল, পেয়েছিল যখন। ওতপ্রোতভাবে তার চোখ যেমন ঝলসে উঠেছিল, তার পা দুটো মাটিতে গেড়ে গিয়েছিলই। সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু, তবু ফজল থতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই। সন্নিকটে একটা লণ্ঠন নড়তে নড়তে চলেছে, নিরীহ। ইস্ ফজল এবার এখনও তখন জ্ঞান হারায় নি--;তখন তার হাতের দা এপাশের অন্ধকারে চকচকে— নন্দর দা অন্যপক্ষে; সে বিড়বিড় করে বললে—'আল্লারে··· আল্লারে···'। বুঝি সে কষ্ট পাচ্ছিল, কেননা তার বয়স অতীব অল্প, কুড়ি-বাইশ হবে বা। এটুকুও সে ভেবেছিল— 'নন্দকে মারলে হয় না?' কেননা খোদাকে ভালবাসত সরলভাবেই নেহাৎ। ফজল অতঃপর কিছুক্ষণ উঁচু করে চাইল— দুটো লোক ছিল, একটা প্রমাণ লোক, একটা ছোকরা। লোকটির মাথায় আধমনী ধামা— বেতের ধামা ছিল। কাঁধে গামছার দু-মুখে দুটো পুঁটুলি। পিছনে ছেলেটার কাঁধে নূতন পিতলের ঘড়া, মাথায় পুঁটুলি— গায় র‍্যাপার। লোকটির গায়েও চাদর বুক পর্য্যন্ত— তারপর মোটা পৈতে। লোকটার পা দিয়ে পথ চলার শব্দ হচ্ছিল, মুস্মুস্। এরই উপর বললে— 'তোর মামীরে আর কি বলবি—'। 'তোমারে খুব খাতির করিল মামা না'— সে তার প্রতি বলেছিল। মামা এখানে উত্তর দিলে না। 'মন্দি মন্দি এমন শেরাস্ত হয় তবে গে না'— সে তার প্রতি বলেছিল। 'হু'— খুশি হয়েই সে তখন ছেলেটির প্রতি বলেছিল—

'নে পা চালা দিকি'—

'কুইনিন যেদো'—

'আমার ট্যাকে মামা…'

অন্যদিকে নন্দ ঠিক বসেছিল, সে যেমন এদের ভয়ে লুকিয়েই ছিল। ক্রমশ লণ্ঠনটা এগিয়ে আসছে, সে আচমকা লাফ দিয়ে উঠবে, যে মুহূর্তে তারা আর কিছু অগ্রবর্তী হবে তখনই সে দৃঢ় হচ্ছিল, তার হাতে পায়ে অসম্ভব জোর বনিয়ে আসছিল তজ্জন্য শিরা টন-টন করছিল।

যখন ভয়ে ফজল ফজলই নয়। তদ্‌-অন্তে সে কি করে বসেছিল, সে হুড়মুড় করে একেবারে লোকগুলোর সামনে, তার বুকের পাটা হঠাৎ হয়েছিল, তার কাঁধ যেমন ফুলে ফুলো-ফুলো মহিষের কাঁধ যেমন। তার ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল, তার হাত প্রায় লোকটার গলার কাছ দিয়ে তখন ঘুরে গেল সাঁ করে, ফজলের দিক্‌বিদিক ছিল না। সে ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। এবার যখন সে আবার দা তুলেছে তখন ক্রমবর্দ্ধিত বিস্ময়ে দেখতে পেল লোকটা একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, ধামা নামিয়ে রেখেছিল ; আর সে লোক তার পায়ের প্রায় সন্নিকটে মাথাটা রেখে কাটা ছাগলের মত কাঁপতে কাঁপছিল। যখন ফজলের মনে হল মাঠটা তার মাথার উপর— অন্যপক্ষে ছেলেটি বিস্ময়ে হতবাক লণ্ঠনের আলোয়, তখন ফজলকে ভয়ঙ্কর লাগছিল, গালপাট্টা করে তার মুখটা কাপড় দিয়ে মোড়া, তেল চক্‌চক্ শুধু চোখেই আলো পড়েছে—ভয়ঙ্কর, এ তালগাছে এক-পা ও তালগাছে অন্য। লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললে— এবার সে মুখটা তুলেছিল, বলেছিল— 'রক্ষা কর, রক্ষে কর ধম্মবাপ—'। সে চোখের জল চেয়েছিল— কিন্তু পড়েনি। ফজল নিজে কিছুতেই রাগ পাচ্ছিল না। গালাগাল যেমন সে তুলেইছে।

'কেটে ফেল শালাদের, কেটে ফেল'— লাফ দিয়ে এল নন্দখুড়ো। আবার বললে— 'কেটে শালাদের টুকরো কর দিনি— কর শালাদের, কানাই!'

'কানাই'— কানাই হয় তার নাম। সে ফজল মোল্লা নয় এবং যে ফজল হয় ভাল লোক— পরের ধান কাটে না, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন। কন্তু যদি সে কানাই! সে যা যা সে করে। প্রত্যেকের প্রতি ফজল কেমন করে…! তার হাঁটুভরা আলো, লোকদুটি তার সামনে আর সে হয় কানাই।

'আমি বামুন বাবা, ধম্মবাপ— বড্ড গরীব বাপ আমার…'

'শালা পোদের বামুন— আবার বামুন শালা তোরে মাল্লি সগ্‌গবাস— শালা মামার বামুন…নে ট্যাকে কি আছে— খোল কাছা…'

'কাছার মদ্দি কিছু নেই ধম্মবাপ…'

'দে শালা র‍্যাপার খোল্!'

'ও খুড়ো··' বলে চমকে উঠল, মনে শুনলে না খুড়োতে কিছুই জানা যাবে না।

'খুড়ো।'

'কি'

'র‍্যাপার আর নে কি হবে···দে দাও ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে···'

'তুমি···আপনি বল ধম্মবাপ'— ফজলের প্রতি পোদের বামুন বললে।

'মাত্তোর বারো টাকা? আর টাকা দে শালা বামুন, পদির বামুন হেঁসোয় তোর গলা কাটপ না— তোর আল্লাদ আমি···তোমার কপালে অনেক দুকু আছে ঠাকুর···'

আপনার পা ধোয়া জল খাই ধম্মবাপ, যজমান দিইল ১ টাকা, বড়বাবুর মার শেরাদ্দ ১ টাকা আর দশ টাকা— ২০ টাকা লিখে ১০ টাকা ধরে নিয়েছি ধম্মবাপ···আর নেই, মিথ্যে বল্লি আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়···'

'আচ্ছা যা···দূরে গিয়ে যদি চেঁচাস তো কেটে ফেলব।' যাবে? যাবে অর্থ? 'দাঁড়া···এই খোকা তোর ট্যাঁকে কুইলিন আছে না? দে শালা···বার কর—' ফজল ছেলেটির প্রতি অদ্ভুত রূঢ় ভাবে বলেছিল।

নন্দ এতে সত্যিই একটি অবস্থায় পড়েছিলই, এবং তখন তখন সে তার গাল-পাট্টা করে বাঁধা মুখ তাই হেসেছিল, সে তৎপরে ফজলের প্রতি কিয়ৎক্ষণ তাকাল।

যখন ফজল অথবা নন্দ কথা বলছিল, ছেলেটি লক্ষ্য করছিল, বা। এবার যখন ফজল আজ্ঞা করলে, সে তখনই দেখেছিল তার মুখলগ্ন কাপড়টা ফুলে-ফুলে উঠে, তাই জন্যে ছেলেটি আরও বুঝতে পারেনি, সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি থাকে। নন্দ ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। আর বললে, 'কালার মরণ শুনতে পাস্ না?'

'যেদো তোর মামীর জন্যি যে কুইলিন্— তা দে।'

যেদো এতবড় চড়েও কাঁদেনি এবং ট্যাঁক থেকে ছোট কুইনিনের একটা টিউব দিয়েছিল।

ফজল সেটা নিল, কাঁচের টিউবে একটা বিশ্রী ছাপ। লেবেল— গ্রীন লেবল। সে জিগ্‌গেস করেছিল— 'পোষ্ট আপিসির কুইলিন ঠাকুর?'

'হাঁ ধম্মবাপ'

'কথায় কথায় ধম্মবাপ— শালা শয়তান তোর মনে ফের আছে ; ও কানাই ছেড়ে দেই— কি বল্ দেই ?'

'দেও'

'যা— দেখ এই শীতি তোদ্দের গায়ের কিছু নেলাম না···আর ভেব ঠাকুর এ তোমার কম্মফল···এমন কিছু করিলে যার জন্যি এই ফল, পূজো দিও···দাও ইঁটা দাও···'

তারা ভাবেনি এত শীঘ্রই রেহাই পাবে। কি দুর্ভোগ, একে শীতের নিদারুণ রাত্র, মাঘের এ দুর্ব্বহ ফাঁকা মাঠের শীত। তারা দু'জন অন্ধকারে ক্রমাগত তখন এগিয়ে যাচ্ছিল। চোখে তারা কিছুই বুঝি দেখতে পাচ্ছে না, পা বেসামাল পড়ছিল।

'বাণীবাদ যাবা তো মাঠের পথ ধরলে কেন ? আলপথ ধর আলির পথ ধর ঠাকুর'— নন্দ ওদের পিছনে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে হাসল। তারা দু'জনে চমকে গিয়েছিল, লাফ দিয়ে এদিক-ওদিক দেখে শেষে আলের পথ নিল। এদিকে নন্দ হাত দিয়ে লণ্ঠনটা উঠিয়ে কমিয়ে দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে ফুঁ দিল। আলো নিভল।

'আলো নেভেলে যে খুড়ো,' ফজল বললে; সে কিছু ভেবেই বলেছিল, হাতের দাটা শক্ত করে ধরলে।

নন্দ কিছু ফজলকে বিবেচনা করতে পারেনি, এ কথায় সে বলেছিল, 'আরে গাঁড়ল দেখতি পাবে না, কোনদিকি যাব— নে মাল তোল, গুচ্চের হয়ে গেল' — বলে এবার সে টাকা কটা ট্যাঁকে রাখল।

ইদানীং তারা দু'জন ভেড়ির উপরে উঠল, হরগজার গাছের ঝোপের মধ্যে নন্দর ছোট জেলে নৌকো খানা বাঁধা ছিল, কাদা ভেঙে তারা উঠল। ফজল কি যেন আশা করেছিল। সে চুপ করেই ছিল, একবার ইতিমধ্যে সে অনুভব করেছিল তার দেহটা তার থেকে দশগুণ হয়েছিল, সে সামলাতে পারছে না। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল, নন্দ বললে 'পা ধুলি নে ? নে ধো···'

ফজল এখন পা ধুয়ে পা দুটি নৌকোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, 'খুড়ো,' বলে সে হাসবার চেষ্টা করলে, এখানে তার ঈষৎ লজ্জা হয়েছিল ঠিক, সে গতকালের কথা একবার জলের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল— আজ নিয়ে তারা তিনদিন তিনরাত উপোসী, বাপ বেটা বললে চাল কই···নন্দর বউটা ওদের লোকের দিকে চেয়েছিল। সে দাটা পাটার পাশেই রাখলে।

নন্দর চোখ এড়াল না। সে জানত ফজল মোল্লার পো, আর এও সত্যি সে

মুসলমান, এমনিতে স্বভাব ভাল, কিন্তু ভয়ঙ্কর। নন্দর মনে বেইমানী উড়ে গেল, সে ভেবেছিল দাটা চেয়ে নেবে— তারপর···ঠাণ্ডা হাওয়া ছপাৎ ছপাৎ করে বৈঠে পড়ছে···নন্দ সহজ মানুষের মত এবার বললে, 'কই ও মোল্লার পো বৈঠে মার, আড় পারে নে যাই, নাও টানো দিনি···'

'তুমি বও ··আমি তামাক···'

'কেন তামাক খাতি যাবা কোন্ দুঃখে, ঠাকুরের বিড়ি দেশলাই···নাও,' বলে নন্দ তাকে বিড়ি দেশলাই দিয়েছিল।

বিড়ি ধরাল ফজল। তার পা দুটো ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে···সে এখনও কিছু নন্দর দিক থেকে আশা করেছিল। অথচ সে বসেইছিল।

কুয়াশার মধ্য দিয়ে নৌকো চলেছে।

'উই ট্যাঁকে গে আলোটা জালিয়ে ছাখ্ পো, তোর ভাগ্য কেমন।' উত্তরে সে হাসল, নড়ে ঠিক হয়ে বসেছিল। সে বিড়িতে সুখটান দিল। এবং সে বললে, 'কিন্তু আমার কয়েক তড়পা খড় দিতি হবে খুড়ো।'

'তাইতো যাচ্ছি···এখন ব' দিনি থপ-থপ করে।'

সাঁ-সাঁ করে ছোট জেলে নৌকো তুরগ চলতে থাকল। এবার সেই ট্যাঁক— নির্দ্ধারিত ট্যাঁকের উপর নৌকোটা খানিক তুলে দিয়েছিল তখন।

'তোর লণ্ঠনটা জাল দিনি'

'জালি,' খুশি সহকারে সে বলেছিল।

ধামা ভর্ত্তি চাল; তার উপর ছোট হাঁড়ি তাতে বোঝাই সন্দেশ,— পুঁটুলিতে ডাল অন্য পুঁটুলিতে মশলাপাতি। বোতলে সরষের তেল। আর এক পুঁটুলি চাল, ছোট একটা খুরিতে ঘি ··ফজল প্রলুব্ধ হল। নন্দ হাঁফ ছাড়ল। অতঃপর সে বললে 'এসব তোর মোল্লার পো···আমি ওই ঘড়াটা নেলাম, কেমন?'

'তা নাও—'

'এসব দানসামিগ্রী— তোর ভাগ্য ভাল—'

'কিন্তু ঐ বার টাকার মদ্দি আমায় কত দেবা বল দিনি, পিত্‌লে ঘড়াটা তো কম নয়— আমিই তো বেটাদের ধরলাম।'

নন্দ প্যাঁচে পড়ল, সে এখন বিরক্ত হল, চুপ করে থাকার পর বললে, 'কত দেব, তুই ধম্মতে বল—'

ফজল বিপদে পড়ল, সে মনে মনে কিয়ৎক্ষণ ঘড়ার দাম ঠিক করতে চেষ্টা করার পর বললে, 'যাক্— বেশি চাইনে, তুমি আদা-আদি বক্‌রা দাও···' থেমে

আবার সে বললে— 'ও ঘড়ার দাম তো কম নয়,' বলে সে ঘড়ার গায়ে একটা-দুটো ঠোকা মেরেছিল। ঘড়ার আওয়াজটা ভারী ছিল। নন্দ এতে কিছু ভেবেছিল, কিছু বিস্ময় অনুভব করেছিল বা, সে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েছিল, ডাঙায় নেমে সে নৌকোটা ঠেলতে ঠেলতে বললে, 'মোল্লার পো' আমার একটা কথা রাখবি— বলব?'

'বল,' গম্ভীর ভাবে সে বললে।

'আমারে একটা টাকা বেশি দে, তোর গুরু বলে···কেমন রাজি তো? অবিশ্যি তুই যদি ভাল মনে দিস্···'

'আচ্ছা দাও টাকা দাও দিনি···'

'এক দুই তিন চার পাঁচ···খুশি তো?'

ফজল রুপোর টাকাগুলোর প্রতি দেখল। তার ভেল্কি বলে একবার বোধ হয়েছিল। কিন্তু এবার তার মনে হল রোজগণ্ডা। যখন সে টাকাগুলো ট্যাঁকে রাখল তাই মনে হল। এমনকি বিড়ির বখরাও হয়েছিলই, সে একটা বিড়ি ধরালে, বললে— 'উঃরে শালা ঠাণ্ডার চোট·· খুড়ো···'

'তা আর হবে না? বলে মাগের শীত···'

খানিক অতঃপরে নন্দর সরস গলার স্বর কুয়াশার মধ্য দিয়ে—

'হঠাৎ ওর ট্যাঁকে কুইলিন তা তুই টের পেলি কি করে?'

'ওরা যে বলাবলি করছিল, শুনলাম,' বলে হেসে জোরে বৈঠে টানে।

'তুই বাবা ধন্য···দেকালি বাবা···তা কুইলিন তোর কি হবে?'

'মার জন্যি···তোমার গিয়ে মার জন্যি'

'ও···ও হ্যাঁ, আমারে দু'এক গণ্ডা সন্দেশ দিবি না? বহুকাল সন্দেশ খাই না।'

'তা নিও 'খন'

'উহ মোল্লার পো···উই আলো···বড় নৌকো না···ব' ব'।'

প্রকাণ্ড নৌকোর পাশে প্রায় এখন এসে পড়েছে, বৈঠে তাদের ডিঙির উপরে রেখেছিল। ফিস্‌ফিস্ গলায় নন্দ বললে,' ওই রশি কাটব, যদি তেমন বুঝি— আমি জলে লাফ দেব···'

ফজল রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, ধীরে বড় নৌকোর হাল ধরে ভিড়িয়ে দিল। নন্দ নৌকোর হালে পা দিয়ে খড়ের গাদার পাশে গিয়ে আড়ের রশির জাল কাটল। খড়ের শব্দ বড্ড হয়। একটা একটা করে খড় ফেলতে লাগল, খড়ের গরমে সে

কিছুটা গরম অনুভব করছিল। খড় প্রায় বোঝাই···নন্দ জিগ্‌গেস করলে সেইজন্যে, 'আর দরকার' কথা জোর হয়ে গিয়েছিল।

খড়ের ওপাশ থেকে আওয়াজ এল— 'কেডা?'

ঝটিতে নন্দ ত্বরিতে হেঁসো হাতে নেমে এল। ফজল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল, নীচে খুড়ো যেই নামল, তখন যখন সে জোর টান মারল— দাঁড়টা নৌকোর গায়ে ঠেকিয়ে মারে জোয়ান। খানিক দূরে হেসে উঠে বললে 'খুড়ো তোমার বুকের পাটা বটে!'

এতে উৎসাহিত হয়ে খড়ের নৌকোর উদ্দেশ্যে গলা ছেড়ে বলল— 'শালা নে গেল তোর বাবাঠাকুর—' বলে উত্তেজনায় হেসে উঠলে। কৃতার্থ হয়েছে যেমন এরূপ ফজল কিছুক্ষণ পরে নিজেকে ঠিক করে বললে, 'এতে আমার ঘর তো ঘর ছাওয়া— নূতন করে তোয়ের হবে—' 'যাক্‌···আজ সব কাজ বেশ ভাল-ভাবেই হল কি বল? তুই বেশ পয়মন্ত মোল্লার পো।'

'হুঁ···ক' পো রাত হল বল তো খুড়ো?'

'তা যাক আর দুটো বেঁক— জয়নার ট্যাঁক তারপর জামনগরীর ট্যাঁক তারপর বোল্‌দে'

'খিদেয় পেট জ্বলছে···আজ তিনদিন তো খাই না।'

'তা একটু সন্দেশ খেলি পাত্তিশ'

'নাঃ, সে ঘরে গে হবে'খন— মা তো খাইনি···বুনটা··' ফজলের গলাটা এখন ভারী হল।

চমকে উঠে সে নিজেকে বুঝতে পেরেছিল তাই তৎক্ষণাৎ সে নিজস্ব কথাটা ঘুরিয়ে দিলে, বললে, 'খুড়ো কাল আবার বেরোবা নাকি?'

'আ তুস্ রোজ হয় নাকি? এখন খা দা তারপর হবে'খন'

'খোদা করে এ হপ্তার মদ্দি পানি বিলকুল সরে যায়।'

যখন ফজল এবার নিজের দিকে তাকালে। চারিপাশে কুয়াশাচ্ছন্ন। বারম্বার যখন তাকে কয়েকটি কথা ধাক্কা দিতে থাকল, যদি দিতে থাকল অথচ সে হত-চকিত হয়েছিল। আবার সে দাঁড় টানতে লাগল। এবং এমতাবস্থায় তার মন একরূপ শূন্য হয়েছিলই, ফলে ধীরে কিয়ৎক্ষণ পর তার ভয় উপজিল, তন্মুহূর্ত্তে এও সে ভেবেছিল এছাড়া সে আর কি করতে পারত; শুধু, শুধু ঠিক তারা মরতেই পারত। মরতেই পারত। বাবুরা ইচ্ছে করলে তাদের নিয়ে যেতে

পারত, তাদের কাজ দিত, শুনেছি চরহাটের বাবুরা— তারা প্রজাদের নিয়ে গিয়েছিল। তারা লোক ভাল। কিন্তু মারে সে কি বলবে বা, কোথায় পেল এত। এত জিনিস দেখলে, খাওয়া হয়নি আজ কদিন— কিছুই বলবে না। তবু তবু তার গা হিম হল, মাঘের শীতের জন্য নয়।

‘কেডা নন্দ নাকি,’ হাঁক এল বুড়ো গলায়—

‘হ্যাঁ · ’ নন্দ উত্তর দিলে।

চমকে উঠে ফজল বললে, ‘আমাদের গেরাম’ খুশি হয়ে উঠল, এবার আবার নূতন করে কেমন করল।

নন্দর ভিটের কোণে প্রকাণ্ড একটা মহিষের মাথা লাঠির মধ্যে গোঁজা— অন্ধকারে দপদপ করে— ফজলের গা আরও হিম হয়ে উঠল, বললে, ‘খুড়ো··· ওই মাথাটা ফেলে দাও’

‘কেন রে ভয় করে নাকি ?’

‘নাঃ,’ বলে সে নিজে ভিটের দিকে চাইল, তখন চাপা অন্ধকার, আর খেজুর গাছ— জল থেকেই উঠেছে। ভয় হল।

নন্দ নেমে পড়ল। ঘড়াটা নিলে, বললে, ‘মোল্লার পো সন্দেশ দেও’

‘ও হাঁ—তা তুমিই’ বলে সে নিজেই দু’ গণ্ডা দিতে গিয়ে ছটা সন্দেশ দিল।

‘একেবারে ছ-টা—তা যাক্ ভাল ··’

‘চারটি ডালপালা দেও খুড়ো রান্না করব।’

‘দাঁড়া,’ বলে সে ভিতরে গেলে— একগোছা ডালপালা নৌকোয় বোঝাই দিলে। ‘কাল সকালে নৌকো পৌছে দিস্।’

‘তা দেব অনে, আমার ডিঙি বেঁধে রেখ। ভাঁটায় না চলে যায়।’ ইতিপূর্ব্বে সেই ট্যাঁকের উপর তাদের কথোপকথন সে স্মরণ করছিল। একটার পর একটা তার স্মরণ হল।

‘ঠাকুর তো গরীব’

‘গরীব যেন যাত্রার পোশাক’

ফজল হাসল।

‘ও যে বার বার বললে’

‘পাকে পড়লি অমন শালাকে বাপ বলবে তার কথাকি, ’সে দাঁড় টানলে। ‘তারপর ও শালা বামুন— ও যার বাড়ি যাবে তারাই বলবে ঠাকুর কত্তা চাপাও,

—না হলি ফুসমন্তর বিধান, পাঁজি খুলে বলবে, বেগুন পুঁতেছ তেরেওদশার দিন— ফসল হবে কলা, বামুন কে দে চার আনার পয়সা—'

'তুমি যে খুড়ো বামুনের গায়ে হাত তুললে তোমার পাপ হবে না ?'

'পাপ ! পুণ্যি বল, কলির আবার বামুন—ছুঃশালা'

'তবে যে বাবুরা ওকে ওতো দেলে ?'

'বাবুরা তো দেবে থোবে, শহরের জেন্টুম্যানেরা দেবে···ও শালাদের বাবুরা পোষে মহালের খবরের জন্যি,' শেষ কথাটা সে মাথা থেকে বলেছিল।

'তাহলি ও আমাদের মত তুখী নয়'

'আমাদের মত তুঃখী শালা ত্রিভুবনে আছে নাকি !'

আবার দাঁড়ের শব্দ। হঠাৎ ফজলের চমক ভাঙল—

'ও কেমনধারা দাঁড় টানা হচ্ছে শুনি ?'

'ও,' বলে কষে সে দাঁড় টানতে লাগল। টানতে টানতে বলেছিল, 'আচ্ছা খুড়ো—'

'কি' উদ্‌গ্রীব হল না।

'ধর এমনি একদিন যেমন মাঠে গেছ, দাঁড়িয়ে আছ— আর তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর মানুষের বেশ ধরে আসে তা হলি তুমি কি কর ?'— ফজল হয় সরল প্রকৃতির তার একথা শুনে ঝানু নন্দর হাসি পেল, কিন্তু সে উত্তর দিয়েছিল কেননা সে চাষী সেইহেতু ···।

'জানতি যদি পারি, বলব, ঠাকুর···সোনাদানা চাই না ঠাকুর আমাদের বাঁদ তুমি অচল করে দাও— লোহার করে দে যাও— নোনা জল যেন কখনও না এর মদ্দি আসতি পারে···আর হ্যাঁ অজন্মা যেন হয় না ঠাকুর···দূর তাই কখনও হয়···তুমি যেমন ! ঠাকুর যাবে বাবুদের বাড়ি খাঁটের জোগাড় যেখানি বারমাস অষ্টপহর, আমাদের মত তুঃক্ষী কাঙালের সজি শালা দেখা হবে উঠতি বসতি শালা মেড়ো ঠাকুরের···'

ফজল একেবারে শেষ কথাটায় না হেসে থাকতে পারল না। মেড়ো ঠাকুর— চালে লাউ দেখলেই যে বলে, 'বামনে কো খিলাও পুণ হোগা'।

দাওয়ার বাঁশের সঙ্গে নৌকোর কাছি বাঁধতে বাঁধতে তার আর একটা দৃশ্য মনে হল— শরতের সকাল। তখন হাওয়া বইছিল, ছোট একটা কুঁড়ে ঘর— দাওয়ায় বসে নিবিষ্ট মনে মৌলবী কোরানশরিফ পাঠ করছিল, মৌলবী হবীবর রহমান কালো, চেহারা বিশ্রী কিন্তু কেননা যখন সে পাঠ করে সে ভারী

সুন্দর— সে অমায়িক, উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে কোদালটা রেখে ফজল শুনছিল, সে একীভূত। তার ভাল লাগছিল, শুধু তার তখন মনে হয়েছিল, জগদীশ্বর এক কেননা তিনি সবার উপর দয়া রাখেন। এবম্প্রকার কথা তার মনে উদয় হয়েছিল সত্যিই। সে মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে চাইল নৌকোর প্রতি, খড় প্রায় বোঝাই— একটা ধামা; লণ্ঠন…প্রতিটি জিনিস তখন পরম্পরা অন্ধকারে ঠাহর করতে পেরেওছিল। তৎপর সে নৌকোর মধ্যে নেমে ধামাটা তুলে দাওয়ায় রাখলে। লণ্ঠনটা জ্বালল। ঘরের দাওয়াটা এবার প্রচুর বড় বলে মনে হয়েছিল।

লণ্ঠনটা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই তৎক্ষণাৎ ফতিমা তার জীর্ণ কাঁথার মধ্য থেকে ভয় চকিতে মুখ তুলে বলল, 'কেডারে' সে যেমন বললে।

ফজল নিজেকে উৎসাহিত করে তুলেছিল, বলেছিল, 'মা-জান ওঠ দেখসে কি এনেছি…ওঠ,' বলে ত্বরিতে বাইরে গিয়ে ধামাটা নিয়ে একটা শব্দ করে নামালে।

ফতিমা এবার কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে কাছে এসে উবু হয়ে বসে একবার তাকালে এবং কিয়ৎক্ষণ পর বিস্ফারিত নেত্রে সে ফজলের মুখের দিকে তাকালে। সে যেমন কিছুই বুঝতে পারছিল না, সে চোখ কচলে চাইল। তার ছেলেটা ফজল, পেটমোটা…হাড়সার পায় প্রায়…তাকেই মনে হল দশাসই একটা বলদ। ঠাণ্ডায় তার গায়ে ঘামছিল সে মারাত্মক— সে ভাবা বাড়াবাড়ি —কারণ তার মুখ খুশিতে ভারী এখন উজ্জ্বল।

'সে অনেক কাণ্ড সব বলব, তোমারে রাঁন্ধি হবে মা-জান, মশলাপাতি চাল ওতি, সন্দেশ,— তোমার জন্যি কুইলিন এনেছি— রও, খড় নে আসি দাওয়ায় রাখি, লণ্ঠনের আর দরকার নেই—' বলে সে বার হয়ে গেল।

'উরি সাবাস্ লণ্ঠনের আলো কদ্দুর গেছে মা-জান—' দাওয়া থেকে সে বলেছিল, লোনা জলের উপর আলো পড়েছে— পড়ে পড়ে অনেক দূর। দাওয়ায় এসে এখন, যে সে কি সে করে, এবং সে সেকথা যেমন ভুলেই ছিল। এতক্ষণ পর, অতঃপর তার মনটা খুলে গেল, সে একটা গানই ধরে ফেলল…ঠহলদারী! সে খড় দাওয়ার উপর তুলে রেখে এবার ঘরে এল। তখনও সে গান গাইছিল, গান তার তদ্দণ্ডে থেমে গেল।

ফতিমার সামনে একটা চটলা ওঠা এনামেলের পুরাতন থালা— থালাটা ময়লা ও অপরিষ্কার— তার উপর দুটো সন্দেশ সে নিয়েছিল, একটা গোটা ছিল—

একটা আদ্‌ভাঙা। প্রথমে তার তিতোই লাগছিল, এখন ভাল লাগছে। ঘরের সেই স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নেইকো, ঘরটি কিঞ্চিৎ গরম। ফতিমা খাচ্ছিল। তার সামনে একটি ভাল গোল, লণ্ঠনে তার মুখটি আর দেখতে পেলে না। ফজল আর নেই। সে জলে জলসে ওঠে। সে খপ করে ফতিমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল।

প্রচণ্ড অব্যর্থ ভয়ঙ্কর সে চড় এবম্প্রকার।

চড়ের শব্দ সশব্দে তদ্দণ্ডে সে চমকে উঠে থমকে স্থির। যখন তার চক্ষুদ্বয় দীপ্ত উষ্ণ ভাঁটার মত যেমন এক্ষণে। ফজল আর নেই; আর আর দিকে সে তাকায় নি, এখনও যখন সে বেঁকে দাঁড়িয়ে, ধান কাটছে— অনেকটা অনেকটা তদ্রূপ।

ফতিমা এমতাবস্থায়, সে কিছুই কিছুই বুঝতে পারেনি, বুঝবার চেষ্টাও সে করেনি। আপনকার মুখমণ্ডল সে খানিক পরমুহূর্ত্তে তুলে ফজলের মুখের দিকে অজ্ঞাতসারে চেয়েছিলই, যদি চেয়েছিল। আবার পরমুহূর্ত্তে সে মাথা নামালে, লণ্ঠনটা ধিক্‌ধিক্ জলে। মোটা বুড়ো আঙুলের শাদাভ শিখা তার ছোট ছোট চক্ষুদ্বয় ঝাপসা হয়েছিল বা। মশার শব্দ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। ভাববার মত গত দিন তো নেই— সমস্তই যে ছেঁড়া কাঁথা— ভাঙা হাঁড়ি এরপর আর নয়। ধরাগলায় তার কাঁথার মধ্য হতে বলেছিল—

'বাপজে বাপজে আমায় মারলি, তুই আমায় মারলি!'

বাপজে কথাটা সে কেন বললে, চিরকাল অভ্যাসবশত। কিন্তু মারলির 'র' উপর অত জোর ছিল যে, ঠিক, সেইটুকু ফতিমা না দিলেও পারত। এবং অন্য উপায় ছিলই না; সত্যিই ছিল না; ফতিমা দরিদ্র— জনমদুঃখিনী। তার চোখে অনেক জল পড়ল— অনেক সে কেঁদেছিল। সে গেছে ক্ষেতে ভাত দিতে ফজলের বাপকে সঙ্গে সেই ল্যাংটো ছেলেটা বয়স হয়েছে তখন বার, গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখনও সে তার মাই খায়। কে একজন বুড়ী বললে, 'বুড়ো ছেলে— মাই দাও!' 'দিদি অনেক মরে-ঝরে ওই একটা ফজল…।'

অতঃপর সে বুঝতে পারল, সে নিজের হাতটাকে অমানুষিক জোরে কামড়ে ধরেছে। সে টলছিল। সে ভান করলে কেননা সে কি করবে তা ঠিক করতে পারেনি, সেইহেতু সে উচ্চৈঃস্বরে একবার বলতেও পারলে না, 'আল্লা এ কি করলে আমার আল্লারে!' সেহেতু সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার ছোট বোনের ছোট ছোট নিশ্বাসের শব্দ— খুর খুর করে ইঁদুর যায়। সে সবই দেখে,

কিন্তু ফজল কিছু খুবই আশ্চর্য্য এখনও বুঝতে পারেনি। একবার, বার বার বলে উঠেছে, না– না– সে কিছু করেনি, তার মার গায়ে সে হাত দেয়নি, না না এত বড় অন্যায় সে করেনি– মোটেই সে এসব ভাবেনি।

সেখানে ওই ভোরে তার দাঁড়িয়ে থাকা বেমানান বোধ হল, হাত পা এসব কেমন যেমন তার দেহের অঙ্গ না। সে ক্রমে বাহিরে গেল। দাঁড়িয়ে রইল। এবার সে বসেছিল। সে কাঁদবার চেষ্টা করলে, তার জীর্ণ কাপড় দিয়ে বার বার চোখ মুছল। এক ফোঁটাও জল নেই। সে কাঁদবার জন্য পরিত্রাহি চেষ্টা করছিল। শুধু সে কান্নার আওয়াজই সে শুনছিল। শুধু তার মনে হল– ফজল হয় ভাল লোক। একবার হয়ত বা সে মাথা ঝাড়া দিয়ে বলেছিল, সে কানাই সে কানাই– ফজল নয়।

কখন কোন রাতে সে ঘুমিয়েছে।

সে উঠান পার হল, তার চুলগুলো লালচে, না আঁচড়ানোই ; 'মা-জান দেখসে মাছ'– বেশ বড় একটি শোল। সারাদিন বাবুদের বাড়ির যজ্ঞিতে সে জাল টানতে গিয়েছিল, যে মাছটা বাবুরা খায় না সেটা তারা দান করে। এ দান নিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরেছিল। মা আহ্লাদিত হয়েছিল, জীবনে এত বড় মাছ তাদের উঠানে সেইহেতু দ্বিতীয়। সন্ধ্যাবেলায় দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে– 'বুঝলে মা-জান কি চমৎকার, পেরাণ জুড়োও··· কেননা খোদা সবাইয়ের উপর দয়া রাখেন,' সামনের খেজুর গাছ···মাঠ ঘাট কিছুই ছিল না, কভু গলা পরিষ্কার করে বলেছিল। কোরানের এ উল্লেখ ফতিমাকে আর্দ্র করেছিল, সে তখন কেঁদেছিল, সে তখন বলেছিল– 'কাঁদছিস্ মা-জান···'

সে শ্রান্ত হয়ে বসে দাওয়ায়। আপনকার সম্মুখবর্ত্তী বিস্তারিত জলরাশি, এবং আঁধার। নৌকোটা ছপ্ছপ্ করে এল ; নন্দ খুড়ো। দাওয়ায় উঠে বললে, 'তামাক সাজ মোল্লার পো, এই নে তামাক'– বলে গাঁজা ওর হাতে দিল। থেমে বললে– 'এক কথা আছে ভয় পাবি নে বল···' ফ্যাল ফ্যাল করে সেই-হেতু ফজল চেয়ে রইল।

'কাল তখন রাত এক-পো থাকতি আমি উঠে নৌকো নে যে গেই পথের ওধারে গেছি দেখি তোর মা– হুবাহু দাঁড়িয়ে'– ফজল চমকে উঠেছিল।

'আজ সকালে দেখলাম ভাঙা ভেড়ির কুলগাছটায় তোর মার সেই লাল তালি দেওয়া কাঁথা···আমার মনে সন্দে রইল না···'

দিকে চতুর্দ্দিকে আঁধার…

'কাঁথাখান্ আমি নে এস্চি, তোর মা নয় মরেছে কাঁথাখানতো গুগনো…' আকাশেও অন্ধকার।

'এখান— এগে আমারে দিবি মোল্লার পো?'

নিবিড় অন্ধকার করে আসবে ইতঃমধ্যে।

ফজল গলা পরিষ্কার করে তখন বললে—'কাঁথাখান্ তুমি নেও খুড়ো'— এবং ওর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তখন অন্ধকার এবং 'তোর বউ তো বাঁজা, আমার বুনটারে নিবি…?'

নন্দ নড়বড় করে উঠল এমত কথায়, এখন বলি বলি করে বললে— 'সে নয় হল— তুই? জল তো সরবে, আজ নয় কাল, জলের জন্তি না এত এলাহি।'

'না, না, না, আমি দেশত্যাগী হব, কোথাও চলে যাব, থাকব না!'

নন্দ একটু ভাবলে, হয়ত ভূত হয়ে ওকে যদি ধরে, সেই ভয়েই ও এরূপ বলে।

ফজল হয় ভাল লোক, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন।

(সাহিত্যপত্র, ১৩৫৫ কার্তিক)

তে ই শ

ছ-আনির বাবুদেরই টুলটুলী। ৫নং ছিটে দেখা যাবে উত্তর-পশ্চিম কোণের রাখহরি সর্দ্দারের জমির মধ্যবর্ত্তী তিনবিঘে এবং ওপাশে খালের মাঝবরাবর দেড়বিঘে, একুনে সাড়ে-চার বিঘে জমি তার ছিল, এ জমি আবাদী। ফসল ভগবানের দান ; যদিচ লাঙল ঠেলে যাদের শরীরে ছায়া পড়ে না, এমনি যখন যে অবয়ব। সে চাষ করে, সে আকাশকে প্রত্যয় করেই, সে জগদীশ্বরে মতি রাখে, সে ক্যাংলা বলদজোড়াটা ভালবাসে! যেহেতু কেননা সে চাষী। কখনও সে হয় জন, জন খাটে। এখানে বহুদিন পূর্ব্বে, তার বাবার বাবার বাবা এসেছিল, যখন এসেছিল তখন সমস্ত লাট চরাচর বেহাঁসিল ছিল, অতঃপর ভেড়ি টাঙানো হয়েছিল, এবার সমৃদ্ধি সবুজ দেখাল ; যারা পত্তন করেছিল বাবুরা তাদের উচ্ছেদ করলেন ; পরম্পরা নিরিক বেড়েছিল। বাবুরা সজ্জন, তারা একটা টীউবওয়েল করে দিয়েছেন। টীউবওয়েলে জল নেয় ; কে নিচ্ছিল, এখন তার শব্দ আসছে, গরুগুলো আলমের নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়েছিলই তারা চোরের মত দাঁড়িয়েছিল, সে শুনছিল কিয়ৎক্ষণ ; অন্যমনস্কভাবে সে কাপড়টা এঁটে দিয়েছিল। টীউবওয়েলের শব্দ শুনছিল, বিড়বিড় করে বললে, বাবুরা সজ্জন! হাজার হোক বাবুরা বাপমা, আর একবার বলছিল 'বাবুরা সজ্জন' বলে যেক্ষণে সে ফিরেফিরতি বলদের ল্যাজ মলে দিয়ে বললে, 'আঃ দুর দাঁড়ালি কেন হারামী'— হলেও তার গলায় লাঙলের শশ্‌স্বর।

'কি মিঞা ভাবছ কি, মাজায় ব্যথা নাকি ?' এটুকুতেই সে ইতর রসিকতা করেছিল।

ইত্যাকার কথায় আলমের গা জ্বলে ওঠার কথা, এজন্য সে দাঁতে দাঁত ঘষে, বলদের পিঠে মারলে কষে, 'চল শালা' এবং সেইহেতু সে বলেছিল, 'শালা গরু-চোর চোখের যদি একটুকু পর্দ্দা থাকে, যোশোদাদুলাল, শালার মুখে আগুন, তোর মা তোকে আঁতুড়ে মারিনি, শালা ছোটলোক বেইমান,'—সত্যিই সে আউরে গিয়েছিল কেননা যেহেতু যশোদা বউয়ের দু'গাছা চুড়ি গড়িয়ে দেবার খবর পৌঁছে দিয়েছিল কাছারীবাড়ি। এতে আলমের এখন যদি বেসামাল

ঘটেই, যদি তার রাগ চারায়, তাহলে কিছুই নয়।— আলম সোজা ছোট মানুষ; হয়ত অভাবেও বা সোজা মানুষটি বেঁচে রয়, ফলে সে চুড়ি গড়িয়েছিল, অন্তপক্ষে তার নিরিক বাঁকি। দেব, দিয়ে দেবই, নিশ্চিত দেব এমত সদ্ইচ্ছা তার থাকে, ফলত কথাগুলি। তৎজন্য যশোদার উপর তার ভারী সাংঘাতিক ক্রোধ হল, সময়ে জলে জলে পুড়ে, এ রাগ কমাবার যেমন নয়।

বলদগুলি ঘুরে ঘুরে চলছে, এখানে ও আর তারাপদ আর আলিজান ছাড়া যারা লাঙল দেয় তারা সবাই জন, ভাত দু'বেলা সকালে পান্তা এবং রোজ তারিখে তিনগণ্ডা এই হিসেবে তারা জন খাটে।

'গরুচোর' যশোদাও জন। এমন যে, তখন সে বলেছিল, 'আর লাঙল দে কি হবে।'

'দেখ শালা গরুচোর যশোদা, ফের যদি কথা বলিস, মেরে তো হাড় ভেঙে দেব হারামী…'

বড্ড বেশী হয়ে গিয়েছিল, যখন এমনই অতএব নিজেও বুঝি সে ভারী আশ্চর্য্য ভেবেছিল এমনকি যশোদা তার প্রতি বলে, যে সে তদ্দণ্ডে ক্রুদ্ধ হয়। যদিও যশোদার কথা বাঁকা ছিল, যদি সত্যিই, সুতরাং কিছুই কিছু নয়। একটা চোখ যখন যার ঘোলা, হয়ত সেই সবেরা একটু স্বাভাবিক নয়: এটিও একটি সত্য, ঠিক তাহলেও এখনও একটি অপেক্ষা ছিল। এবং এই সূত্রে সে আরও ঠিক ছিল, যে দুপুরবেলায় কাছারীবাড়ি যাবেই, অনেক দূরে দেখা যাবে ওই অশ্বত্থ গাছের পাশে বহু পুরাতন বাড়িটা টুলটুলীর কাছারীবাড়ি, অবশ্য শুধু এ ছাড়াও আর আর লাটের এই কাছারীবাড়ি। ঠিক ঠিক খবর যখন পায়, পাবেই। আলম নিজে আর তেমন শিষ্ট নয়, সে কিছু বিপদজনক। 'গরুচোর' কথাটা যশোদার অপ্রিয় বলে বোধ হয়, এবং সে নিবিষ্ট মনে লাঙল দিতে থাকল। সে লাঙল দেয়, আর-আররাও লাঙল দেয়।

সূর্য্য মানিক বায়েনের গোলা ছেড়ে উঠে এসেছে এখন। সুতরাং তার অর্থ প্রায় এগারোটা বেজেছিলই। উত্তরে ওপারে খাসমহলের ভেড়িপথ— কারা, ওরা কারা? এক চোখে সে বহুদূরে লোক চিনতে পারেনি, অন্তপক্ষে দেখতেও পায়নি। সামনে সাইকেলে দফাদার, চৌকিদার, নায়েব যতীনবাবু, গোমস্তা, আমিন, পিছনে ঢোল আর পাঁচ-ছ'জন লোক, প্রত্যেকের হাতে ছাতি, শুধু যতীনবাবুর মাথায় বেলদার নন্দ ছাতা ধরেছে; একটি ছোট্ট শোভাযাত্রা যেন। ঢ্যাড়ায় গুম্ গুম্ গুম্ আওয়াজ সঙ্গে— 'তিন নম্বর লাটের সম্পত্তি নীলেম হবে…'

এখনও আলম শুনতে পায়নি অথবা সে ঢোলের আওয়াজ শুনেছিলই— সে হয় একটি বোকা, সরল করে ভেবেছিল, হয়ত গরু খোয়া গিয়েছে বা, হয়ত অন্য কিছু খোয়া গিয়েছিল অথবা সে যেমন চষে, লাঙলটা একটু জোর করে মাটিতে চেপে ধরলে, বীজধানগুলো ভারী সবুজ হয়েছে হুকারস্ সবুজ··· ।

যখন ছোট জনস্রোতটা এসে থেমেছিল খালের ওপাশে, খাসমহলের রাস্তায় যতীনবাবুকে মোড়া পেতে দিয়েছিল ভব, তিনি আসীন। ছোট একটা লাল নিশান। আবার ঢোল বাজল ভারী জোরে, কিন্তু এতক্ষণেও আলমের বুকের উপর বাজা উচিত, তা হল না। সবাই ছিট দেখতে ব্যস্ত; যতীনবাবু বললেন, —একটু কেশেছিলেন, 'আর দেরী নয়···ডাক হোক ··ভাল জমি তেজী, চার কাহন ধান, বরাদ্দ— আর দেখ বদোরদ্দী— বাঁধ দেখ— খাড়া বার হাত উঁচু, চারিদিকে গই (স্লুইশ)·· চুপ কেন, ডাক দাও···একুনে সাড়ে-চার বিগে, টাকা পরে দিও ·পরে দিও, ও সুরেন সাঁপুই ডাকো···।'

'আমি আর কি বলব, বদরোদ্দী মিঞা যখন···' তখন বোধ হয় সে এখন ঠাট্টাই করেছিল, কেননা তার প্রায় ৬০০ বিঘে জমি, 'না, নায়েব মশাই ও জমি ডাকব না, আলমের ঠাকুরদার বাবা, আর আমার ঠাকুরদার বাবা বন্ধু ছিল, এখনও পুণ্যাহে ওরা আর আমরা কাপড় পাই— আমি ডাকব না·· ওরা বহু পুরানো চাষী খাতকের বংশ, আজ নয় এলো হয়েছে···'

যতীনবাবু এতে কিছু বলতে পারলে না, যেহেতু সে সুরেন সাঁপুই জাতিতে ওরা উগ্রক্ষত্রিয় হলেও পয়সা আছে।

বদরোদ্দীর একটু খটকা লাগল, গুড়ের ব্যাপারী সে, তার খটকা লাগল। সে চুপ করলে। কিন্তু ছোটখাটো গ্রাহকের মধ্যে সদাশিব কয়াল ছিল, বাড়িতে তার একটা মেয়েমানুষ আছে, তাই তার বীরত্ব করার স্পৃহা ছিল সে বলে উঠল···পৌচিশ—পৌচিশ···

'পঁচিশ কি রকম?' হাসলেন বললেন, 'নিরেক ১৷৹ আনা, চার কাহন ধান, বল না এবার ধান কত করে বেচেছ।'

'জমি স্বত্বটা কি?' কে একজন জিগ্‌গেস করলে।

'স্বত্ব— নিষ্কর, কেরে ব্যাটা?' যতীনবাবু হাঁক দিলেন।

এবং ইত্যবসরে কয়েক কয়েকজন এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, একজন, তার নাম কেষ্ট বায়েন, সে বেলদারের হাতে খোলা ছিটের দিকে আড়ভাবে তাকিয়ে ছিল। ২৩নং দাগে মোটা নোক বিকৃত আঙুলটি সেখানে, যেখানে

স্থির। কেষ্ট আর দাঁড়াল না, পাছে মাথার গামছা পড়ে যাবে, সত্বর সে গামছা কাঁধে নিয়ে দৌড়িয়েছিল। আলের পথ কাদাকাদা থাকে, আর তার পা বসে যাচ্ছিল, ছোট শীর্ণ খালটা পায়ে পায় এখন পার, উঠল গিয়ে আলমের পাশেই, তার বয়স হয়েছিল, সে হাঁফায়। আলম চোখে কম দেখে, তখন ঝাপসা স্বচ্ছ হয়ে কেষ্ট বায়েন। বেচারী লোক, খেতে পায় না সেইহেতু দ্বিতীয়কে সে হিংসা করা কখনও করে না। সে একটা গাধা, আর সে— যে হয় সরল মানুষ। যখন আলম তার দিকে তাকিয়ে ছিল, বিড়বিড় করে বললে, 'কি দাঁড়ালে যে, পথ ছাড়ো,' সত্যিই কেষ্ট বায়েন তার পথের উপর দণ্ডায়মান তাই সে আবার বললে।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, চারিদিকে এবার ঘনঘটা করে এল, ঈশান কোণে মেঘে মেঘে।

'তুমি কি পাগল নাকি, না খেয়ে খেয়ে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে···' এটা এখানকার সাধারণ বলার কথা, সবাই বলে।

অতঃপর এবম্প্রকার কথায়, আলম ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে বলেছিল 'কেন?—কি হয়েছে?' সে ওর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখেছিল।

'খেয়াল আছে ওখানে কি হচ্ছে?' ইসারায়, সে আঙুল তুলে দেখালে।

ছোট ভীড় তখনও থাকে। তারা কি করে? শুধু ভীড়—একটা নিশান ঠাহর হয়, খুব হাওয়া— আবছায়া। আর কিছু নয় আকাশ না মানুষ?

'ও কিসের ভীড় গা?'

'তোমার সব গেল!'

তখন এবার সে অবাক হয়ে বলেছিল, 'সব গেল, আমার কেন? বালাই।'

'বললে তো হবে না, তোমার জমি নীলেম হচ্ছে।'

আলম তখন যতদূর পেরেছিল, বলেছিল ভেঙে ভেঙে 'আমার' আর সেই বোকা লোকটা সোজাসুজি ধীরে মাথাটি নাড়িয়েছিল, কাঁধের লগ্ন গামছা যখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিছু কিছু নড়েছিল। এখন সে চোখে কম দেখে, সে ছিল না। গরুটির গায়ে বসন্তের পুরাতন দাগ— আর খানিক ঘোলা বাদামী জল। অদ্ভুত সে মোটেই এক্ষণে উচিত মত গভীর হতে পারেনি। এবার সে আপনকার ভারী মাথাটা তুলে চেয়ে দেখল উঁচু করে। এখন দূর হতে আসা টীউবওয়েলের শব্দ দূর দূর যায়। ফলে সে কিছু ভাবছিল।

তার ভিতরটা অন্ধকার ধোঁয়া ধোঁয়া। ইত্যবসরে উক্ত ব্যপদেশে বিড়বিড় করে বললে, 'কি করব··· কি করব!'

বোকা লোকটার সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি, সে তার কনুয়ে একটি চুলকাতে চুলকাতে বললে, 'তোর লাঙলটা দে, আর বাকি তিনপো লাঙল দিয়ে এক ধকলে হবে, তোর লাঙলের ফলা ভাল রে—'

কিন্তু এ বোকাপনার কথা সে শুনতে পায়নি, শুধু সর্সর্ খড়ের আওয়াজ সে শুনেছিল। মুখেও তার বসন্তের দাগ, একটা চোখ খোলা ছিল তবু তাকে যে কেউ এখন দেখে তার মায়া হয়। ক্রমশঃ সে ছোট হয়ে গিয়েছিল সেই দণ্ডে।

অতঃপর সে দৌড়ল খুব, খালের মধ্যে একবার সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, কি কথা সে বলবে, আমার কি হল ? তাই সে কেমন করে করে বলে, এমনই বার-বার ক্রমে তার ঠক্ করে সেই কথাটা বললে 'সর্ব্বনাশ' পরানের সদ্য বিধবা বউটা যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল যেমন। 'সর্ব্বনাশ হল !'

জমি নীলেমের ব্যাপারটা সত্যিই অসময়ে হয়েছে, উপরন্তু পরোয়ানা এল না —মেঘ হল না। তলে তলে এ কি করে তারা করে! এতটুকু সময় পেল না, সময় নেই। সে সাবেক প্রজা। বাবুরা সজ্জন, এমন হঠাৎ তারা, যে সে কি—তারা…

তখন এরা সকলে তাকে পথ ছেড়ে দিলে কেমন সে বিপদে পড়ে গিয়েছে, আপনকার হাতদুটি নিয়ে ওর বুঝি মুশকিল। পথশ্রমে সেইটুকুই কাতর, আর নয়। বর্ত্তমানে সকলের মুখেই একটি নাম আর তারই নাম খস্খস্ শব্দিত। এতে যতীনবাবু ঘাড়টা বাঁকিয়ে, তিনি কিছু কেশেছিলেন, বললেন—'শাজাদের বেটা…কি খবর ?' —একথা নিশ্চিত অনাবশ্যক নয় কি ? বলে তিনি টিনের বাক্স খুলে একটি ছোট খিলি খেলেন, একটু চুন খেলেন বৈকি। আবার তিনি বললেন, 'কি শাজাদের বেটা আলম ?' এবার এখন তিনি আব-শ্যক বোধ করলেন, 'সবই ভাগ্য বুঝলি শাজাদের বেটা…'

'আমার কি সর্ব্বনাশ করলেন নায়েব মশাই আমার কি সর্ব্বনাশ করলেন, আমি কি করেছি—সাবেক প্রজা আমরা বাবু মশায়,' এখনও প্রাণহীন—এ জমি তার ছিল না, যেমন অন্য লোকের ; আপনকার সম্পত্তি বলে সে বোধ করে না, সব সময়ে তার সে চেতনা তার নেই ; বুঝিবা সে জানতই, জমি হয় জমিদারের, আর সে হয় জন। ভাল করে বলতেও সক্ষম হচ্ছিল না—যে জমি তার পুরুষানুক্রমে, যদি যায় তাহলে কি করে যায়।

তখন সকলেই ওর কাছ থেকে আরও কথা আশা করেছিল, এখন তারা ওর পানে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আলম ভিতরে ভিতরে আছাড় পিছড়, এবার

সে একতক্কে বলে ফেললে, 'আমি যে পথের ভিখ্‌রী হব বাবু, বাবু'। চঞ্চল হয়ে উঠছিল সে, তার যে দুঃখ নিয়ে আজন্ম আমরণ দুঃখটি সে বুঝতে পারে না, দুর্দশা কতবড়! আক্ষেপে আক্ষেপে তার নিশ্চিত ইচ্ছে হচ্ছিল, আপনকার হাত কামড়ায়। এখন অস্থির এখন পাশুটে সে যেন একটি কিম্ভূত; হঠাৎ সে দড়াম করে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল, যদি দয়ার উদ্রেক হয়। হাস্যকর প্রচেষ্টা, সবাই তখন হতভম্ব হয়েছিল, তাদের এমতাবস্থায় কি করা উচিত, কিছুই এতটুকু ছিল না। যতীনবাবু একহাতে চাষীদের নাড়ী ধরে থাকেন বললেন, 'ঢং করবার জায়গা পেলে না শালা ভূত, মরতে হয় নদীতে ডুবে মরগে যা পাজী!'

আলম তখন আছে জেনে অবাক, ইতিমধ্যে উপরে ধূসর আকাশে পাখী উড়ে যায়। পিঠটা স্যাঁত-স্যাঁত করছে রাস্তা ছিল কাদাকাদা। তাকে কে সাহায্য করেছিল তখন সে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালে। সেও শুনলে। 'দেখ সদাশিব, ছেড়েদি নগা ঢালিকে...দেখ্...'

'তা দিন...'এবার সে ঠাট্টা করলে রাগ করে, 'বাবুদের যখন এত পুরানো খাতকের (এ কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল) সাড়ে-চার বিগে খাবার সাদ— হায়রে, ওই নিক...৪২ টাকার দরে ও জমি আমি নেব না; আর ও মুসলমানের ভিটেও আমি নেবই না—'

'নগা— টাকা আছে? দে আজ কিছু দে যা পারিস।'

সোৎসাহে নগা চারিদিকে চাইল, একটু বেয়াকুব হল। নিজেকে কাটিয়ে সে গেঁজে কোমর থেকে খুলে, হুড়-হুড় করে তার হাতের উপর পাড়ল টাকাটা সিকিটা আনি দোআনি অনেক কিছুই সে গুনে গেঁথে দশটাকা দিলে, গোমং শিববাবু গুণে নিলে, পরে হেসে বললে, 'খরচা আমাদের হিসেব আন।—'

'দেব, দেব, এর দাখিলা পাব তো... ?'

'কবলা লিখতে হবে...অনেক কাজ বাকি, তাহলে ওর ভিটেটা তুই নিবি না'

'না তিন কাঠায় কি হবে...'

'ওখানে পাঠশালাটি উঠিয়ে আনলে হবে...'

নন্দ আবার মোড়াটা বগলদাবা করে, কে একজন ঢাকে কাঠি মারলে ও করে, এরা যারা তারা উঠল আর সবাই চলে গেল!

আলম; পিঠময় কাদা, হিমহিম পিঠটা; সে এক চোখে অনেক কিছুই সময় কিছুই দেখলে, তার হাতটা খালি-খালি লাগছিল। তার হাতে যেমন কোন বোঝা ছিল বা, একটা নিশ্বাসও ছাই পড়ল না রে।

চাষী মানুষ দীর্ঘনিশ্বাস যে তা সে পাবেই কোথায়। তার ভিতরটা অন্ধকার, ধোঁয়াটে আলম, এ সুযোগে একবার শুধু একবার জগদীশ্বরকে স্মরণ করতে ভুলেছিল বুঝিবা, হয় মনে মনে হয়ত এই একটি কথা সে উচ্চারণ করেছিল।

বলরাম শিকারী নিজে খুব আমোদপ্রিয় ছিল, সে নানা রকম হিজিবিজি রসিকতা করবে, সে রসিকতার মানে নেই, হুড়হুড় করে এক দমকা ইংরিজি বলে, তাহলে সেগুলো ইংরিজি। ভীড় যখন ভেঙেছে, যতীনবাবু আর আর লোকরা কয়েক হাত, মাঠের জনরা পিছনে জনতা করে, ঠিক সেই ক্ষেত্রে সে মাথার উপর হাতটা তুলে বলেছিল, 'সব ফরশা, বাবুস মর্জ্জি ইন দি ক্যালকাটা রাঁড়ের বাড়ি, বাইস্কোপ, পোটকোম্পানী, ওয়ান কাপ্ টি গ্যাস্পোস্টে, পুওর-ম্যান্, চাষী খাতক, কোর্ট, ঠোক্ শালা পাঁচ নম্বর, উকিল, মোক্তার হাকিম, বালিষ্টর, বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না – নিরেক বাঁকি, বেঁধে জুতো গ্যাস্পোস্ট খেলস্ খতমস্…' এমনি ভাবে সে বলে যেমন সে ইংরাজিই সবখানিক বলেছিল। লোকে তার কথায় হাসে, সে দলের মধ্যে বলে, যাত্রা ভেঙে গেলে, অথবা কাছারীবাড়ি থেকে বের হবার সময় সময় তাই বলে। একজন ছিল তার নাম বলরাম শিকারী।

'দুঃ শালা তোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে,' একথা বলেওছিল যেমন, যতটুকু হাসবার সে হেসেছিল ফের, 'দেখ না শালার রগম, বাইয়ের ভেড়ুয়া।'

অন্যক্ষেত্রে উপস্থিত সকলে এতেও হাসত, কিন্তু এতাদৃশ সময় সকলে একটু গম্ভীর হবার চেষ্টাই বরং করেছিল। যে ঢোলে চাঁটি মেরেছিল সে এতক্ষণ বাদে বেয়াকুফ বনে গেল বৈকি, বলরাম শিকারী ঠিকভাবে তদানীন্তন গুরুত্ব এখনও অথচ উপলব্ধি করতে পারল না। শুধু সে কেন, উপস্থিত সকলেই পারে নিকো, পাশেই আলম এবার বসেছে পাশে একটু ঘাস ছিল। এদের কথোপকথন তার কানে গিয়েছিল অথবা সে বুঝতে পারেনি। সে একটি গর্দ্দভ বিশেষ, ঠাণ্ডা হাওয়া তার হাতে লাগছিল, তার রোমকূপগুলো ফুলে কাঁটা কাঁটা, সেই রকম অন্য স্থান শরীরের, তারই উপর দিয়ে ইঁদুর চলে যাচ্ছে যেন কাঁপতে কাঁপতে। সে নির্ব্বিকার।

'চ চ খানিকটা লাঙল দিয়ে নি,' বলে সে দাঁড়িয়ে ছিল, এ ভয়ঙ্কর সময়ে আলমকে কিছু বলা দরকার, অন্ততঃ এখন কল্কেটা তার হাতে দেওয়া উচিত, লোকটি এইটুকুই বুদ্ধি খাটাতে পেরেছিল; এবার সে এইজন্যে কতদূর সাহসী হল, সে ভীরুভাবে বললে, তারই কাছে পাশে উবু হয়ে বসে,

কল্কেটা হাতে করে এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'নাও আলমভাই— টানো দিকিনি।'

তাই আলম বুঝিবা সজাগ হয়েছিল। তখন সে ঘাড় ফিরিয়েছিল, সে যেন স্নান করে উঠেছে, কেন যে সে খানিক সতেজ। এবং আর একবার একথা মনে হল, আর আর সকলে তারই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইছে, তখন তার একথা ভাল লেগেছিল, তার মুখে অসহায় ভাবটা আরও আরও ঘনীভূত হয়েছিল, এটা সে হয়ত চেয়েছিলই। সে কল্কেটা নিয়ে একবার অন্ত-মনস্ক ভাবে আস্তে ধীরে টানলে, তারপর সে আবার টানলে। চক্ষুদ্বয় তার স্থির ছিল, তার হাড়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছিল, এখন তার কথা সবাই শুনতে পেল, সে বলেছিল, 'আলিজান তোর হুঁকুটা দে দিকি'— গলাটা তার অসাড়। আলিজান তার হুঁকো দ্রুত তুলে নিয়েই ধীরে এগিয়ে দিল, এ দেওয়ার মধ্যে পরিচ্ছন্ন লক্ষণ ছিল— কেমন একটি সমবেদনা। আলম কল্কেটিকে বসিয়ে, একটু কেশে টানতে লাগল। শুধু ছিল, গুরুগুরু আওয়াজ, সকলে চুপ, আজ মেঘের দিন— উপরে মেঘ।

তখন সকলেই আশা করেছিলই কেবল মাত্র, কেউ কথা বলে। ও বলুক, এ বলুক, আর তারা সবাই চেয়েছিল বলরাম শিকারী চুপ করে থাকে, কথা না কয়। একটু গম্ভীর।

'তুমি এখন কি করবে,' কথাটা মনে হল একটু বোকার মত হয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে চারদিকে চাইলে, যে নড়বড়ে বা সবাই নড়বড়ে হল তবু যখন একথা, তখন কথা কওয়া যাবে।

'আল্লা জানে,' বলে আলম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে না পেরে গভীর ভাবে নিশ্বাস নিল শব্দ শোনা গেল। তামাকের ধোঁয়ার না নিশ্বাসের!

'তবু?'

'ভাবছি!'

'ভাবলে তো চলবে না' ভারিকী ধরনে, আলমকে এতে সচেতন করার নিছক চেষ্টা ছিল।

'কি করব তোমরাই পাঁচজন বল,' এবার সে সকলের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করলে। উপস্থিত সকলে একটু ফাঁপরে পড়ল, পাঁজি খাদের চাষের ক্ষণ ঠিক করে, তারা একটু সভেরো দফার হিসাব নিয়ে পড়ল। তারা সবাই অতঃ-পর পা বাড়াবার জন্তে প্রস্তুত। সে কি তারা প্রস্তুত।

'কি করব তোমরা পাঁচজন বল ভাই,' আবার দ্বিতীয় বার সে বলল সকলের মুখের দিকে চাইলে, তখন তার মনে হল, এবার সকলে, কিয়ৎক্ষণ আগের মুহূর্ত্তের মত ঘেঁষাঘেঁষি বসতে চাইল না, ইতিমধ্যে একটি আল এসেছে। একটু কষ্ট হল, যে নড়ে চড়ে নিজেই তাদের কাছে সরে আসতে চেয়েছিল। একটু ঠেকো চেয়েছিল। 'পায়ে শালা ঝিঁঝিঁ ধরেছে, ওই আমার এক ব্যামো উবু হয়ে বসতে পারিনে,' বলে কে একজন উঠে দাঁড়াল, একটু দাঁড়াল, তারপর ক্ষেতে নেমে পড়ল।

'তুমি কিছুটি জানতে না, তোমার এমন সর্ব্বনাশ হবে ?'

'না— আল্লার কিরে।'

'শাঁখা যাকে ভাঙতে হয় সে কি জানতে পারে ?' আর একজন বললে।

'একটি খবর তো পেতে...বেলদার, ঠাকুরদা (দরওয়ান) ওদের কাছ থেকে খবর পেতে।'

'কেউ আমায় বলেনি গো'

'বিনা মেঘে বজ্রসংঘাত, ব্যাপার ভারী মন্দ না।'

'আলম তুমি কেন বরং যাও না, বাবুদের পা আঁকড়ে ধরগে'

'ওগো, সে বড় শক্ত ঠাঁই— ছ-আনির বাবুরা ডাকসেঁটে কসাই'

'তবু যদি গে কেঁদে পড়ে...পুরোনো প'জা খাতক খাস থেকে '

'হ্যাঁ খাস থেকে জমি দেবে ! মাগ দেবে সেবার জন্তি, রাজত্ব লেখাপড়া করে দেবে যাও না, সেবার আমি বলে আমি গিইলাম, ঠাকুরের নামে বলতে, বলে-ছ্যালো, হতভাগা শালা তোকে ঢুকতে দিলে কে গেটের মদ্দি, বেরো শালা।'

'আলম আমার মন বলে, তুমি ঘরকে যা সেখানে তোর মাগের কি দশা কে জানে, তাকে তো নিশ্চয় বার করে দেয়েছে ক্রোক যেকেলে—'

'ও রইল না ঘর ক্রোক করবে কেমন ধারা !'

'থাকো চরহাটু, জন খাটতে এয়েচো জন খাটো, এখানকার বাবুদের মতি জানলে কেরে কেরে করে উঠতে,' বলে ভীত হাসি হাসল।

ও লোকটি দমল না, স্পষ্ট বললে, 'তোমাদের বাবুদের মুখে আগুন।'

যখন একথা স্পষ্টভাবে তার কানে বাজল, আলম চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে তাকাল। সে হয় শক্তিরহিত, ইদানীং সে বড্ডই ক্লান্ত ছিল, হাত পা ব্যথা, যেন সারাদিন জল সেঁচেছে, বিরক্ত হয়েছে। এ ব্যথা তৎজনিত বা। সে উঁচু করে দেখতে লাগল ; তিনপো দূরের শেষে, হাই দেখা যাবে তাদের গেরাম।

দু রসি লম্বা তারক বরের ঘরের মাটির পাঁচিল, একহাঁটু উঁচু; আর মাদার গাছ, একটা খামার বাড়ি বিষ্ণু সর্দারের, পর পর দেখলে, কাছে থেকেই যেমন দেখেছিল। ওই বিরাট তেঁতুল গাছের পরেই তার বসত বাড়ি। সেটি ও বগলদাবা নিতে পারে। আলম উঠে দাঁড়ালে, কতবড় প্রকাণ্ড ঢাউস আকাশ, কত কত জমি পৃথিবীতে, পুবে আকাশ, দক্ষিণে; উত্তর আর পশ্চিমে গ্রাম, গ্রাম সবুজ। সে কেবল একরত্তি ছিল। যারপরনাই অসহায়।

'তাই যাও তাই যাও,' তাকে দম দিয়ে দিলে।

এখন এ লোকটি এসেছিল। সে লোকটি নিজেকে এদের মধ্যে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল বেশ। মনে পড়ে, সে একটু বা নড়বড় করছিল। তার মনে হয়েছিল সকলেই মুখচেনা। তার দেহটা যেমন লতাচ্ছে, বিনয়ে সে কিছু ভিজে ভিজে; উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে ঘৃণা করতে চেয়ে, তার উপর মনে মনে ক্ষেপে উঠল। সেই লোকটা একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ল, এতে করে সবাইকে ন্যাজেগোবরে করছিল! সেই লোকটি নগা ঢালি। এ জমি কিনে একুনে তার প্রায় সাড়ে-সাতাশ বিঘে জমি হল, এ ছাড়া, বসতের সংলগ্ন দুই বিঘে, তাতে সে বাগান করে, সে ধানের ব্যাপারী। বলরাম শিকারীর একে দেখে কিছু বলবার অভিপ্রায় হয়েছিল তখন; কিন্তু সে একটু ভড়কে ছিল।

নগা ঢালি গামছাটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললে, 'আলম,' কথাটি খাটল না। আবার সে চেষ্টা করলে, 'আলম ভাই—'

'কি বলছ বল,' বাধ বাধ গলায় সে উত্তর দিলে।

'আমার উবরি রাগ করেছ নাকি,' থেমে, 'আমি না ডাকলে কেউ না কেউ কিনতই তো···ভাই···'

'এটা মিত্তি, তোমার উবর রাক্ করতে যাবে, কি অবিসন্দি···' আলমের হয়ে কেউ একজন বললে। 'যার সময় সমাচার ভাল সে কিনবে···এতে আর আশ্চর্য্যটা কই বা · '

'তাই বলি তাই বলি···' নগা ঢালি মাথাটা একটু বেশী দোলাতে লাগল, এরপর সে বললে, গলা খাঁকরে, 'ওগো তোমরা পাঁচজন শোন, আমার অবি-সন্দি, আলম যেমন চষচে চষুক, হাজার হোক ওর বাপ পিতেমোর জমি তো··· আমি, আমি, সেদিক দেকবো, ও জন হিসেবে নিক— রোজগণ্ডা দেব··· আমার মন হয় ও ভাগে চাষ করুক···আমি ওকে তিনপো ধান দেব—' 'তিনপো' বলেই সে বোকা হয়ে গেল; তার মত একটি পাকা লোক এটা কি

করলে, কাকে সে হাতে রাখতে চেষ্টা করলে, তাই ফিরে ফিরতি শুদ্ধ করে. বললে—'অবশ্য এই প্রথমবার, যখন বলেছি তখন আমার এককথা, আমি নগা ঢালি, আমায় মন্দ বলতে পারবে না বাপু···আমার আক্কেল আছে···আমি ভাল লোক কি বল'—সে বেশ বড় মুখ করে এ কথা বলেছিল। তদ্দণ্ডে সকলেই তার এরূপ বদান্যতা দয়ায় সত্যিই আপ্লুত হয়েছিল, লোকটা হয় ভাল। কেবলমাত্র আলম একটু অধীর।

নগা আবার বললে, 'কি রাজি তো? হাল গরু কি তোমার···'

'না···ওর নয়'— অন্য একজন বলল।

'কুচ্ পরোয়া নেই— আমার চারখানা আছে, চারটে, তুমি নেবে এস, একটু যত্ন আদ্দি কোরো, নিজেরা তো খাও—আমি ভাল লোক আলম,' সে সুচিন্তিত ভাবে বলেছিল।

যখন সে শুনছিল, ওতঃপ্রোত ভাবে দেখা গেল সে কিছু ভরাট। যখন সে শুধু স্থিরভাবেই সোজাসুজি বলেছিল, 'না'

একথায় সকলে শুনে বলেছিল সমস্বরে 'না?' শুধু নগা, ভুরুতে তার চুল নেই—ভুরু তুলে, চোখ বড়বড় করে বললে, 'না!'

'না'

'তাহলে তুমি চষবে না, বেশ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে, আমি কিন্তু ভাল লোক···তোমরা পাঁচজন সাক্কী কিন্তুন্'

তখন আলম নিজেকে ভেঁজে নিয়ে বললে, 'আমি শালা আর ওমুখো যাব না আমার যা হয়েছে, আমি শালা···' খানিক অভিমান হয়ত বোঝা গেল।

'তাহলে তুমি কি কাম···কাম করবে··· কি করবেটি শুনি, ভিক্কে করতে হবে যে'

'আল্লা যা করবে—'

'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি আলম্'

'না, আমি জমিতে আর পা দেব না'

সব শেষ হয়ে গেল। সে দৃঢ়। তাহলে সে চাষ আবাদ আর করবে না, আলম তাদের মধ্যে একজনকে বললে, 'ওগুলো এনে দিবি?' একজন তার গরু-জোড়া, হাল এনে দিলে, সে লাঙল ঘাড়ে করে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। কিছু খানিক আগিয়ে অনেক কথাই তার একবার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চাষী খাতকের স্মরণশক্তি কতটুকু, সাক্ষী দিলে তার কথা স্বতন্ত্র, তাদের

স্মরণশক্তি বিস্ময়কর। বলদজোড়া মন্থর গতিতে চলেছে, সেও চলেছে। সে ভারী ভারী, কভু হাল্কা।

ক্রমশঃ সে দেখলে সে আর অন্য কেউ নয় তার বউ! মাথায় একটা ছোট পোঁটলা, হাঁড়ি হাতে, অন্য হাতে বাঁকের সরঞ্জাম। সে তার বউ আর তার বউয়ের চোখে জল, চ্যাপটা মুখটি, নাকে রূপার ছোট একটি নোলক, চোখের লাল রক্তাভ শিরানিচয়– হাত দিয়ে ধরা মাথার পোঁটলা। সে কাঁদছে চোখে তার জল। আলমকে দেখে পাশের গাব গাছের তলে বসল, জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলে, আর কাঁদতে লাগল। কেলো নড়তে নড়তে এসে একটু পাশেই বসল। বউটার চোখ দিয়ে জল পড়ছেই, পরে আঁচলের কাপড় দিয়ে সে নাক মুছেছিল। আলমের কান্না পাচ্ছে না, সে কেঁদে কাঁদনকুচী হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, কিছুই নয়– সে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছে, তাদের চরিত্তির বেয়াড়া, ভিতরে সমস্তই অসাড়। সে যদি মরে ভূত হয় তখনও সে উদোই। সে একটা রামপাঁঠার মতন– যেমন বউটা দেখেছিল, আলমের মুখটি হাঁড়ির মত; সে কিছু ভাবছিল, বস্তুত তা নয়, সে বললে, 'আমাদের কি হবে গো…'

সে একথায় ক্ষেপে উঠল, কিন্তু দাঁড়াল না, টিটকিরি দিয়ে বললে, 'তোমার তো পোয়া বারো, রাঁড় হ'গে ঢেমনী মাগী!' একথা বলেছিল যেমন কেবল। ঠাণ্ডা মেজাজে বললে, 'তাই তো ভাবছি।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেলোরে কেলো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হল রে বাপ!' সে কেঁদে উঠল, কেলো ন্যাজ নাড়ল। 'আল্লারে, জমি যদি আমাদের হত…' বউটা ভৌতিকভাবে বলে উঠল।

'মর– মাগীর বুদ্ধি…' মেয়েমানুষের বুদ্ধি, তাই কখনও হয়…অন্যপক্ষে সে ভেবেছিল জমি যদি কেলোর মত হত তার পিছন পিছন যেত ছায়ার মত। এরূপ ভাবতে তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। কালো কেলো ন্যাজ নাড়তে লাগল। আবার একদফা তার মনে হল, মেয়েমানুষের বুদ্ধি…জমি কখনও চাষার হয়, জমি কি খাতকের বাপকেলে সম্পত্তি।

'চল না, আমরা একদফা বাবুদের কাছে যাই।'

'তারা শালারা ভারী খ্যাচড়– শালারা…'

'খ্যাচড়…তারা মাগ-ভাতারে ঘর করে না? ছেলে তারা পিওয় না?'

'নারে বউ অন্য পথ দেখতে হবেই।'

'তুই যতি মানুষ হস্ তো শালাদের কেটে জল খা,' কতটা কার্য্যকরী বা কতটা নেবে তা সে জানত না, তেমন করে বউ বলেনি, শুধু কথার ফেরে কথাই।

আলম বউয়ের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়েছিল ; ঝটিতে ঝটিতে সে গম্‌গম্‌ করে উঠল, রগদুটো গরম, ঠাণ্ডা হাওয়া নেই। সত্যি সে ক্ষেপে উঠেছে আপাতত তাই খেয়াল হয়।

'দূর তাই কখনও হয়, কত শালার লোক লস্কর…'

বউটা একথায় বোকার মতন ছিল, এর উত্তর কোন, সে কথার উত্তর তা সে ভেবে পায়নি।

সে কি প্রশ্ন করবে তা ভেবেই পাচ্ছিল না, যখন কথাটা কথাই আর খামখা সে তাই গরু-খোঁজা করে কিছু না পেয়ে বললে, পুঁটুলির গেরো খুলতে খুলতে বলেছিল, 'নে চাট্টি মুখে দে…'

'এত সকালে রান্না হল কি ভাবে,' আলম অবাক হয়েছে— এর জন্যে বউ বললে, 'ভাগ্‌গি আজ কি মন করল চাট্টি রেঁদে ফেললুম…কি আর ছাই! কালকার মান ভরতা, লঙ্কা পোড়া আছে…'

'তুই…?'

এখন খাওয়া শেষ। আলম বললে—'চ দু-ছটাক পানি খাইগে, টীপকলে…'

বাবুরা সজ্জন তারা মা-বাপ তাই টীউবওয়েল, নেহাৎ তাদের কল্যাণীয় কীর্ত্তি। কিন্তু বউয়ের কথাটা তার চলতে ফিরতে ফুটছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে সে দাঁতে দাঁত ঘষছিল, যাই সাবাড় করে দিগে যাই…। সে বড্ডই একা, সে একা চিরদিন, সে যে কি করে। একটা হেঁসো তার নেই। হাটখোলার অন্ধকারে বউটা বসে আছে, উপরে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, আকাশ মাথায় মাথায়— নীচে ফুলকাঁটা অন্ধকার আর দুর্য্যোগময়ী যামিনী।

তার এক সময় মনে হল, পিছনে খাল বরাবর তার জমিটা আসছে, তার ভয় হল, জমিটা কি ভূত হয়েছে, তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তাকে নাগালে পায় পায়, খানিক পথ আলম দৌড়ায়। জমিটি ভূত হয়েছে, অনেকটি পথ যেয়ে সে থেমেছিল। ফাঁকা মাঠ, উপরে আকাশ, নীচেও আকাশ।

শুনেছি শেষটা এমনিভাবে হয়।

ফাঁকা খানিক মাঠের পরেই সর্দ্দারের বাড়ি। সে এসে বাঁশের টাঙানো দরজা খুললে। বাড়ির মধ্যে ছোট একটু বেগুনের চাষ, প্রকাণ্ড বড় একটা মহিষের মাথা, চুন মাখানো, অন্ধকারে কটকটে, তারপর পর পর তিনটে ডাগর ডাগর

মরাই। এক্ষণে সে থামলে একদফা কি ভাবলে গাদা গাদা খড়, বিষ্টুর সমস্ত-সমাচার ছিল। তবু সে সাহস করে ডাকলে, 'খুড়ো, ও বিষ্টু খুড়ো –'

আলো নড়ে উঠল। একটা বড় ছায়া মাটির দেওয়ালে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিষ্টু ঘরেই ছিল, 'কে ?'

'আমি আলম…'

'তা এত রাত্তিরে কি মনে করে…যা দুজ্জোগ…' অনিচ্ছা প্রকাশ পেল।

'এসোই না –' তবু সে জোর করে বললে।

মনে মনে একটি কথা ধাক্কা দিচ্ছে যে, সাবাড় সাবাড়। মাথায় টোকা দিয়ে এল বিষ্টু…অন্ধকার…সারি দেওয়া ইট টপকে টপকে… কাছে এসে বললে, 'ওঠো ঠাকুরদালানে।'

বেগুনের চাষের ওপাশে দক্ষিণমুখো দালান, তাতে ওরা উঠল। এসে বললে, 'তামাক (গাঁজা) ফুরিয়েছিল কি ভাগ্যি – আবার নিধু কয়ালের বাড়ি ছুটি – দুজ্জোগ…নেশা…নাও ভাল করে তৈরি কর দিকি,' বলে সে বিড়ির বাক্স থেকে আধা সিগারেট বার করলে।

এসব কথায় সে ক্রমশঃ সোজা হয়ে যাচ্ছিল, একবার চকিতে মনে হল 'ঘরে' বউটা একা, যেতে হবে। অন্যমনা হয়েছিল। বিষ্টু বললে, 'শুনলুম সব কথা, মাতলা থেকে ফিরে শুনলুম,' আর বেশী সে বলতে চাইলে না।

সে চুপ থাকলে। এবং সে দৃঢ় হয়ে এল, কিছুক্ষণ কেটেছে। সে কঁকিয়ে বলতে লাগল. 'আমার একটি অবিসন্দি আছে খুড়ো, তুমি না হলে হবে না, তুমি হলে আমাদের কোম্পানী – তোমাকে তোমাকে চাই –'

'ব্যাপার কি ?'

'ব্যাপার !' আলম হাসলে। 'আমরা চল খুড়ো – আমরা ক্ষেপে উঠি, ক্ষেপে উঠি,' অমোঘ কথা অন্ধকারে ফাটল। সে বলতে লাগল, 'ক্ষেপে না উঠলে আর ভরসা নেই, আমরা খাব কেমন করে, বাঁচব কি করে, চল আমরা সবাই ক্ষেপে উঠি, অত্যাচার কোন মানুষে করে – আমার জমি নেই, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি – অজম্মায় নিরিক দিয়েছি – জলে দিয়েছি – চাষী খাতক উচ্ছেদ ! আমরা ক্ষেপে না উঠলে উপায় নেই খুড়ো, খুড়ো তুমি আমাদের কোম্পানী যে।' সে উৎসাহী হয়েছিল, কিছু কিছু জল আসছিল চোখে, তার উল্লাসে এক চোখে।

অন্তপক্ষে বিষ্টুর তড়কা লাগল। সামনের আটচালা পেরিয়ে, রাঁধুনী

ফোড়নের গন্ধ আসছিল, তিনটে ডাগর মরাই পার হয়ে ঠাণ্ডায় হাওয়ায় আরো জমে উঠেছিল ভারী।

'তুমি খুড়ো, শুনেছি তোমার মুখে, বেজায় মরা ঘোড়া নিয়ে গিয়ে একাই— তোমার গুণপনা শুনেছি, তুমি 'দু-মোহনী' বাবুদের মেরে তকমা ভেঙে দিয়েছিলে, তোমার সাহস কত কত— তুমি কোম্পানী, চল ক্ষেপে উঠি, আমাদের আর গতিক নেই, আমরা সবাই ক্ষেপে উঠব!'

তখন নিজের প্রশংসা আর যথেষ্ট ভাল লাগছিল না। বিষ্টু সর্দার কল্কেটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'ওসব তাতে কাজ নেই, জলে বাস করি কুমীরের সঙ্গে বখেড়া, তার উপর বাত দাঁতে ব্যথা, তোমায় ভাল কথা বলি— আমায় যা বললে বললে, আর কাউকে বোলো না, ছ-আনির বাবু যার নাম বাবু প্রশাদ চন্দর মিত্তির— শালা শুনতে পেলে…'

এমত কথায় আলম গম্‌গম্‌ করে উঠেছিল। এক ঝটকায় সে ক্রুদ্ধ হতে থাকল। সে অন্ধকারে বিষ্টুকে দেখবার চেষ্টা করলে, 'ভীতু' সে বলেছিল যেমন। আর সে বললে মনে মনে, 'আপন মামীমা যাকে নষ্ট করেছে, যে শালা দিব্যি থাকে, মামীর বিষয়সম্পত্তির জন্যে নিজের মাগ-ছেলেকে ভাসিয়ে দেয়— সে মানুষ অধঃপাতে গেছে'— একথা সত্যিই সে যদি বলেছিল, প্রথমে অতগুলো মরাই দেখে থমকেছিল, এও হয় তার মনে হয় সে লক্ষ্মীমন্ত লোক।

সে লাফ দিয়ে দালান দিয়ে নীচে নামল, আর একটু হলে পড়ে যেত। বিষ্টু আহা আহা করে উঠল। আলমের গতিক খারাপ, সে তিক্ত হয়েছে, এ দরদ খারাপ লেগেছে। সে মাটির দরজার সামনে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার অন্ধকার দালানের দিকে দেখল, সে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল, 'খুড়ো তুমি মানুষ নও; তুমি শালা বাইয়ের ভেড়ুয়ার অদম্'। জায়গাটা নিস্তব্ধ অন্ধকার কতক বস্তু। সে টাঙানো দরজাটাকে একহাত দিয়ে ঠেলে তুলত, তেমনি তুললে। পার হল। রাস্তায় নেমে বিড়বিড় করে বললে, 'শালা নাঙ্! আমি ক্ষেপে উঠবই'। মুরগীর ঘরটা থেকে, কোঁক কোঁক খর খর শব্দ হল। একটা কেউ বাছুর সরাচ্ছিল, আলম চমকে উঠল যখন সে ভিতরে ঢুকে পড়েছে, হতমত খেয়েছিল বুঝি বা। ওদিকে সম্মুখে দাওয়ায় একটা ছোট মেয়ে উলঙ্গ হাতে লম্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, উত্তরের গোয়াল থেকে— এবার সে গরুটাকে নিয়ে আসছিল, 'চল্ চল্' শোনা যাচ্ছিল। আলমকে সে এবার দেখতে পেলে, বললে, 'আলম ভাই…'

'হুঁ' বলে এসূত্রে মনে হল, আমরা পরস্পর ভাই···ভাই।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়, ওঠ দাওয়ায় উঠে বোসো, তামাক খাও,' তার গলায় সমবেদনা ছিল।

এবং এ কথায়, সে উঠে নিজেই মাদুরটা পাতলে, হাঁকল, 'ওগো তামা'ক কই আলিজান ভাই— ।' একবার ভেবেছিল, গরীব দুমুটো পায় না, তার তো ক্ষেপে উঠাই উচিত!

গরুটা টানতে টানতে এনে এপাশে শুকনো দাওয়ার একপাশে উঠিয়ে রেখে বললে, 'ওই কুলুঙ্গীতে— আমি পা ধুয়ে আসছি।' তখন সে কল্কে ধরিয়েছে, ফুঁয়ে তার মুখটা ভয়ঙ্কর, মুখের খানিক গরম ঠেকছে, তুষের আগুন মালসা'য়, মনেও তার ঠিক এইভাব— অন্য কিছু নয়, মনে তার এমনি দুর্যোগ কেননা সে বারম্বার ভাবছে—'ক্ষেপে উঠতে হবে, হবেই হবে নির্ঘাত আমরা ক্ষেপে উঠবই নিশ্চয়।' কখন আলিজান এসে ওখানে বসেছিল, সে টের পায়নি, সে কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছে দিচ্ছিল। খানিকটা আলো তার মুখে।

আলিজান বললে, 'বল, বল আলম ভাই, এ কদিন কোথায় ছিলে, বৃত্তান্ত কি?'

বৃত্তান্ত কথাটা সে প্রতিধ্বনিত করে হাসল বুঝি, 'বৃত্তান্ত বউটাকে নিয়ে মহা মুশকিল, কাজ নেই— সবাই ভাবে, অজ্ঞাতশীল লোক, চোর ছ্যাঁচড় হবে। জন খাটব! লোকের অভাব কই? তিন আনা রোজগণ্ডা পাব কোথায়, সারা দেশময় লোক থৈ-থৈ। ভিক্ষে দেবে কে, বলে কাজ করগে। গতর নেই···'

'বড় অকাল, কি যে হবে কে জানে, না খেতে পেয়ে মারা যাব···তোমার বৃত্তান্ত শুনে আমি তো শুকিয়ে গেছি···কিস্তি কিস্তি কত কিস্তি যে পড়েছে·· কি যে করব।'

আলম আর তর সইল না। সে ঠিক এখান থেকে শুরু করল, 'উপায় আছে ভাইজান—উপায় আছে, আমি ঠাওর করেছি, আজ আমি মরেছি—কাল, আল্লা জানে, কার পালা, শালা বাবুরা কি ছেড়ে কথা কইবে!···তাদের বড় বয়ে গেছে, ক্ষেপে ওঠা ছাড়া আমাদের আর গতিক নেই, উঠতেই হবে, এক জোট হয়ে চল ক্ষেপে উঠি; লাটের লোক ক্ষেপে উঠলে রক্ষে থাকবে না, কোন শালা ঠেকায়, শালা বাবুদের দাঁড়া ভেঙে দেব না···শালা ঢ্যামনা, রাঁড়খোর মাতাল···' থেমে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলতে থাকল, 'বউ বলছিল, জমি যদি আমাদের হত, তখন ভাবলুম শালা সাধে কি বলে মেয়েমানুষ···ভাবি ঠি

বলেছে—আমার বাবার বাবার বাবা এসেছিল, হাঁসিল করলে গতর দিয়ে, আমি তার বংশ—নিব্বংশ হলুম উচ্ছেদ! দেখ মজা ভারী মন্দ না...আলিজান ভাই তুমি না বোলো না, বিষ্টু খুড়োর মত—যে শালা নাঙ। সম্পত্তির জন্নি নাঙ হল, সে মানুষ—আমরা একজোটে ক্ষেপে উঠব।' সে দু-চোখেই আজ এখন দেখতে পাচ্ছে।

একথা তাকে টঙ্কার দিলে, মাঝখানে সে আড় হয়ে শুয়েছিল, সে আড় হয়ে শুয়ে থেকে উঠে বসেছিল। সে হুঁকোটা ফের হাত করল, আলম টানতে থাকল, রোমাঞ্চিত আলিজান কি বলবে তা সে ঠিক জানত না, বললে, 'উচিত কথা বলেছ ভাই, আমরা জানি তোমার অবিসন্দি ভাল, বুঝি সব, কিন্তুন ভাই আলম, আমরা যে বড্ড একা, সবাই আমরা বড্ড একা,' একথা তার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়েছিল, 'আরও ভেবে দেখ আমি মরে গেলুম...কিন্তুন দু'জনে কি কিছু হয়, বাবুরা যা শুরু করেছে...তাতে ইস্থির শালা এ গরুতেও থাকে না। ক্ষেপে ওঠা তো দরকার, কিন্তুন আমরা যে বড় একা রে,' থেমে বললে, 'উবরন্ত চাষী খাতক ছাপোষা মানুষ ছেলেপুলে বউ, এদের মুখ চেয়ে আমি কিছু করবার লায়েক নই, হ্যাঁ যতি সবাই জোট হয়—আমি যাব প্রাণ দোবো,' কথাটা তাকে ধাক্কা দিয়েছিল। তাহলেও মধ্যে একটা ফাঁক ছিল, 'একা' কথাটা এই ব্যপদেশে বড্ড পীড়াদায়ক, 'একা' কথাটা স্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সবিশেষ জড়িত। সত্যই তারা বড় একা, তারা কত লোক ...আলিজান, সে, নিধু, বলরাম, পাঁচু...এত লোক তবু তারা একা, কেন? তারা অনেক অনেক; বললে, 'বেশ আমি অন্যদেরকে জিগ্‌গেস করে আসি' —সে যারপরনাই খুশি হয়েছিল।

একজন হয়েছে তো, তার বুকে দশ মরদের বল। সে সেই রকম হুঁসোর মত চলছে, ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, তারা জিতবেই, তারা ক্ষেপে উঠবেই। পালাগানের শব্দ আসছিল, নিধু পালা গায় আর ভারী ভাল গায়, নামডাক তৎজন্য অনেক যোজন দূর।

বাহিরে থেকে উল্লাসে ডাকলে, 'বন্দু ঘরে নাকি—'

'কে বন্দু নাকি? এসো এসো—'

দাওয়ায় সে উঠে পা ঝাড়া দিলে। নিধু বললে, 'কি খবর তোমার? হাঁ ব্যাপার কি—'

'গান গাইছিলে—'

'একটু গরম হচ্ছিলুম, যে মাঘের শীত—তা খাওয়া হয়েছে ?'

'তা এক রকম হয়েছে,' একটু সলজ্জ ভাবে বললে।

'বন্দুর কাছে লজ্জা—নিশ্চিত খাওয়া হয়নি, দিদি কই—'

'সে আছে—আমার মানে বউয়ের এক কুটুম্বের বাড়ি—'

'ও। তা তুমি খাবে—এখানে, তোমার বদ্না তো আছে, ওই ঝুলছে, নাও তামাক খাও, আমার বড় দুক্কু তোমার জন্যে কিচ্ছুটি করতে পারলুম না গো, আমি বড় দুক্কী কাঙাল আলম, তুমি তো জানো—ভাত হয়েছে—এখুনি ডাকবে তুমি মুখহাত ধোও—'

'তোমার কাছে বন্দু—আমি এক দরবারে এসেছি, একটু নিবিষ্ট হয়ে শুনতে হবে।' এখানে তার প্রথম লজ্জা করছিল, জোর সে বলার মধ্যেই ফিরে পেলে, 'বন্দু আমরা ক্ষেপে উঠতে চাই, অন্য গতিক নেই, ক্ষেপে আমাদের উঠতেই হবে, বিহিত একটা করব—মরণপণ তুমিও লাগো, কাঙাল দুক্কী আর থাকব না ক্ষেপে উঠব—আমি ওই শালা বিষ্টুর কাছে গিয়েছিলুম, কোম্পানী লোক সে, তাই, সে বললে—আর কাউকে বোলো না এসব কথা', আর আমার দাঁতে ব্যথা।'

এতে করে নিধু হালদার বিপদ বুঝল—বললে, 'সর্ব্বনাশ বন্দু সর্ব্বনাশ করেছ! কেন তোমার কি অজানা, ও শালা মামীর গোলাম আজকাল ঘন ঘন বাবুদের বাড়ি যাচ্ছে পত্তনী নেবার জন্যে, সে উঠবে ক্ষেপে ? তুমি গুড়ে বালি ঢেলেছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ক্ষেপে উঠা দরকার কিন্তু তাই বলে আমাকে এসে আগে বললে না কেন ? আমরা গরীব গরবারা কাঙালরা মিটীন করতুম—পঞ্চায়েৎ বসাতুম—তুমি পালাও বন্দু তোমার রক্ষে নেই—কালই হয়ত তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে, ছ-আনি বাবু কি প্রবল বাপুরে, তুমি চাটি খেয়ে সরে পড়। কেন আলিজান তোমায় একথা বলেনি যে বিষ্টুকে বোলো না ? আমরা কিছুই করতে পারি না ভাইরে, যতদিন না উপরের লোকটা মাটিতে আসে দাঁড়ায়, কাঙাল আমরা বড় কাঙাল ভাইরে, তুমি কি করলে·· !'

আলমের তড়কা লাগল। নিধু হালদার মিছে কথা বলে না, তাই তার কিছু হয়নি—আলম ঠাণ্ডায় হিম, সে কাঁপতে লাগল। বললে, 'সবার প্রথমে আমি বিষ্টু সর্দ্দারের বাড়ি গিচি—'

নিধু হালদার তখন আইঢাই করতে লাগল। আর কিছু সে বললে না, বললে, 'তুমি পালাও বন্দু—তুমি পালাও এদেশ ছেড়ে পালাও—'

'কিন্তু বিষ্টু তো চাষী, খাতক ছিল,' সে জোর করে বললে, বিশ্বাস রাখতে চাইলে, 'ছিল…'

'আজ সে ধনী—তার তিনটে ডাগর বড় বড় মরাই—৫০০ বিঘে জমি—সে পাতলা কাপড় পরে, সে ক্ষেপে উঠবে? তুমি কি করেছ বন্দু—নাও খেয়েদেয়ে পালাও—কে জানে সে হয়ত নিজেই বাবুদের বাড়ি গেছে—'

'আমি তাহলে খাব না, খেতে আমার দেরি হয় তা জানো—আমি নিয়েই যাই—পাতায় দাও গামছায় বেদে নেব—'

বড্ড একা, কিন্তু ভগবানের সন্তান আর পরস্পর ভাই—তাদের বুকে বল নেই—তারা কি কালকূটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না? তারা নিঃসঙ্গ, সত্যিই বড্ড একা একা—। আল দেওয়া জমির মত একা—জমি তো সব এক!

অন্ধকার পথ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে, সে কি করবে—বউকে খাওয়াবে কি· । গতর আছে বলে ভিক্ষে কেউ দেয় না। হায়রে দু'চোখ যদি তার অন্ধ হত—সে কি ভিক্ষে করতে পারত—। কাঁধের পুটুলিতে খাবারের গন্ধ আসছে, তাতে মূলো ছিল, সে মূলো ভালবাসে। যখন তার একটির পর একটি কথা মনে হচ্ছিল। কেউ ক্ষেপে উঠল না ক্ষেপবে না। ক্ষেপে ওঠা কিবা সহজ ধকল, চূড়োন্ত চুড়োন্তরে। ভিক্ষা ছাড়া তার গতিক নেই, বয়স যথেষ্ট যখন, রোগে রোগে সে কমজোরী।

বন্ধুর দেওয়া ভাতের গন্ধ আসে, একদা মনে হয় সে জিতেছে এই তো খাবার। তার এক চোখ, তাই এইটুকুই।

এই ভাবে শেষ হয়েছে শুনি

টুলটুলী সে অনেকক্ষণ ছেড়েছে। এটা জয়না। সে খাসমহলের সড়কে, ওপাশে জয়নার উঁচু ভেড়ী—জয়নার জনমন্নিস্সী প্রায় জঙ্লী ছিল। এটা জয়নার রাখ ডুমনীর বাড়ি, সে রোজা, ঝাড়ফুঁক করে, ওষুদ বিষুদ জানে। কুকুরগুলো এখন তার পিছনে ফেউ লেগেছে। মাটির ছোট পাঁচিল, সামনে এসে দাঁড়াল। এদের কুকুরটাও ডেকে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—সে দেখে, অদূরে মনসা গাছতলে একটা দক্ষিণারায়ের মূর্ত্তি, কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সে ডাকল—

'ডুমনী ! ও ডুমনী !'

'কিরে – কে – '

'আমি টুলটুলীর আলম, শাজাদের বেটা আলম – আলম'

'কি খবর,' একটা রোগা মেয়েছেলে বেরিয়ে এল ; সকালে সর্বাঙ্গে উল্কী দেখা যেত, দেখলেই মন মানে কিছু ভেল্কী জানে, জানে বৈকি, বুড়ো বয়স চোখে কাজল – 'কিরে – আস্ ভিতরে আস্'

আলম দাওয়ায় উঠে তাকে তার কথা বললে, বুড়ী তামাক খেয়ে কল্কেটা তাকে দিয়ে বললে – 'তবে আমি কি করব – বল্ ?'

'আমারে এমন এমন একটা ওষুদ দে, যাতে – মনের সাদে ভিক্ষে করতে পারি – বউটাকে খাওয়াতে হবে, একটা চোখ আছে – পয়সাকড়ি কিছুটি নেই কিন্তন্ রাখ ডুমনী।'

'আচ্ছা কাল আসিস্ – তোর যখন এমোন হাল তুই পয়সা না দিস্ – '

'আজই দাও – কাল আমি আর এদিকে আসতে পারব না – '

রাখ ডুমনী কি সব গাছগাছড়া বার করলে – আলমের ঔৎসুক্য, চেনবার চেষ্টা – একবার সে বাইরেও গেল। আলম অন্ধকারে একবার আঁতকে উঠছিল। কিন্তু তাকে কে যেমন ধরে রেখেছিল। ঔষধ তৈরী হয়, শিলটা ঘড়ঘড়, ডুমনী ওষুধ বাটে। খোলায় ওষুধ নিয়ে আলমকে সামনে বসিয়ে, সে বিড়বিড় করে কি বললে, বললে, 'তোর নাম ?'

'শাজাদের বেটা আলম'

চোখে তিন বার ফুঁ দিলে, বললে, 'খা…'

আলম খেলে। ঝল্‌সানো লঙ্কার ঝাঁঝে সে আউরে উঠল, ডুমনী আলোটা তার সামনে এনে আঙুল খাড়া করে বললে, 'কটা আঙুল, বোল্ কটি আঙুল ?'

আলমের দেখতে চেষ্টা, দু'চোখই তার বাঁ চোখ হয়েছে, বাঁ চোখে ছিল এতাবৎ অন্ধকার। বললে, 'দেখতে পাচ্ছি না – '

'হামার ওষুদ – বল এটা কি ?' গোটাকতক ধান ছিল – 'ধানরে বেটা (ধানের রঙ হলুদ না !) বা তোর খুব ভিকে মিলবে, বাবুদের দয়া হবে – '

'আমায় পৌঁছে দেবে কে – রাখ ডুমনী মা আমার – '

'সে ভাবনা নেইক, বদনীয়ার বাপ যাবে, চৌকীদার,' সে ওখান থেকে ডাকলে, 'হে-বদনীয়াগে, বাপকে বল্ একটি অন্ধাকে হাটখোলা পৌঁছে দেবে।'

টীউবওয়েলের শব্দ আসে, এটা কি টুলটুলী ? বাবুরা হয় সজ্জন। টীউবওয়েলের কলের শব্দ আসে, কে যে যেমন জল নেয়, এটা কি টুলটুলী ? ছ-আনির বাবুরা সজ্জন।

'দেখ বউ—এবার ভিক্কে মিলবে রে আমি রাথ ডুমনীর ওষুদ খেয়েছি—জমি গেছে তাতে কি—খাবার আর ভাবনা নেই—খুব ভিক্কে পাব রে আমার উপর সবার দয়া হবে রে—' এখনও তার গলায় লাঙলের শশস্বর, গলার আওয়াজে আওয়াজে।

বউ খুশি হয়েছিল।

(চতুরঙ্গ, ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ)

মল্লিকা বাহার

আয়নায় এখন ; আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথই প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট। যদিও যে ছোট এ আয়না ; তৎসত্ত্বেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীন ঘরের, স্যাঁতসেঁতে ঘরের এটা-সেটা। যথা তোরঙ্গ যথা ছেঁড়া মাদুর যথা পিতলের কাঁসার অকেজো তৈজস-পত্র ; এসব আয়নায় আসে, আর আসে জানলার মুখোমুখি অন্য জানলাবহির্গত ঊর্দ্ধগামী বিপুল ধোঁয়ার চরিত্র—আয়নার গভীরতা, আয়নার অন্তরীক্ষ শূন্যতাকে পরিপূরণ করেই ; এই সত্য। এখনও মল্লিকার আবক্ষ, সে আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে অন্য নিরীক্ষণ করে ; কেমনধারা মুখটা হয়ে আছে যে তার, অথবা পুরুষোচিত ক্লান্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্রাকেটে, ওটা পাউডার এটা কাজল এটা এসেন্সের শিশি তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল-টসটস ফিতে, কিছু কাঁটা—এ সকলই'সদ্য মৃত কোনজনের ঔষধের সমারোহ বা ; আর যে, এই পুরুষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এসকল যে, ম্রিয়মাণ, নিষ্ক্রিয়।

এবার মল্লিকা আরবার সাহস সহকারে আয়নার প্রতি চাইল, সেখানেই সে। সে যেন অন্য কেউ আর। এ যেন তার সে উন্নল বক্ষদ্বয় নয়, যেন এ কেশসম্ভার আর কারও, আর অন্য কারও। আজ সকালে, আজ খাবার পরে দুপুরবেলা যে, এই তো যে তুফান ছিল, সে তুফানের কণামাত্র কেন যেমন নেই। তার বাবার বাঁশচলা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দু'জনের অকাল বার্দ্ধক্যে যে তুফানকে, অপরিসর উঠোনের টোকো গন্ধ, বালিখসা দেওয়ালের ঝুল যে তুফানকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি, এখন কিরূপে একভাবে তা যেমন ছিল না এমতই মনে হয়। মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়ে।

চিঠি এল। দুপুরবেলাকার এটুকু সময় সেইটুকু সময় অধিক মোহের। বহু বহু দূরে প্রাক্তন সময়ের অন্তরে সহজেই নিমেষেই যাওয়া আসা এবং যে তদানীন্তন সময়ের সকল অস্তিত্বের সঙ্গ হয়, সেখানকার ফুল আজও তেমনই

নবীনা, এমনও যে তেমনই গন্ধবহ, তারা গায় গায় লাগে। এবং যে ঘুমায় নি সে হয় মল্লিকা, তখন যখন সে এমত একটি নিবিড় অনুভবের মধ্যস্থ, যে সে মল্লিকা এরূপ এক আরামের আধারে ; চোখের পাতা বন্ধ অন্ধকারের মধ্যে কে যেমন তার নাম সুর করে করে পড়ল– এরপর তারই বুকে, আদখোলা বেশখোলা বুকে কিসের ঘা এখন লাগল। মল্লিকা চেয়ে দেখল, হরি। বুকের দিকে কোনমতে চাইল, আর যখন, অচেনা বস্তুর মধ্যে একটি শুরু খাম। এবার কোনমতে, একভাবে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। যখন যখন সে এই ভাবে বসে, তার বুকের কাপড় কোলে, কোল বেয়ে সে কাপড় মাটিতে লুটায়। ইতিমধ্যে শুধু হাত দিয়েই চুলের গোছ অদ্ভুত করে ধরে অনায়াসে ফাঁস করলে, মল্লিকা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সম্মুখে চিঠি।

ইতঃপূর্ব্বে এ নয় যে সে চিঠি কখনও পায়নি। অবশ্য সেই সকল চিঠি অন্য, সেই সকলের ঠিকানার ছাঁদে চিঠির সকল পাঠ উপচে থাকেই চিঠি না খুললেই বা। প্রায় চিঠিই তার মায়ের নামে, ফলে তখন তখন সে পড়ে মা শোনে। বন্ধুদের চিঠি, চিঠিতে লেখা প্রায় প্রায়ই, "এবার এটি (ছেলে) হতে কোন কষ্ট পায় নি," মল্লিকা সেই সূত্রে ভাবে সারা জীবন কষ্ট পাবে বলেই ভগবান ওই কষ্টটা আর দেননি। এ চিঠির খাম আর এক, রঙ আলাদা। টাইপছাদে লেখা নাম, যে এ সকল অক্ষরে ন্যাজে গোবরে জীবনের কোন পাঠ অস্পষ্টতও নেই কোন কিছু নেই। মল্লিকা এখন সন্তর্পণে চিঠিটা খুলে।

দু'হাতের উপরিভাগে চিঠি, যখন তার অক্লেশে অবহেলায় বাঁধা খোঁপা আবার ধসে গিয়েছে, আর দু'হাতের মধ্যস্থে যা যেমন বিষপাত্রই। তারের জাল দেওয়া জানলা ভেদ করে তিনটের রোদ। মল্লিকার এমনধারা বসে থাকা কেমন যেমন, ক্রমাগত কি এক ভাবান্তর! একবার এক আশ্বাস : দু'বেলায় হেঁসেল, একটা ঠিকে ঝি রাখা যেতে পারে ; যে এমন, বাপের জন্য অন্তত ভাতের পর দুটো সিগারেট ; আরও, রুইমাছের কালিয়া খেতেও সাধ আছে। ধোপাকে কাপড় দেওয়াও যাবে। এখন যেখানে এসেন্স সেদিকে চায়, মনে হয় এ প্রয়োজন মিটবে বা, কাতাদড়ির আলনার পাট উঠিয়ে নিশ্চিত একটা ব্রাকেট। এই আশ্বাসের পরই হতাশার ঝাপটা ; কিসের কারণেই বা এ হতাশা তা তার ঠিক ঠিক জানা নেই। তবু এ হতাশা।

তবে যে এই যথার্থ যে, সেই সেই হতাশা–জীবনের যত অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোণ বহি আসে, ক্রমে তার প্রতি আসে। এ বুঝি, কভু বা মনে হয়

ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে, কভু বা কোন বাগানের মধ্য হতে, কিম্বা ফাঁকা রাস্তার নির্জ্জনতার উপরে যখন বৃষ্টি হয় গাছের রঙ তখন আবছায়া— সেখান থেকেই হয়। মল্লিকা কখন যে এ সকল কিছু দেখেছে তা সে জানেই না, অন্য লোকে তো নয়ই। লোকে ভাবে মল্লিকা হয় এতকাল শুধু দাঁতই সংস্কার করেছে, এ কারণে যে তার দন্তপাঁতি অতি মনোহর। ফলত এবং কখন যে তার রক্তে রসে এ সকল দূরাগত দৃশ্যগুলো মিশেছে সম্বন্ধ হয়েছে কে জানে! যৌবনের জীবনের অনেক যা-কিছু ওই সকলের হাতেই সে জমা করে দিয়েছিল, ওখানেই হেতুহীন গোপনতার মধ্যেই ব্যাঙের আধুলি। হতাশ এ কারণে যে যৌবনের সবটুকু সব, নিশ্চিতই অযথা হবেই।

যদিও যে এপারের লঙ্কা গাছ রাঙা, দুপুরের রোদ ভারী মিঠে, ছ্যাকড়া গাড়ীর শব্দ আর ফোড়নের গন্ধের সমঝদারী করার সময় যখন যেমন সে কখনই পাবে না; তেমনি অন্যপক্ষে তাকে লক্ষ্য করার সময় নেই, সে আর আইবুড়ো মেয়ে থাকবে না কখনই, চাকরে হবে। ম্যাগো চাকরে! এতটুকু মান তাকে আর কে দেবে যেহেতু সে চাকরে সেইহেতু; তার আঁচলটা যদি দৈবাৎ কারো মুখে লাগে কতটুকু স্পন্দন জাগবে তাতে করে! হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে সরিয়ে আবার আন্তর্জ্জাতিক পারিস্থিতিতে লোকটি— যুবকটি। এরাই, অন্যপক্ষে তারা যারা সাগ্রহে গৃহস্থ কর্ম্মরত মেয়ের দিকে হাপিত্তেশে চায়! এরাই অন্যহাতের ইলিশের দিকে, অন্যহাতের ফুলকপির দিকে, এমনও যে অন্যহাতের ভাঁজকৃত খবরের কাগজের দিকে চাইবে তবুও ভুলক্রমে চাকরে স্ত্রীলোকের প্রতি চাইবে না। তাকে, মল্লিকাকে, কাল পরশু থেকে আর তেমন ভাবে কেউ আর দেখবে, যদি বা দৈবাৎ, তাহলে সেই চাহনির মধ্যে কোন সম্বন্ধযোগের চিহ্ন নিশ্চিত থাকবে না। গ্রাম্যরা যে চোখে পাথরে কোঁদা যক্ষিণী দেখে থাকে, এ দেখা হয় সেই দেখা।

অদ্যই সেই শেষ দিন। যেহেতু কাল সে, এত সময়ে অফিসের কাজে ব্যাপৃত, সমস্ত সনাতন জগৎ আর মল্লিকা কোথায়? বিদায় নেবার কাল এবার। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে আজ প্রায় ন-দশ বছর যে অনুভব নিয়ে কাটিয়েছে সেই অনুভব সোজা ফেলে দিতে হবে, যেমনে চিরুনিতে জড়ানো ছেঁড়া চুলের গতিই, তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পাকিয়েই, তিনবার থু-থু করে এখন জানলা গলিয়ে ফেলে দাও। যে তার এত বুকভরা ভালোবাসা তা অযথাই হয়; আগামী কাল থেকে আর কেউ, একথাই যে, তাকে আর তেমন ভাবে

দেখবে না। অনেকেই বলে, সে শাড়ী পরতে জানে না, শুধু সে কেন তারই মত যখন আর আর যাদের অবস্থা, তারাও জানে না; যদি সুযোগ হয় তবে দেখব, শাড়ী যে গায় তোলা যায় একথা বিস্ময়ের, কেননা যেহেতু সে শাড়ী হয় শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ এবং আরো যে অতি অধিক তা নোংরা। সেইভাবেই সেই শাড়ীর মধ্যে থেকেও কত সুন্দর লাগত তাকে— তা বোধ করি অন্য অনেকেই জানত, সে তো জানতই। যদিও যে, হাতে আঁজলা করে জল নিয়ে আপন মুখ দেখার— আর পাঁচটার মত বাতুলতা তার ছিল না; তবু সেটুকু সত্য সে জানত। অন্য তার মনে হয় সেটুকু না জানলেই বা কি হত— চাকরিই যদি তার বরাদ্দ এমন তখন! এততেও তার মনটা কোনরূপেই সায় দেয় না, তার আপনকার এ ক্ষতি কোনক্রমেই মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না; কেমনে বা সেভাবে যে আর কোন অর্থ নেই, শুধু চাকরেই, শুধু মাত্র জীবনবীমা করা ছাড়া অন্য কোন মহৎ কিছু করার নিজের জীবনের কারণে থাকবে না। এ ব্যতীত যে সে আর কি করে।

তবু মন আছে আছে করে ওঠে এখনও। কুমারী বলে তাকে গ্রাহ্য করবেনা, একথা প্রতিবার মনে হয় অথচ মন মানতে চায় না, কত ছেলেই তাকে ভাল-বাসতে পারত সেও পারত— কিন্তু কোনক্রমেই হয় লজ্জা কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তা ঘটে ওঠেনি। এখন সকল কিছু কথা কোণঠেসা করছেই। ছি-ছি কি ভুলই হয়েছে। অন্তত শিশিরকে। বেচারা কি মার খেয়েছিল, শিশিরের বাপ শিশিরের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছিল, প্রায় দু'দিন খেতেই দেয়নি। শিশির মল্লিকার সঙ্গে প্রায় খুনসুড়ি করত, তখন মল্লিকার বয়স তেরো-চোদ্দ হবে, তখন ওরা দর্জ্জিপাড়ায়। একদিন ঠিক দুপুরবেলা, ছাদে; হঠাৎ শিশির মল্লিকার ছোট দুটি স্তনে হাত দিয়েছে, মল্লিকা চমকে উঠেছে, সেকথা স্মরণে সে চমকে উঠল, ছাদের কোণে ছিল রাধুর মা, তার চোখ এড়াল না। মল্লিকা রাধুর মাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে 'অসভ্য' বলেই, বসে পড়ে কাঁদতে লাগল। এখন কোথায় বা শিশির, সে এম-এ পাশ করে মাস্টারি করে, শরীর তার বড় খারাপ।

আরও কত, তাদের কলেজের অঞ্জনার ভাই সেও তো তার প্রতি কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, অন্যপক্ষে সে শুধু ক্রমাগত ভয়ই পেয়েছিল, অভিজ্ঞতা-বশত নয়, এমনি। এমন করে যদি বিশেষভাবে ভাবা যায় দেখা যাবে চার পাঁচ-জন এসেছে বেশ কাছে, আরও কাছে— যখন এমন সম্বন্ধ হতে পারত যা আর

কাছছাড়া করার নয়। তখন যখন সে আপনকার অজানিতেই একথা ভাবে, তখনই যেমন তার খেয়াল হল, হিসাব দেখলে অন্তও সময় তার আছে।

সম্মুখ আয়নার সম্বন্ধ সে খোয়াবে একথা অসম্ভব মিথ্যা বই অন্য না। কতক মনে এখনও এ মুহূর্ত্তে সে দেবীরূপে আদরণীয়া—নিশ্চিত। এ শুধু আয়নার সম্বন্ধযোগে সে জানে, যে সে মল্লিকা আর পিছনের অমরতার মধ্যে এতটুকু বৈষম্য কোথায় বা। এ অমরতা যেমন সাক্ষাৎ সে-ই, শুধুমাত্র সত্য এই হয় যে ; পোশাকের ভেদ, কালের ভেদ, এছাড়া তাছাড়া অখণ্ডই একই। তবে যখন অফিসের পথে যেতে চটি ছেঁড়ে, সেটি ঘাড়গোঁজা মুচির সামনে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াবে, মুচিটি একটা ঢাউস জুতো এগিয়ে দেবে—তাও ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ে পরতে! মল্লিকার এখন সাজ শেষ হয়েছে, তখন সে আয়নাটাকে মুছল নিজেকে একটু দেখে নেওয়া।

মল্লিকার মা ইতিমধ্যে ছাদের কাপড় তোলার পথে পাঁচটা বৌ-ঝিকে এ খবর দিয়েছে, দোতলার ফোকলা বৌটা এখন এসেই, সদ্য সাজা মল্লিকা, জড়িয়ে ধরে বললে, 'খাওয়াতে হবে মাইরি।'

এরপর তারপর মল্লিকার প্রতি দেখে বললে, 'এতেক ভাবন কেনে গা! এত ঘটা করে বার হওয়া কোথায় গা, বন্ধুদের খবর দিতে বুঝি!'

'হুঁ!'

'উঁঃ হু প্রাণনাথের ক্ষেরে!'

ফোকলা মুখের 'প্রাণনাথ' কথাটি বেশ মিঠে, মল্লিকা এ কথায় হাসল। কিন্তু তাকে বলতেই হল— 'হ্যাঁ প্রাণনাথ আমার জন্য বাঁশীতে ফুঁ মেরে মেরে আর দিশে-বিশে পাচ্ছে না।'

এ ফাঁকে মল্লিকার মধ্যে খেলে গেল ; যদি আনা চারেক পয়সা চায়, ঠনঠনেতে পাঁচ পয়সা ; এটা-সেটা আর অফিসের ট্রাম ভাড়া। যখন সে একথা মনে গণে, ফোকলা বৌটা বলে উঠল, চলি ভাই।'

যখন মল্লিকার কষ্ট হল, কিন্তু আনন্দের যে সে হাঁফ ছাড়ল। মহা ছেঁচড়া মেয়েটা, যে তার সাবান চুরি করেছে বলে কি নওলা-দওলা করলে, সাবান মল্লিকা চুরি করে নেয়নি, বরং সে চুরি করে মেখেছিল। অবশ্য তা দোষের, কিন্তু ভাববার, চুরির সঠিক অপরাধ হয় কি? মল্লিকা যখন বৌটি চলে গিয়েছিল, তখন সে মনস্থ করে যে সে ঠনঠনেতে প্রণামই করে আসবে। পূজা হবে পরে। সে ঘুরে আয়নায় আবার একবার এক্ষণে আপনাকে দেখল।

ঠনঠনেতে যখন সে দাঁড়াল তখন মনে হল, বাড়ি ফিরে যাই। সম্মুখে দেবী-প্রতিমা, অন্যদিকে আপনকার ত্রস্ত মন আর পিছনে অথবা পার্শ্বেই হাজার চাকাচল রাস্তা। এতাবৎ যে ক্ষমতায় এতদূর সে এসেছে সেটুকু দেখা গেল সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর পরবর্ত্তী যা ছিল মনে অর্থাৎ আপনকার বাসনা, যে সেই কে সম্পাদনা করার মন যেমন আর নেই। এতদিনের তিল তিল না-পাওয়ার, অভাবেরই দুঃখ দিয়ে সে চৌকাঠে মাথা ঠেকালে, সে ঘাড় ফিরিয়ে দূরে রাখা চটিজোড়ার দিকে চাইল, সে জোড়া সেখানেই তেমনই। ভগবানকে মল্লিকা মাথা নত করে ধন্য ধন্য করে, যে আর রসোমাছ রশুন দিয়ে খেতে হয়ত হবে না। শাড়ীটা আবার মিলিয়ে নিলে, রাস্তায় আবার নামলে, নিজেকে যখন সে ছি-ছি দেয় যখন সে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি বলে তখন তখন রাস্তায় চলে। তারপর চলতে চলতে এক বাড়ির দরজায়।

কড়া নাড়ার শব্দ শ্রবণেই সে অসম্ভব মুষড়ে পড়ল, ঢেলে গায় যেমন জর। যদিও যে কড়া সে নিজেই তখনও নাড়ছে। যদি এমত সম্ভব হত তার মুখমণ্ডল ঠাওর করা যেত, তখন তার মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষুপদদ্বয় কম্পমান আর সে বেপথুমতী। বাড়ির ভিতর হতে গলার আওয়াজ এল, 'কে— এঁ্যা'।

'আমি' এ উত্তর দিতে তাকে যেমন হাতব্যাগ হাতড়াতে হবে এমত, এখন সে চুপ। কার্য্যপরম্পরা তার চোখে পড়ে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও সে আপনাকে এভাবে লক্ষ্য করেনি, ভিতর দিকে খিল খোলা হয়, তার শব্দ আসে। এরপর দরজা দু'হাট। একটি লোক। এ লোকটির গায় কোনমতে কোঁচার খুঁট, যখন হাতে একটা আধ-খাওয়া রুটি যখন মুখেও খানিকটা আছে, লোকটি সেইভাবেই বললে, 'আরে এসো!'

দরজা খোলাই রইল।

এখন ওরা ছোট একটা দালানে; একটি লণ্ঠন, তার আলোতে একটি বাটি এক গেলাস জল, লোকটি বোঁ করে গিয়ে উক্ত বাটির সামনে গিয়ে বসল এবং মল্লিকাকে বললে, 'তুমি ঘরে বোসো, আমি আসছি। মা নেই।'

বেচারী মল্লিকা সে ঘরের চৌকাঠের সামনে চটি খুলে ঘরে ঢোকার পূর্ব্বে আবার ঘাড় ফিরিয়ে, রুটিব্যাপৃত লোকটিকে দেখলে, লণ্ঠনের আলো লাল, মুখটা তার কাঠবৎ নড়ে নড়ছে। রাত্রের ঘড়ির শব্দ যেমন কেমন এখানে লোকটির রূপও তেমনই। মল্লিকার আপন মুখমণ্ডলের যে রক্তিমতা তা ক্রমে থেমেছে তবে বুকে তেমনই হিম অনুভব এক্ষণেও আছে। ঘরে সে প্রবেশ

করল ; কিন্তু যেমন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওখানে ইট তোলা জানলা বরাবর খাট, কয়েকটি বালিশ, একটা বাজে কাঠের দেরাজ তার উপরে নানা কিছু, ঘড়ি ক্যালেণ্ডার রকমারি ঝিনুক, একটি টিনের বাক্স। এপাশে আলনা, একটি চেয়ার আর একটি চেয়ার, কয়েকটি বাক্স ঢাকনা দেওয়া। অজস্র আসবাব। ঘরের চতুর্দ্দিক, দেখার পর মল্লিকা একটি চেয়ারে বসে পড়েছে। ফুল-দেওয়া ঝালর-দেওয়া হাতপাখা দোলাচ্ছে— এখন গরমকাল, ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার হাওয়া। গলি বেয়ে পদশব্দ, কখনও ঘুঘনি আলুরদম। সহসা মল্লিকা বলে উঠল, 'আমি উঠি—'

'এই যে হয়ে গেল,' বলে কোঁচার খুঁটে লোকটি মুখ মুছতে মুছতে এখন ঘরে ঢুকল, দরজার মাথা থেকে গামছা নিয়ে আবার মুখ মুছলে, পরে বললে, 'তারপর— আমি আবার রাস্তায় কিছুটি খাই না বুঝলে, আর পয়সাই বা কোথায় তাই—তা তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হল তো' বলে বালিশের কোণে নভেলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইল, হাত দিয়ে বইটা টেনে আপনার কোলে আনলে।

মল্লিকা এবার বুঝলে সে অত্যন্ত অসভ্যভাবে লোকটির দিকে চেয়ে আছে যখন সে মাথা নামালে, মল্লিকা ক্ষণিকের অস্থিরতা ভেঙে আবার তার দিকে চাইলে।

লোকটি বললে, 'দেখ না মা আবার কোথায় গেছে, পাশের বাড়িতে চাবিটা দিয়ে কোথায় যেন গেছে—পাড়া বেড়াতে আর কি।' বলে একটু হাসলে।

মল্লিকা পাখা একটু চালাবার চেষ্টা করার সঙ্গেই বললে, 'কোথায় গেলেন আশ্চর্য্য!'

'বলে কে, আবার নতুন উপসর্গ হয়েছে, আমার জন্ত মেয়ে দেখা'—বলেই লোকটি হা-হা করে হাসলে। লোকটি কথা বলছে যখন মল্লিকা তার দিকে অপলকনেত্রে চেয়ে শুধু এ কথাই তার মনে হয়, এ লোকটি অনেক বদলে গেছে। একই ভাবে লোকটি অনেক কাল এ জগতে বাস করছে অথবা, ঠিক এমত সময় শোনা গেল—'ভোঁদা বাড়ি এলি'—বলতে বলতে কদম ছাঁটা গিন্নী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তার মুখে চোখে দেরাজের উপরস্থ আলো কিয়ৎ পড়ল, এবার গিন্নী মল্লিকাকে দেখতে পেলেন, বললেন, 'ওমা, বুড়ু কতক্ষণ—'

মল্লিকা গিন্নীকে দেখেই ঈষৎ জড়সড়, তার মুখের রক্তিমতা আবার দেখা

দিল, কেননা তার কিছু এক স্পষ্ট অভিসন্ধি ছিলই – তা যেমন বা আরও স্পষ্ট, ঘরের এ অল্প আলোতেও। মল্লিকা কোনক্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলবে কি যে বলতে বললে, 'এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম আমার –'

'তা বেশ বেশ, তোমার মা কেমন, বাবা ?'

'সবাই-ই ভাল···অনেকক্ষণ এসেছি।'

'বোসো বোসো চা করি– আয়ে আয়ে,' বলে গিন্নী তাকে নিয়ে দালানে একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন, 'বোসো'। মল্লিকা আড়চোখে দেখলে ঘরের অভ্যন্তর— সেই লোকটি দেরাজস্থিত আলোটাকে নামালে, ঘরের আসবাবের ছায়ার ওলটপালট হল, কেউ কেউ এতে করে গাঢ় হল, লোকের হাতের ছায়াটা, স্পষ্টই দেখলে, প্রকাণ্ড বিপুল। লোকটি শুয়ে পড়ল এবার, 'আঃ' একটা আরামের শব্দ – এই বোধ হয় শীৎকার! এমতই; তারপর নভেলটা মেলে ধরল মুখটা আর দেখা গেল না। এমত দৃশ্যে মল্লিকা যেমন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, সে আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে চাইল না। অনেক সময় সে ও লোকটি দিয়েছিল, লোকটি যেমন কেমনধারা হয়ে গেছে।

গিন্নী বলছেন, 'ভোঁদা আমার কোথাও যায় না, অফিস আর বাড়ি ব্যাস।'

মল্লিকা তাকে বাধা দিয়ে তখন বললে, 'আর দেরী করব না মাসীমা দেরী হয়ে যাবে' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু উচ্চকণ্ঠে বললে, 'ব্রজদা চললুম।'

লোকটি, ব্রজদা, তেমনই শুয়ে, বললে, 'আচ্ছা আর একদিন এসো··'

মল্লিকা অন্ধকার আর গ্যাসের আলোর মধ্য দিয়ে একটা একটু বড় রাস্তায় যখন পড়েছে এখন তার আপন মনের দিকে চাইবার ক্ষমতা, তার তিলেক ছিল না এমতই। মন তার এতে করে এত বেশী ক্ষুব্ধ তা যাবৎ না স্পষ্ট আলোতে দেখা যায় তাবৎ বুঝার উপায় তার নিজেরই ছিল না। অসম্ভব তীব্র এ অভিজ্ঞতা, ব্রজকেই তার ভাল লাগত, আর সে কিনা এমনধারা হয়ে গেছে, এ তার যদি কোনক্রমে জানা থাকত তাহলে একথা নিশ্চিত যে সে কখনই সে সেখানে যেত না। মল্লিকা কি চেয়েছিল, চেয়েছিল যে ব্রজ তাকে একবার দেখুক— ভাল করে দেখুক, বাঁ হাতের উপর হয়ত বা হাতখানি রাখতে পারত। একথাও মল্লিকার মনে পড়ল, আচ্ছা ব্রজদার মার কি কিছু তাকে দেখে মনে হয়েছিল ? কে জানে !

কিছুই তো নয়, একটা লোক এবং তার দৈনন্দিন কার্য্যপরম্পরা আর এক মানুষকে কিভাবে আঘাত করতে যে পারে তা মল্লিকার আপনারই ধারণার

বাহিরে ছিল। ব্রজ, তার এই ধারণা ছিল তাকে ভালবাসত বা ভালবাসতে পারত। মেয়েমানুষকে যে ভালবাসতে হয় লোকটা যেমন এই সাধারণ কথা-টুকুই জানে না। লোকটা, ব্রজ, যেমন তার বাবা কাকা ভাই অথবা কোন গুরু-জনের মতই ভাব করলে।

মল্লিকা ব্রজর এমত উদাসীন ব্যবহারে অত্যন্তই আহত হয়েছে, সে নিজে যখন সকল কিছু ভাব প্রকাশ তো করেছিল, এই হার তাকে বড় পীড়া দেয়। এখন কোথায়ও মল্লিকা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে— তার চাই কাউকে কোন ব্যক্তিকে। এখানে রাস্তায় একটা ছোট অন্ধকার সেখানে সে যেমন দৃপ্ত-ভাবে দাঁডাবার সাহস পেল, একদিকে বাড়ির রাস্তা অন্যদিকে আনন্দদের বাড়ি; আনন্দ সে।

দরজাটা খোলাই ছিল, ব্রজদের বাড়ির থেকে এ বাড়িটা বড, একটু অবস্থাপন্ন। দু'বেলাই রান্না হয়, কয়লা বাঁচাবার ফিকির নেই, গুলের চলন নেই। মল্লিকা দালানে ঢুকতেই দেখলে তোলা উনুনে টগবগ করে ঝোল ফুটছে, তার গন্ধ আসে, নূতন পটলের গন্ধ আর বাগদা চিংড়ির স্বাদ সমস্ত স্থানটি ভরে আছে। মল্লিকা দেখলে, ঘরে একটি লোক আয়নার সম্মুখে সবেগে চুল আঁচড়াচ্ছে, পাশে একটা ছোট মেয়ে ও পুঁটি। আনন্দর মা সেই ঘর থেকে দালানে আসতেই মল্লিকাকে দেখেই— 'ওমা বুড়ু কি খবর রে— বোস বোস।'

'এই এলুম।'

এখন আনন্দ আয়না থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকাকে দেখে মুচকি হাসলে, বললে, 'কি খবর? বোসো।'

মল্লিকাকে বসতে দিয়ে, আনন্দর মা একটা কাঁসিতে ঝোলটা ঢেলে রাখে, হাত ধুয়ে, একটা কেটলিতে একটু জল চাপিয়ে দিয়ে এবার মুখ তুলে বললেন, 'বল্ শুনি—তোর মা কেমন আছে, বাবার হাঁপানি?'

মল্লিকা আনন্দর মাকে একবার দেখলে, তার ভাল লাগল। ঠিক এমত গৃহিণী হতে তারও সাধ হয়, বেশ পরিপাটি বেশ কর্মপটু। আদরযত্ন বাকি বকেয়া থাকে না। মল্লিকা আস্তে আস্তে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলে। এরপর আনন্দ তার সাজ হয়েছিল, সে এসে দাঁড়াল, বললে, 'চলি মা।'

'সেকি রে চা খাবিনি, তোর জন্তেও তো চা চাপিয়েছি।'

'না দেরী হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা তাহলে যা, আর কাল সকালেই আসিস, না হলে উনি কিন্তু বড্ড রাগ

করবেন, আর বৌমাকে হাওড়া থেকে একটা ফিটনে করেই আনবি—'

'ট্যাক্সি—'

'না না ট্যাক্সির দরকার নেই।'

'আচ্ছা ফিটন একটাকার মধ্যেই হবে।'

মল্লিকা এমন যেমন সে বেয়াকুফ। যে সে ভালভাবে আনন্দের দিকে চাইতে পারল না, কবে তার বিবাহ হল, কবে তার চাকরিই বা হল! আশ্চর্য্য; হাত-কামড়ানো-বেদনা তার মধ্যে যেমন অস্থির হয়ে উঠছে। চোখ যখন তুলল তখন, তখন দেখলে এক কাপ চা, ধোঁয়া ওড়ে। এইটুকুই। তার আপনার প্রতি অতি ক্রোধ জন্মায়। বারবার বলছে, সে কি এতকাল মরেছিল। ব্রজর দাঁত-বার-করা হাসি আর আনন্দের কার্ত্তিকবেশে শ্বশুরবাড়িযাত্রা দেখার জন্যই এতকাল যৌবনের সকল সৌন্দর্য্য নিয়ে বসে ছিল।

'কই খা?'

'খাই মাসীমা' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এবার তার জ্ঞান হল যে সে বুক ফেটে মরে, এ কণ্ঠস্বর হয় তারই যার বুকে পাথর বাধে। কত অসহায় সে, সে বুঝতে পারলে যে অদ্যই সনাতন পৃথিবীর সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হবে, নিজের কাছে আপনার একটি মূল্য ধরে দিতে চাইছে সত্য, কিন্তু একথাও বুঝলে বড় কালবিলম্ব হয়েছে। যে অনুভবের দামে সে সারা জীবনটাকে পেতে পারত, কল্য আর পাবেই না। ভাল, কিন্তু যে সাহস আজ, এমন সাহস তার ছিল কোথায়, গতকাল তো তার প্রেমের নামকে চমকে উঠে শোনাই তো ছিল তার ধারা। মানুষের চাহনি আর হিংস্রতাকে ভিন্ন করে দেখেছে কি!

অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের রাস্তা, ছোট পার্কটা অনেক ভীড়, কাঠে কোঁদা ছবি এমত। মল্লিকা ভাবলে রাস্তার এই গাছটির তলে দাঁড়াই, সে দাঁড়ায়। আঁচলটা তার চোখে চাপতে ইচ্ছে করল, এ কারণে যে তার হারটা সম্যক সে বুঝেছে। এও শুনেছে;— লেখার মত সেও শ্যামবাজারের মোড়ে চপ ভাল, হ্যারিসন রোডে আগ্রার ডালমুট পাওয়া যায়, আমড়াতলায় ভাল লস্‌সীর খোঁজ রাখবেই। চপটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নির্জ্জন পার্কে দাঁড়িয়ে বা বেঞ্চে বসে গপ্‌গপ্‌ করে খাবে, কোকিলের গান আসে, হাওয়া আসে, শীতলতা, সে সব ভ্রূক্ষেপ করবে না, চারিদিকে চেয়ে একটু কাপড় তুলে সায়া, সায়াতে হাত মুছবে।

অথবা বীণা যেমত স্বভাবের— কোথায় ব্রাসিয়ে (বডিস) পাওয়া যায় তার খোঁজ রাখে, হরেক রঙ, লাল, নীল— কোনটা আবার 'একোয়া মারাইন'।

সায়া আর তাই পরে সন্ধ্যায় আয়নায় অনেককাল কাটায়। বীণা মেয়েটি সে হয় জন্মরুগ্ন। মাসে তিনদিন অফিস করার যন্ত্রণা তা ওতে আছে।

কিভাবে একভাবে চেপে বসেছে যে, সবকিছু হারাচ্ছে, এ তার মনকে কেই বা বুঝায়! রাস্তায় এমন ঘটনা নেই, লোক নেই মুহূর্তেই তার মনে হতে পারে সব ভুল।

'ওমা বুড়ু– মল্লিকা না?'

'আরে শোভনাদি!'

'তুমি এদিক দিয়ে?'

'আমার এক আত্মীয়র বাড়ি এসেছিলুম, রাস্তাটা বেশ ফাঁকা তাই ঘুরে যাচ্ছি, কলেজ স্ট্রীট বাব্বা দম বেরোয়– আপনি…'

'বাড়ি চল না আমার…না না যেতেই হবে।'

শোভনার চোখে অন্য এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখেমুখে দেখা যাবে পুরুষালি দীপ্তি, যে দীপ্তি, যে কোন রমণী যে সে ঘাটের পথের বাটের পথে চিকের আড়াল হতে দেখুক, ভাল এ দৃষ্টি লাগবেই। শোভনা এখন মল্লিকার হাতটা ধরে ফেললে, যদিচ হাতধরাটার কোন প্রয়োজন ছিল না। শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সী বহুজন প্রিয়। মল্লিকার এ উষ্ণতা ভাল লেগেছিল ভারী ভাল লেগেছিল। বললে, 'চলুন।'

'চল না ছাদে বসি একটা মাদুর পেতে!'

ভারতীয় চিত্রতে যেমত বিছানা তেমনিই এ বিছানা একটা বালিশ, ওপাশে দেওয়ালে অন্ধকার। এখানে আজ আধছায়া আকাশে চাঁদ আছে। মল্লিকা ওপাশে বসে কি কথা কইবে ভেবে পায় না, দুঃখের কথা ছাই আর কইতে ইচ্ছে হয় না।

শোভনা আর একবার মল্লিকার দিকে চাইল। মল্লিকাদেখা যেমন বা তার ফুরাতে জানে না, গভীর অতি। শোভনার কানে দমকা আওয়াজ এল 'বেল ফু…' শোনামাত্রই শোভনা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'একবারটি'।

শূন্য ছাদ, চারকোনা চারকোনা এক অনুভব; উপরে আকাশে রাত্রি তদূর্দ্ধে শ্যাম নীলিমাই। মল্লিকার সমস্ত ক্লান্তিটা অথবা যে যাকে এতাবৎ আপশোষ বলা হয়, ক্রমে এখন এই প্রতীয়মান যে যে তা আর নাই। এক্ষণে, আপনার শাড়ীটা ঈষৎ আউয়ে দিয়েছিলই, এলো করে দিয়েছিলই যেখানে যেখানে করার ছিল। তার মন সত্যই যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠেছে, অন্য আর সময়ে– হয়ত

এই মনই ফুলের গন্ধ কই জোনাকি কোথায় বলে ভারী অস্থির হয়ে উঠতই, এ সত্য তার জানা। এ কারণ এই, চিরকাল ভাল লেগেছে সোডাসাবানের গন্ধ অথবা ফোড়নের বাস, এর বড় ভাল লাগা তো তার আছে। যথা তার জীবন আছে, যথা তার অমরতার দাবী আছে। শোভনার এ ব্যবহার বড আপন বলে মনে হয়, বহুদিনের শোভনাদি! না তা কেন বহু যুগের শোভনাদি, গায়ের রঙ যার হালি মুগের মতই। মল্লিকার আজ কেমন হয় যে সে শোভনার জীবন জানার প্রয়োজন বোধ করে। এখন শোভনা দরজায়, দেখা যায় তার হাতদুটি পিছনেই, আবদ্ধ সম্ভবত। গায় তার ব্লাউজ নেই– শাড়ীটা হাওয়া হাওয়া, মল্লিকা তা নজর করলে।

'ভাই বড্ড গরম আর গায় জামা রাখতে পাচ্ছি না, বুড়ু তোমায় আজ খেয়ে যেতে হবে।'

'সে কি না না–'

'না না শুনবই না, যতবারই বলেছি ততবারই না না; আজ খেতেই হবে,' বলা শেষ না হওয়ার আগেই শোভনা বসল। এবার কিঞ্চিৎ নিকটেই।

সদ্য ফুলের বিনীত গন্ধ এখন সমস্ত আবহাওয়া, এমনও যে বহুদূরে আকাশে নক্ষত্রে এবং গভীরতায় প্রভাব হানলে, আর এইখানে পুরাণের এক উদার স্বাধীনতার স্বাদ আনল যে সে ফুলের গন্ধ ছিল এমতই জোর। সে ফুলের শ্বেতরূপের সঙ্গে চন্দ্রালোকসম্ভব কৃষ্ণময় সবুজতা, অথচ কোন কাঠিন্য নাই অথচ কোনক্রমে অশিষ্ট নয়; একটি নদী ঝটিতিই ব্যগ্রভাবে নিমেষেই নেমে সম্মুখে এল– অঞ্জলিবদ্ধ ফুলসম্ভার, এ কারণেই, এর উত্তরে– যে নিশ্বাসপ্রযুক্ত মহিমান্বিত মরজগৎ যে সে তা লক্ষগুণে বর্দ্ধিত হয়েই, যুবতী যৌবনার সম্মুখে উদোম স্পষ্ট হয়ে উঠলই। এখন মল্লিকা এ ফুলের মায়ায় থ, বেবাক্। কোনক্রমে আপনার চক্ষুদ্বয় তুলে শোভনার চোখের উপর ধরলে, সেখানে যে হাসি পাথর হয়েছে সে পুরুষেরই এমতই। বাঁ হাতে, হাওয়াকৃত আন্দোলিত চুলগুলি যখন সে ঠিক করেছিল, আর আরও বিচক্ষণতা সহকারে মনটা সে ঠিক করতে চাইলে, এসময় শুনলে, 'তোমার জন্য, নাও না তোমার জন্যে'–শোভনার গলা, রাতজাগা শেষরাত্রের গলার কিছু। অবশ্য অসভ্য অর্থও করা যেতে পারে। আবার সে বললে, 'পরো না খোঁপায় না গলায়...'

মল্লিকা বুক যেমন হিম শুধু আতিশয্যেই। আপনকার গলা পরিষ্কার করে বললে, 'আচ্ছা সে আচ্ছা শোভনাদি...না থাক...।'

'বলো না বলো না।'

'আচ্ছা আপনি কখনও কাউকে ভালবেসে...'

মল্লিকা, শোভনা তার হাত দুটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড় করলে না অথচ বিজ্ঞরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।

এবার শোভনা খাদের গলায়, 'কই তুমি তো আমায় খেলে না ? তুমি আমার ভালবাসো না ?'

'বাসি !'

মল্লিকা শোভনাকে বিশেষ অপটুতার সঙ্গে গভীরভাবে চুম্বন করলে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে, 'আগে কাউকে কখন এমনভাবে...'

'হ্যা...আচ্ছা আপনি ?'

'আমায় তুমি বলো, আমি তোমার কে ? বলো ?'

'আচ্ছা তুমি ?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধহয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি—'

'বউ'

শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। শোভনার মুখস্রুত লালা মল্লিকার গালে লাগল।

(চতুরঙ্গ, ১৩৫৮ বৈশাখ-আশ্বিন .

মতিলাল পাদরী

হাঁসদোয়ার শালকাঠের ক্রুশটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। দূর নিমড়ার টিলা থেকে, দূর সাগরভাঙার উৎরাই থেকে এবং আর আর অনেক গোয়াল, বাথান, গ্রাম থেকে দেখা যায়। এ কারণে যে, গির্জ্জাটি কষা হাঁদা জমির উচ্চে অবস্থিত। প্রতি প্রাচীন জ্যামিতিক চিহ্ন নীল আকাশের মধ্যে; কি চাঁদের আলোয় অথবা হুণ সূর্য্যের দাপটে সমানই বিস্ময়কর এবং শান্ত। কঠিন জ্যামিতিক চিহ্নের মধ্যে এত বেদনা অটুট হয়ে থাকে তা কে জেনেছিল, যে বেদনার ভার প্রাণের মাধুর্য্য চিরকালই বইবে।

ঢ্যাঙা ইউকালিপ্‌টসের সারির ফাঁকে বিলাতি কুঁড়ের মত ছোট গির্জ্জাঘর, দেওয়াল যথাযথ পরিষ্কার করে নিকানো। তবুও আঙুলের বাহাদুরী লাল হয়ে আছে। বাঁশের সতরঞ্চ করা জানলা, ঘরে মেজেয় বিশুদ্ধ এক কোণে অনেক মাদুর জড়ানো; রবিবারের অথবা স্মরণীয় কোন দিবসে সবগুলি পাতা হয়। সম্মুখে 'পবিত্রতা'র ছবি; নিম্নে লম্বা টেবিলে অনেক রঙীন বাতি, ধূপদান, ইতস্তত ফুল বিক্ষিপ্ত। এর পাশেই মাটি থেকে ওঠা অলটার নিখুঁত সাঁওতালী কারু-নিপুণতা। গির্জ্জার দু'পাশে সবুজ মাঠ (যা এখানে অসম্ভব) ফুলের মাদা কেয়ারি করা ক্যানা গাছ। একান্তে একটি ঘণ্টা লাটঠা।— এর গা বেয়ে পাক দিয়ে ওঠা সবুজতা। উপরিস্থিত ঘণ্টার দড়িটি অনেক নীচে বাঁধা। বহু যোজন খর জমির মধ্যে এইটুকুই নয়ন অভিরাম হরিৎ শোভা। মতিলাল পাদরী অনেক পরিশ্রমে এইটুকু আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এখানে লোকে সন্তর্পণে পা দিত; পাছে পাপ হয় তাই সভয়ে বিচলিত পদে, কাপড় সামলে গির্জ্জায় আসত। মতিলাল সত্যিই বড় পুণ্যের স্থান করে রেখেছেন। পাশের কুয়া থেকে বাগান ভাসিয়ে নিত্য জল দেওয়া হয়, কেউ না আসলে এই বয়সে তিনি নিজেই জল দেন ওপাশের আর একটু নীচু জায়গায়, যেখানে কিছু পাতাবাহার কিছু খুরুশ আর মাঝে মাঝে অনুচ্চ বেদী। বেদীর উপরে লাল পাতার ক্রুশ। একমাত্র মতিলাল পাদরীর মায়ের কবরেই কাঁঠাল কাঠের ক্রুশ ছিল। আত্মার শান্তিময় ক্রোড় বিবেচিত হলেও, পাখীরা— কখনও পরশ খঞ্জনা

অথবা চীনা বুলবুল, এছাড়া কাক চিল সেখানে বসত। প্রথম প্রথম মতিলালের খারাপ লাগত, তিনি ভেবেছিলেন একটা কাকতাড়ুয়া করব যাতে কাক চিল না আসে। তারপর ভেবেছিলেন সেটা বড় খারাপ দেখাবে। পরে ফুললকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, 'একটা গুলতি করে মেরে তাড়াব।' পেয়ারার ডাল দিয়ে গুলতি করবার সময় মনে হল, এটা ঠিক ক্রিশ্চানসম্মত কাজ নয়, যদি লাগে পাখীদের! তিনি সত্যই দুঃখ পেয়েছিলেন। ফলত গুলতি স্থগিত রইল।

মতিলালের চাইবার কিছুই ছিল না, শাস্তি নয় কিছু নয়। বিচারের ভীতি তাঁর কোনক্রমেই ছিল না। শুধুমাত্র একটি আশা, পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান। পুরো ক্রিশ্চান বলতে অর্থাৎ কথাটার মধ্যে বহু পুরাতন প্রেমের অনুভব ছিল, অনুতাপ নয়। তাই পাশাপাশি পাঁচ-দশ মৌজায় এমন কোন স্থান নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি একথা না ভেবেছেন। সুদীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন-ক্লিষ্ট মানুষটির ছায়া কোথায় না পড়েছে।

দীর্ঘ শালবল্লা থেকে তাঁর দেহটা যেন কুঁদে তোলা— মাথার প্রথমেই টাক, তারপর লম্বা চুলগুলো কাঁধে এসে পড়েছে। কানে গলায় ময়লার স্তর, পরনে অতি পুরাতন কালো শতচ্ছিন্ন আঙরাখা। ক্রিশ্চান হবার বাসনা নিয়ে এক টিলা থেকে আর এক টিলায় বহুবার পার হয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন।

গির্জ্জাঘরের পিছনে বহুদূরে তার খোড়ো চালা। বারান্দায় ইজি চেয়ার, মনে হয় বসলেই পড়ে যাবে। সকালে এখানে বসে যখন মানুষের জিব দেখেন, চোখ দেখেন, নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ কাটে, তখন আর্ত্তরা আর এক ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পায়, সভ্যতার দিকে এগিয়ে আসে। কেউ জলচৌকিতে বসে নীতিবিচার শোনে, বিশ্বাসের কথা শোনে, তাদের রক্ত স্থিরতা লাভ করে। সামনে ছোট বাগানে যখন গীতসংহিতা হাতে পায়চারী করেন, তাঁর লতার অগ্রভাগের মত দেহটা কি যেন জড়িয়ে ধরতে চায়, তখনই দেখা যাবে দূরে বসে কোন বুড়ী তার ডালপালার বোঝাটা পাশে রেখে, বসে বসে কিছু পুণ্যের পথের হদিশ আশা করে; আর তিনি, এই উধাও হা-হা করা ফাঁকের মধ্যে একটি পুরাতন ক্রিশ্চান, কিছু কিছু বলেন।

এখন আষাঢ় মাস। ভারী ঝড়, ভারী জল। কামাসক্ত আলিঙ্গনের মধ্যেও দুস্তর পারাবার সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমাগত বিদ্যুৎরেখা, ঘোর কৃষ্ণময়ী রাত্রি। কক্ষস্থিত লণ্ঠনের শিখা পর্য্যন্ত কাঁপছে। মতিলাল তক্তপোশে, বাইবেল খোলা,

তবু তাঁর কানটা যেন কোথায় ছিল। মতিলাল টেবিলস্থিত আলোর দিকে চাইলেন, উপরেই 'তাঁর ছবি' সেখানে একবার নজর পড়ল, কিছু হয়ত বলেও ছিলেন।

এমন সময় মাথায় একটা পেকা দিয়ে ভুলুয়া এসে দাঁড়াল, ইচ্ছা করে বেশী কেঁপে বললে, 'যেমনি বরখা···কি বা ঠাণ্ডা গো· ·'

মতিলাল কান খাড়া করে অন্য কিছু তখনও শুনছিলেন। একবার ভুলুয়ার দিকে চেয়ে পরে খোলা দরজার বিদ্যুৎপীড়িত অন্ধকারের দিকে তাকালেন।

'কি বরখা গো···খাবেন নাকি গো?'

'ওরে কুকুরটা এত ডাকছে কেন রে?'

'উ বেটা ভারি পাজী গো, বেরাল টেরাল দেখছে মনে লয়, মারব এক ঠ্যাংআ?'

'একবার ভুকভুকিয়া (টর্চ) ফেলে দেখনারে'

'তুমি দেখ গো, আমার ভাত পুড়বেক, আম যাই গা'—ভুলুয়ার জবাব রুক্ষ নয়। পাদরী যেন এদের মা।

পাদরী কোমরের দড়িটা একটু এঁটে, খড়ম পায়ে বাইরের বারান্দায় এলেন। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, কুকুরটা গির্জ্জাঘরের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে। টর্চ্চ জ্বলল কিন্তু আলো ঘিমিয়ে আছে, শুধুমাত্র বৃষ্টির দাড় দাড়ি রেখাই স্পষ্ট হল, গির্জ্জাঘরের আলোর রেশ এখান থেকে স্পষ্ট, শুধু দরজা পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাদরী ঘরে এসে কি ভাবলেন, তারপর ছাতি নিয়ে কোনমতে ঝোড়ো হাওয়া এবং জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গির্জ্জার জানলার ফাঁক দিয়ে উঁক মেরে দেখতে চেষ্টা করলেন। পবিত্রতার ছবিটা একটু দুলছে, নিম্নে সেজের বাতির শিখা উপদ্রুত, ওপাশে ঝিম লণ্ঠনের ভীত আলো। মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, দরজা পড়ার শব্দের মধ্যেও তিনি অস্থির গোঙানির আওয়াজ শুনলেন, জানলার বসানে মুখ রেখে দেখতে গিয়ে গাল তাঁর ঘষে গিয়েছিল।

কিছুটা সেজের লণ্ঠনের, বিশেষত বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল একটি সাঁওতালীসদৃশ স্ত্রীলোক, যার কর্দ্দমাক্ত হাত দুটি মাটির সঙ্গে এঁটে আছে, পা দু'খানিও কর্দ্দমাক্ত এবং দুইদিকে বিভক্ত, বিস্তৃত হস্তপদদ্বয়ের মধ্যে বিবস্ত্র দশাসই দেহটাই কিসের সঙ্গে যেন বা লড়তে গিয়ে কোন এক বেদনায় সেতুর মত বক্র হয়ে উঠেছে। এক কোণে, একটি কাপড় বিরক্তিত ভাবে বসা মুরগীর মত ফুলে

ফুলে উঠেছে। তার মুখের দু'পাশে কষ, আর অসম্ভব গোঙানি। প্রাকৃতিক শব্দ ভেদ করে, সমস্ত স্মৃতিকে ছাপিয়ে জিগির দিয়ে ওঠে।

এইটুকু তিনি বুঝেছিলেন যে মৃত্যুর গোঙানি এ নয়। এ এক অন্য, পুরুষ এই বেদনার কাছে নাবালক। তবু হলকর্ষণের শব্দে যেমন আনন্দ থাকে এখানে সেটুকু ছিল। এখানে, লতাপাতা জল ঝড় মাটি পাথর সকল কিছুর, এমন কি জড়তার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত হয়েছিল। কুকুরটিও জানলায় পা দিয়ে উঠতে চাইছিল, মতিলাল পাদরী তাকে সরিয়ে কোনক্রমে এপাশের গির্জ্জাঘরের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

কালো দরজাটা হড়াস করে খুলে নড়তে লাগল। এ ঘোর জলেও তাঁর দেহ কি এক সত্যদর্শনে বিব্রত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিরাট পাহাড় ধসে যাওয়ার যে গম্ভীর বজ্র ব্যাপার, প্রকাণ্ড প্রমত্ত সমুদ্রের দেহের ছোট নদীতে ঢল ঢুকে পড়ার যে প্রলয় অমোঘ ব্যাপার, তার থেকে ঢের ঢের বেশী এ দৃশ্য! চন্দ্র সূর্য্য তারকা নেই; শুধু প্রসিদ্ধ রক্তের জোয়ারের উত্তাল অলৌকিক শব্দ। যে রক্ত স্তিমিত আলোয়, বিদ্যুৎ এমন কি, কালোর পরিবর্ত্তে অধিক লাল। মাংসল বীজ বিদীর্ণ করে ফেটে ছিঁড়ে, অন্ধকারবিরোধী একটি হাতিয়ার আসছে, অথবা ধরা যাক, আর একটি বৃক্ষ; যে বাসা দেবে, ছায়া দেবে, বৃষ্টি আনবে! অথবা শুধু মাত্র সন্দেহের পিণ্ড যা অজস্র আখছার! এ পিণ্ড আর একটি। দরজা আবার পড়ল আবার খুলে গেল, সম্মুখে পবিত্রতার ছবি, নিম্নে আধো অন্ধকারে বিদ্যুৎ-পীড়িত এই রমণী! যাকে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল অখণ্ড আকাশের শরতের লঘু মেঘ—যা হঠাৎ গির্জ্জা থানে ঢুকে পড়েছে।

পাদরী বড় বড় চোখে শুধু চেয়েই রইলেন। হাত থেকে ছাতাটা তাঁর পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে ধরবার ক্ষীণ চেষ্টার ভদ্রতা মাত্র করেছিলেন, ফলে শরীরটা তাঁর বক্র হয়েছিল। ছাতা এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্যানা গাছের ঝোপে গিয়ে নড়তে লাগল। কুকুরটা ততখানি দৌড়ে গিয়েছিল। মতিলাল পাদরী এখনও দরজায় বিমূঢ়, হাত দুটি আপনা থেকেই নমস্কারে পরিণত। সেখানে একটি নীল সজীহীন শূন্যতার মধ্যে আরবী তাঁবুর হিজিবিজি, একটি গভীরতা। এ নমস্কার তাঁর স্বভাববশতই এসেছিল, অন্য কিছু নয়।

এ সময় তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল; জল আঙরাখা বেয়ে হু-হু করে পড়ছে। দাড়িটা একবার নিঙড়ে, লাফ দিয়ে উঠে তিনি ছুটলেন, যা সত্যিই তাঁর পক্ষে

অসম্ভব—একে আঙরাখা বৃষ্টিতে জগদ্দল এবং দেহ বৃদ্ধ রুগ্ন—তবু কবরখানার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে, নীচে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে বিঘে দুয়েক জমি পার হলেন।

বেড়া ধরে দাঁড়াতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলেন, 'ফুলল! ফুলল!'

ফুলল ঘরের দাওয়াতেই ছিল, তাঁকে দেখে পেকা মাথায় দিয়ে দৌড়ে এসে বললে, 'কি গো বাবা?'

'ওরে গির্জ্জেঘরকে…'

'কি গো?'

'ভয়ানক তড়কা ব্যাপার গো…বুঝতে লারলাম!'

'সে কি গো…'

একটু দম নিয়ে আর একদমে সব কিছু যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়ে চোখ বড় করে ফুললের দিকে তাকালেন।

ফুলল চোখ বড় করে বললে, 'তবে মাগী বিয়োবে নাকি—বিয়োচ্ছে নাকি পাদরী বাবা?' বলেই নিজের মাথার পেকা পাদরীর মাথায় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দাওয়া থেকে একটা পেকা মাথায় দিয়ে এল।

পাদরী বেড়া ধরে বেপথুমান। বিদ্যুতের আলো পড়ল, চোখ বড় বড় করে বললেন, 'তাহলে—এখন?'

'কি সব্বনাশ গো! গিজ্জা…'

পাদরী জোর করে বেড়াটা ধরে বললেন, 'তাহলে…' অসম্ভব লজ্জিত ভীত এ যে তাঁর নিজেরই দোষ।

'তাহলে আর কি বীণা হাড়িকে ডাকি গা,' বলেই সে অন্ধকারময় স্রোত-বওয়া রাস্তা দিয়ে ছুটল। পাদরীও পেকাটা এক হাত দিয়ে চেপে তার পিছু নিলেন। কুকুরগুলো তাদের কাছে ছুটে আসছে, তারা হেই-হেই করে তাড়া দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আর ফুলল মাঝে মাঝে হাঁকছে, 'কি সব্বনাশ গো আ।'

বীণার বাড়ি। বিদ্যুতে স্পষ্ট হল যে, দাওয়ায় বসে বীণা তামাক খাচ্ছে। প্রথমে ফুলল এসে দাওয়ার খুঁটি ধরতেই দেহটা দুলে গেল। মাথাটা নীচু করে সকল কথা বললে, এমন সময় পাদরীও এলেন। কথা কটা শুনেই বীণা দাঁড়িয়ে উঠল। চালে গোঁজা কয়েকটা বাঁশের অস্ত্র নিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে পেকা মাথায় দিলে।

তিনজনই খর পায়ে। পাদরীর মাথা থেকে কখন যে পেকা উড়ে গেছে, তা তাঁর খেয়াল থাকলেও ভাববার সময় ছিল না।

গির্জ্জাঘরের সামনে কুকুরটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, তাদের দেখে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বীণা খড়ছেঁচা জলে অস্তরগুলো ধুতে ধুতে বললে, 'হেই মিনষে উঁকি মারছিস কেন, শরম সহবত নাই, মারব এক লাথি'—বলে লাথি ছুঁড়লে।

ফুলল লজ্জায় দরজার এক পাশে দাঁড়াল। পাদরী দাড়ি নিঙড়ে মুখ মুছতে লাগলেন। বীণা বাঁশের অস্তর থেকে জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'এক হোলা আগা, লিয়ে এসো গা, আর একটা লণ্ঠন, তড়পা তড়পা খড়, গরম জল...'

বীণা অস্তরগুলো মাথায় ঠেকিয়ে 'দুর্গা দুর্গা মা ষষ্ঠী!' বলে গির্জ্জেঘরের, এদিক ওদিক চেয়ে দেওয়াল ঘেঁষে এসে দূরের কাপড়টা তুলে অস্তর মুছতে মুছতে সেই বিরাট স্ত্রীলোকটার দিকে তাকাল। এখন বিদ্যুতে মুখ তার দেখা যায়, হাওয়ায় চুল মুখে উড়ে খেলা করে। বীণা বিজ বিজ করে কি বলতে বলতে তিনবার তাকে প্রদক্ষিণ করে অস্তর হাতে নিয়ে মেয়েটিকে গড় করে প্রস্তুত হল। হোলায় আগুন, লণ্ঠন, খড় নিয়ে এসে ফুলল দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ করে বললে, 'আনছি গো'।

'চোখ বন্ধ করে দুয়ার দিয়ে ঠেলে দাও হে...দিয়ে দরজা শালাকে চেপে ধর।'

জিনিসপত্তর দিয়ে ফুলল আর পাদরী দরজার কড়া ধরে সিঁড়িতে বসলেন। ভুলুয়া এসে উঁকি মারতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পাদরী তাকে শুধু বললেন, 'ভুলুয়া!'

'আচ্ছা দুটা পেঁয়াজ পুড়াইয়া এসে দেখব গো,' বলে সে কোনমতে চলে গেল।

দু'জনেই কড়া ধরে নির্ব্বাক। দরজায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, ওরা এক একটি কড়া জোর করে ধরে বসে।

অনন্তর ক্রন্দনের শব্দ ঝোড়ো হাওয়ায় কভু বা চাপা কভু উত্থিত হয়। এই ক্রন্দনের শব্দে, কালো মেঘবদ্ধ আকাশে বক উড়ে যাওয়ার ছবি, অথবা নীল দিব্য আকাশে পায়রার কথাই বার বার করে পাদরীর মনে হয়েছিল। শায়িত মেরুদণ্ড শুধু খাড়া হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাই এ ক্রন্দনে ছিল না, একটু আলোও ছিল। সুতরাং পাদরীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ আবার মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিকট শব্দ প্রকম্পিত হয়ে আর এক স্তব্ধতার সূচনা করলে এবং পরক্ষণেই বীণার চৌকিদারী আওয়াজ 'হে হো বেটা-ছানা গো ছেইলা হে।' কথাটা যেন দূর ঊর্দ্ধ থেকে ক্রমে নামল।

দু'জনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, ফুলল পাদরী বাবার দিকে চেয়ে সে কিছু শোনবার আশা করেছিল। তারপর হিহি করে হেসে বললে, 'হিঃ বেটা ছানা…।'

পাদরীর হাত আস্তে কড়া থেকে খসে গিয়েছিল, ফুলল খপ্ করে সেই পাল্লার কড়াটা ধরে ফেলল। পাদরী হাঁটুর উপর কুনুয়ের ঠেস রেখে গালে হাত দিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবতে মনস্থ করলেন। বুড়ো মানুষ, পরিশ্রম হয়েছিল, দাড়িটা আঙুল দিয়ে খেলাতে খেলাতে আপন মনে বললেন, 'কি বললে হে'—যদিও স্পষ্টই তিনি শুনেছিলেন, তবু সুনিশ্চিত হওয়ার যেন প্রয়োজন ছিল।

ফুললের ঠোঁট নড়ল, কিন্তু শব্দ হল না। কান্নার শব্দ ঝড়কে দাবিয়ে উঠতে চায়। বিশাল অজর প্রকৃতিকে ভীত করতেও চাইছে, আর রোমাঞ্চিত পাদরী কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছেন, এ ঘোর রাত্রে এ কি অসম্ভব কাণ্ড! এত জায়গা থাকতে এই গির্জ্জাঘরে! তাঁর বিস্ময়, মনের মধ্যে কি এক অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছিল, তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল, শিশুর কান্নার পিছনের অর্থ যে মন খোঁজে, সেই মন দিয়ে পাদরী কি এক অর্থ খুঁজতে চাইলেন, ক্রমে বৃদ্ধ পাদরীর ভাবান্তর হল। বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে ধীরে বাগানে এসেই জলের উপরেই হাঁটু গেড়ে বসলেন, করজোড়ে শুধু বলেছিলেন…'প্রভু!'

এই প্রার্থনা অসহায় মানুষের বোকামীর জন্য নয়, বিকারের জন্য নয়। বহুদিন পর এ প্রার্থনায় প্রশ্ন ছিল, হতবাক বিমূঢ় চিত্তের প্রশ্ন। এই মেঘঘটা ত্রস্ত রাত্রে, বিদ্যুতে জনসাধারণ ভীত, পৃথিবী গুহাবৎ, ধর্ষিত ক্ষিপ্ত হারমানা বনরাজি— এ হেন সময়ে, এ দীন দুঃস্থ গির্জ্জাঘরে কে জন্মাল? খরধার বৃষ্টিতে তাঁর দেহ বিধ্বস্ত হয়ে উঠছিল। সহসা তিনি যেন এক বর্ণচ্ছটা দেখেছিলেন, অন্য কিছু নয়। অনন্তর তাঁর মনে হল যে, এতাবৎকাল তিনি এই প্রতীক্ষায়ই ছিলেন? আর যে, অবশেষে এই তাঁর পবিত্র পুরস্কার এল?

ফুলল বোকার মতই অবাক হয়ে পাদরীকে লক্ষ্য করছিল। অন্যমনা হওয়ার জন্য হাত আলগা হওয়ার কারণে, দরজা বশ মানছিল না, খুলে যেতে চাইছিল। সে সজোরে টেনে রেখে তারস্বরে হাঁকলে, 'খ্যাপা হইছে হে!'

ভিতর থেকে বীণা দরজাটা টানতেই ফুলল কোনক্রমে হাত ছাড়িয়ে নিলে। বীণা গভীর স্বরে বললে, 'যাও গা, একটা জায়গা লিয়ে এসো গা ফুল ফেলব, কুদালই আনবি হে,' তারপর বললে, 'একটা চুটা দে।'

ফুলল আপনার ট্যাঁক থেকে অগত্যা একটি চুটা বার করে তার সামনে তুলে ধরলে ; বীণা হাড়ি তার অশুচি হাত চালছেঁচা জলে ধুয়ে, হাত ঝেড়ে চুটাটা নিয়ে, কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হল।

ফুলল বীণার হুকুমটা ভাল করে জেনে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। বীণা এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে কড়া দুটিকে কব্জা করে আরামে চুটাতে টান দিয়ে ফুললকে বুঝিয়ে দিলে। ফুলল ব্যাঙের মত থপ থপ করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনতে চলে গিয়েছে, চুটার ধোঁয়া ছেড়ে বীণা তার অল্প চোখ দুটি মিটমিট করে হাঁকল, 'আ হে পাদরী গো—'

বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় পাদরী তখনও প্রার্থনায় স্থির। প্রাচীন কোন-দিনের মধ্যে তাঁর স্থুল অশরীরী দেহ চলে গিয়েছিল, যে মাটিতে প্রথম প্রচার হয়েছিল। আর একজনের কথা তাঁর মনে হয়, যিনি নিজের অস্থি দিয়ে মানুষের মনে সবুজতা এনেছিলেন।

'আ হে হে পাদরী গো!'

বীণা তাঁকে এই পরিবেশে আনতে গিয়ে গলার স্বর কাঁপিয়ে তুললে। পাদরীর অসম্ভব উদ্দীপনা হল ; সংসার চিরদিনই শুদ্ধ পবিত্র, একথা তাঁর কোনক্রমেই অবিশ্বাস হয় নি, আজ আরও দৃঢ় হয়েছে। ছপ্ ছপ্ শব্দ করে এসে দরজার মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি।

বীণা চুটাতে জম্পেস টান দিয়ে বললে, 'খাড়াও গো, ছানা দেখবে কি গো? এক ঠেকা (ধামা) ছেইলা হে! গতর কি বা রাজপুত্তুল গো, হে হে রাজ-পুত্তল' বলে তার অল্প চোখ দুটি ঘুরাতে লাগল।

এমত সময় ফুলল পিঠটা বাঁকিয়ে মাথা নীচু করে আধ-ছোটা পায়ে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বীণা বলল, 'বুড়া মাথা খাইছ কি হে, এটুক হোলায় মাটি তুলতে লারব হে, বড় ঠেকা লিয়ে এস গা....।'

ফুলল বললে, 'দুঃ শালী একবারে বলবি ত' বলে চলে গেল। পাদরীর চোখ যদিও এদের দিকে ছিল কিন্তু কোথায় যেন তিনি ছিলেন। ঠোঁট অনবরত পটপট করে মন্ত্রশব্দে কাঁপছে। ইতিমধ্যে ফুলল ফিরে এল। বীণা চুটাটা নিবিয়ে কানে গুঁজে সরঞ্জাম নিয়ে ভিতরে গেল।

বীণা কোনমতে প্রসূতিকে এক পাশে শুইয়েছে। এখন খড়ের ডাঁইয়ের উপর ছেলেটি, ক্রমাগত কাঁদছে। সে আস্তে আস্তে কোদাল দিয়ে নোংরা মাটি তুলে হোলায় এবং ঠেকাতে ভরে, এক হাতে হোলা অন্য হাতে ঠেকা নিয়ে দরজায়

লাথি মারতেই তারা দরজা খুলে দিলে। তারা দু'জনেই অন্যদিকে মুখ করে-ছিল। বীণা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, হেসে বললে, 'লাও গো পাদরী, ঘরকে দেবতা আনলাম, একটা সিঁদ্‌বার কাপড় দিও গো, লাও হে পদ্ম দেখ' বলে এই বৃষ্টির মধ্যে মাথা দুলাতে দুলাতে অনেক দূরে চলে গেল। সেখান থেকে বললে, 'বিটি ছানা মাগীটা কুথাকার গো···বলে তার কেউ নাই।'

বীণার 'ঘরকে দেবতা আনলাম' কথাটা পাদরীকে এক অনৈসর্গিক আলোর মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

দু'জনেই কি করা উচিত তা ভেবে পায় নি। একজনা বাঁ হাত, অন্যজন ডান হাতে কড়া দুটি ধরে দরজা হাট করে খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অদ্ভুত নাটকীয় শিল্পী-কল্পিত ভঙ্গী দু'জনার।

মতিলাল সদ্য গোলাপী স্পন্দন দেখে হতবাক হয়েছিলেন একথা সত্য; কিন্তু বিস্মিত হননি। আর কিছু দূরে একটি মেঘতুল্য স্ত্রীলোক আর তারই সম্মুখে বীণার কথামতই এক ধামা দেবশিশু! সুন্দর একটি গন্ধও অনুভব করেছিলেন, আর একটু উপরে, চাতালে তিনি উঠে গেলেন; সেখানে বসেই করজোড়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে একটু হাসলেন, এ হাসি মানুষের প্রার্থনায় দেখা দেয়।

ফুলল খুব গম্ভীরভাবে বললে, 'সব ত হল এখন, ওই বিটি ছানার ঘর কুথা গো।'

মতিলাল সে কথা শুনেও তখনও জল-ভরা চোখে শিশুর দিকে চেয়ে। কত-বার ইতিমধ্যে দরজা পড়ল এবং খুলে গেল।

ফুলল নিশ্চিত হবার জন্য বললে 'বাপের ছেইলা বটে কেমন—তোমার কি মনে লয় বাবা?'

পাদরী কঠিনভাবে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ফুলল!' উচ্চারণে একটা ধমক ছিল। অসম্ভব কণ্ঠস্বর, তথাপি তাঁর যে দাঁত আছে একথা প্রমাণের থেকে বেশী করে ছিল হিতকর সভ্যতাজ্ঞান।

এখানকার লোকে, পাদরীকে ঢ্যাঙা বালক ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না, এমন কি তাদের ধারণা ওঁকে সহজেই কোলে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ফুলল এই ধমকে বেয়াকুফ হয়েছিল, তবু সে দমল না। জিবটা ঠোঁটে বুলিয়ে মাথায় ঝিঁক দিয়ে বললে, 'হে হে বেগোড় কি বললাম গো, ন্যায় কথাই পাড়লাম··· কুহক রহস্য নাই···'

মতিলাল নিজের ভিজে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'পরে।'

'তুমি বলছ বটে, চুপ করব বটে, তুমি এসবের কি বুঝ, পাদরী মানুষ বৈ ত

অন্ন লও। হাট ঘাট জান না···গির্জ্জাটা নষ্ট···পতিত হল···বীণা ঠিক খবর লিক।'

মতিলাল মাথা নাড়িয়ে অধৈর্য্য হয়ে বললেন, 'ফুলল তুই জানিস না এ কে উপরের দিকে তাকিয়ে একবার ধন্যবাদ দে···' মৃদু গলায় বলেই বললেন, 'ওরে যা ঝপ্ ঝপ্ করে আমার বাইবেলটা লিয়ে আয়, আমি সব কথা ভুলেছি হে···।'

ফুললও পরিশ্রান্ত হয়েছিল। বাইবেলের কথা শুনে তার গা পাক দিয়ে উঠল। যদিও সে ক্রিশ্চান তবুও বিরক্ত হল, বলল, 'তুমি কি মরবে নাকি গো! ছেইলা ত হল এখন কাপড় ছাড় গা···কুথাকার কে···লাও ওঠ।'

'না না তুই লিয়ে আয় গা···একটা লালটিন।'

'দূর বাপু···একে ঝড় ঝাপটের রাত, তার উপর শালা কচে বারো এই ছেইলা হওয়ার হ্যাঙ্গামা, আবার বাইবেল কেনে? তুমার কি ভীমরতি হইছে বাবা?'

'লিয়ে আয় গা···যা ধন···'

ফুলল বাধ্য হল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বাইবেলটা দিয়ে লালটিন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাইবেলটি গ্রহণ করে পাদরী বললেন, 'লে লালটিনটা তুলে ধর।' কথামত ফুলল লালটিন তুলে ধরলে। সঠিক পাতা খুলে, দু'বার দাড়িতে হাত বুলাতেই মন প্রস্তুত হল। ঠোঁট কাঁপছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের অস্ফুট শব্দ। এখন একটা গুবরে পোকা এসে পাতার উপর বসল, লণ্ঠন হাতে ফুলল পাদরীর ভক্তি-ভাবের দিকে তাকিয়ে টোকা মেরে সেটাকে ফেলে দিল। পাদরী পাঠ শেষ করেই বললেন, 'আমেন'। ফুললও তাড়াতাড়ি বললে, 'আমেন' বলে সে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখেই বললে, 'শালী!'

পাদরী তার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন।

ফুলল একটু থতমত খেয়ে বললে, 'না এই দেখ্ আক্কেল কি বা ধনির, কখন গ্যাছে, এখনও আসবার লাম নাই গো···হেই আসছে গো···কুথাকে গিয়েছিলে গো···শালী!' বলে বীণার উপর নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলে।

'মরতে হে, সোহাগসফর করতে হে,' এবার পাদরীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাদরী বাবা তোমার লেগে আইলাম, উয়াকে, শালা ফুলল ঢেমনাকে বল মান্য করে কথা বলতে গো···বেটা বেজাত ক্রেশ্চান···'

'হেই হেই···হাড়ি···দেকো পুষী (হিন্দু ছোট জাত)।'

এ সময়ে ঠিক এমন ছ্যাচড়ামির জন্য পাদরী প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সত্যি

বড় কষ্ট হচ্ছিল। গর্ত্তে মুখ রাখা খরগোসের মতই তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন। বার বার তাঁর সে সমাহিত ভাব দুমড়ে যাচ্ছিল। বীণা হাড়ি তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝেছিল, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। বললে, 'তোমার কিরে (দিব্যি) মাইরি মদ খাই নাই, দুটা ভাত লিয়ে এলাম, রাত এঠেন থাকব, আমি চুটা তামুক খাব?'

'ইটা গির্জ্জাঘর বাপ্, এখানে নাই বা খেলি। আমার কোঠায় আয়...'

'আমি আতুড় ছাড়ি ঘন ঘন যাব সে কি গো? তা ছাড়া কুথাকার, কুলশীল বেজানা, থানা মৌজার ঠিকানা নাই, সে তোমার এখানকে বিয়োতে পারে, তাতে ঘাট-দোষ নাই...বাঃ হে বাঃ...।'

ফুলল বীণার এ উক্তি সমর্থন করে পাদরীর দিকে তাকাল।

কতগুলি হীন নোংরা-মাখা হাত যেন পাদরীকে জড়াতে চাইল, তিনি যেন আরও সরু হয়ে গেলেন, শুধুমাত্র অসহায় শব্দ করে বললেন, 'বীণা, চিনিস না গো ইয়াকে...।'

বীণা এতক্ষণ হাতের পুঁটলিটা নামিয়ে রেখে, পাদরীর কথা শোনার থেকে বেশী উত্তর দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। যাত্রাই ঢঙে হাত দুটি দুলিয়ে বললে, 'ওহো কত থানা, হাট ঘুরলাম, কখনও উয়াকে দেখি নাই...আর লিজে মাগী বুললে উয়ার কেউ নাই! সে বিয়োতে পারে, আর চুটা খেলেই দোষ...?'

'আমিও বলি ইটা বড় খারাপ হল গো,' ফুলল বললে।

পাদরী মুসকিলে পড়লেন। এদের কথাবার্ত্তা তাঁর মনকে একটু মলিন করবার চেষ্টা করছিল। একবার ভাবলেন বলি, 'ছোট ছেলে আছে...চুটা খাওয়াটা ঠিক নয়...' কিন্তু একথা বলার পূর্ব্বেই তিনি বলে ফেললেন, 'ওরে কে জন্মাল তোরা তা জানিস না—'

'এই লাও' ফুলল বীণার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করলে।

বীণা তেমনি ঢঙে বললে, 'হে হে, আমি খালাস করলাম, লাড়ী কাটলাম, যত্ন নিলাম, আর আমি জানি না...তুমি।'

বালকের মত চেয়ে থেকে, সেই একই বিশ্বাসের কথা পাদরী সরল মনে বললেন, 'কে জন্মাল তা জানিস না হে।'

বীণা হাড়ি অত্যন্ত পাজী, সে কোমরে হাত দিয়ে, এক পাক সখী-নাচ নেচে বললে, 'তোমার কথা শুনে নাও খুব নাচলাম...এবার জাত খোয়াব ক্রেস্তান হব!'

এমন যে ফুলল, তার এ নাচ ভাল লাগেনি, সে একটা ধমক দিয়েছিল।

পাদরীর এ ব্যাপারকে অত্যন্ত গর্হিত মনে হতে পারত, কিন্তু তা হল না। অসহায়ভাবে হেসে বললেন, 'বীণা যদি বেঁচে থাকিস ত বুঝতে পারবি, আমার ডাকা সফল হয়েছে।' বলেই আবার ঘরের ভিতর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। বাতিদানের উপরে পবিত্রতা, নিম্নে কর্ষিত ক্ষেত্র, সম্মুখে গোলাপী স্পন্দন। দেখেই পাদরী যেন পাগলের মত এদিক সেদিক চাইলেন, এবং হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঘণ্টা লাট্ঠার দড়ি খুলে যথেষ্ট জোরে বাজাতে লাগলেন। মেঘগর্জ্জনের প্রত্যুত্তরের মত শোনাল।

বীণা বলল, 'হে রে মন্দ যা যা ক্রেশ্চান ক্ষ্যাপা হইছে গো, ড্যাকরা তুই না ক্রেশ্চান উয়াকে বাঁচা, বাঁচা গা শালা।'

ফুলল মহাবিরক্তিসূচক আওয়াজ করেছিল। অনেকক্ষণ গায়ে অযথা বর্ষার জল জমেছে, তার উপর এই সব পাগলামির খেসারত দেওয়া তার কোনক্রমেই ভাল লাগছিল না। তবু তাকে এগিয়ে যেতেই হল। বীণার কথায় তার মন খানিক স্বাভাবিক ক্রিশ্চানসুলভ হয়েছিল, গির্জ্জার মধ্যে যে কোন কাজ, বিশেষত পাদরী মতিলালের জন্য যে কোন কাজই পুণ্যের, সে কথা মনে হয়েছে।

সে গিয়ে দেখলে পাদরী পাগলের মত এলোমেলোভাবে ঘণ্টার দড়ি টানছেন। বিদ্যুতের আলোয় দৃশ্যটা ভৌতিক, ফুলল ভীত হয়েছিল। তবু সে নিজেকে প্রস্তুত করে, এগিয়ে দড়িটা নিয়ে নিতেই পাদরী বললেন, 'খুব বাজা রে' বলেই শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠে বললেন, 'জল ছাড়ছে ফুলল, ওরা সবাই আসবে, আমি বলব উয়াদের কে এসেছে··!'

'হেঃ জল থামবে না হাতী,' ফুলল বললে। সে চেয়েছিল বেদম জল বর্ষাক, সে তাতে ছুটি পাবে। এরপর ভীষণ রেগে গিয়ে অথচ বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, 'তুমি আছ আর আমাদের দরকার কি।'

আশ্চর্য্য জল রুখে গেল। অবশ্য এখানকার বৃষ্টি এইরূপের। মেঘ সত্বর উধাও, পাহাড় প্রতীয়মান, ইউক্যালিপ্‌টসের ঝিরঝিরে ফাঁকে চাঁদ স্পষ্ট। একজন দু'জন করে বেশ চাট্টি লোক কাদা ভেঙে এল। একরাশ টোকা আর পেকা জমা হল সকলেই নরকবাসী দরিদ্র, তবু নরককে ভয় করে সৎ হতে চায়, সকলেই মাঠে শান্ত হয়ে দাঁড়াল। পাদরীর ঘাড় আনন্দে নড়ছে, বললেন, 'আজ এক সোনার মানুষ জন্মাইছেরে।' এই সুসমাচার দেওয়ার পর পাদরী বললেন, 'ফুলল বাবা, বাইবেল –'

ফুলল বাইবেল এবং আলো এনে দাঁড়াল। পাঠ হল, গান হল 'জগৎরঞ্জন করি আগমন নবজীবন তুমি, করহে বণ্টন'। প্রার্থনা, 'যে এল সে নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাবে…।'

অনন্তর সকলেই গির্জ্জাঘরের কাছে এলে, কেউ জানলায় কেউ দরজায় উঁকি মারতে লাগল। নিজেরা বুড়ো বয়সেও কাঁদে বলে ও-ক্রন্দনকে তারা অবহেলা করলে না। শিশুর ক্রন্দনধ্বনি সকলেই মন দিয়ে শুনেছিল এবং সকলেরই মনে হল এ ক্রন্দনধ্বনি সাধারণ নয়।

বীণা এসে বললে, 'বুঝলে হে, এতগুলা মদ্দর লিশ্বাস ভাল লয়, ছানার গা পুড়বেক গো·· ইয়াদের সরাও বাচ্চা-খেকো মদ্দাদের।'

ফুলল কোনমতে ভিড়কে হাটিয়ে দিয়েছে। জনতার প্রত্যেকেরই তবুও শিশুর মাকে দেখার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথমত গির্জ্জাঘর তার উপর পাদরী বাবা এখানে হামেহাল খাড়া, ফলে কেউ বিশেষ সাহস করতে পারলে না।

মতিলাল পাদরীর ঠিক পাশেই আর একটি কোঠা ছিল। সেখানটা আপাতত নবজাত শিশু ও তার মায়ের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তারা সেখানেই থাকে।

বিকেল হবে হবে; এমন সময় বদন হিজড়ে এসে দাঁড়াল। পাদরী ইজিচেয়ারে বসেছিলেন, হাতের বাইবেল থেকে চোখ তুলে তিনি বললেন, 'কি রে কোথায় গিস্‌লি রে?'

'বাবা গিয়েছিলাম বটে দিদির ঘরকে গো, খেলাম কত, ফেললাম কত, এই করতে খবর হয়, তুমার ঘরকে নাকি স্বগ্‌গ থেকে বাবু আইল হে, মনকে বুললাম, কেমন সে বাবু হুজুর দেখবি গো ত আমার সঙ্গে চল।'

মতিলাল পাদরীর মনটা তার কথায় জুড়িয়ে গেল। আরও কিছু শুনবার জন্য অবাক হয়ে চাইলেন, তখনও বদন হেলে আর দোলে।

'ভাবলুম দূতবাবুর কাছে গান গাই গা, যদি আসছে জন্মে মানুষ হই, ছেইলার বাপ হই! এ জনম ত হাজা মজা গেল গো,' বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছলে।

মতিলাল পাদরী জন্মান্তর সম্বন্ধে ছোট করে বুঝিয়ে দিতে মনে মনে চাইলেও মুখে কিছুই বললেন না, যেহেতু তিনি বেশ করেই জানতেন যে কোন ফলই হবে না; এ ছাড়া বদনের কাতর উক্তির জন্য তাঁর কষ্ট হল। শুধু বললেন, 'খাড়াও বদন…' তারপর উঠে গিয়ে ভামরকে অনুরোধ করলেন।

ভামর দর্শন দিতে দিতে বেশ পটু হয়েছে। সে শিশুপুত্রটিকে কোলে করে নিয়ে বারান্দার তক্তপোশের উপর বসল। তার বসবার ধরনের মধ্যে দেবীভাব ছিল। বদন অবাক হয়ে শিশুটিকে দেখে, অঙ্গভঙ্গী করে বললে, 'বাবা গো আমি আপখোরাকী লোক, কাউকে মান্ত করে কথা বলতে লারব, সত্যিই বাবা গো স্বগ্‌গ দেখি নাই বটে তবে মহিমা বুঝলাম…'

বদনের কথায় মতিলাল কোথায় যেন বা ডুবে গিয়েছিলেন। বদন এই সুযোগে ভামরের দিকে চাইল, ভামরের গা গতর চেহারা চেকনাই তাকে খারাপ করে দিলে; কোনক্রমে সে নিজেকে সেখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসে, ছোট আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগল—

'কিসের ভাবনা লো কিসের ভাবনা,
স্বগ্‌গ এখন ঠাঁই করেছে ঘরে
আমার কিসের ভাবনা…'

এই ঝুমুর গানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। নোংরা কথা দু-একটি স্বভাববশত মুখে আসলেও সে কিছু বলতে পারছিল না। এক একবার আড়ে আড়ে পাদরীকে দেখে, এবং পরক্ষণেই গানটিকে অত্যন্ত ভাবময় করবার চেষ্টা করে সে গাইছিল আর নাচছিল, আর গাইছিল।

অন্যপক্ষে ভামর বদন হিজড়েকে দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলেও সে কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে পারছিল না, শুধু মাত্র তার দিকে শিশুর মতই হাঁ করে ছিল।

বদন শিশুকে বললে, 'আমার পানে চেয়ে আছ গো, চিনছ কি আমায়? হাঁসছ বড় যে, কি গো দূতবাবু— জন্ম জন্ম তোমায় গান শুনালাম গো' বলেই একবার পাদরীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিজের স্বভাববশতই ভামরকে চোখ টিপল।

ভামর এ হেন ব্যাপারে কিছুই সত্যই প্রথমত বুঝতে পারেনি। তখনও শিশুর মতই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বদন নাচে আর এক পাক দিয়ে এসে পুনর্ব্বার একটু কড়া কুৎসিত ইঙ্গিত করে চোখ মটকায়। ভামর এতে করে রোমাঞ্চিত হল এবং পরক্ষণেই ভীত ত্রস্ত হয়ে মাথা নীচু করে তির্য্যক চাহনিতে পাদরীকে দেখেছিল। শান্ত মূর্ত্তি। তখন তার কেমন এক অস্বস্তি হয়। শিশুর মাথা যেখানে দপদপ করে উঠানামা করে সেই দিকে চেয়ে রইল সে। হিজড়ে এখন নাচে; তার ছায়া ঘুরে ঘুরে যায় তক্তপোশের উপর দিয়ে। সে ভয়ে মুখ তুলতে

পারছে না। এখান থেকে উঠে যাবার আর কোন সুযোগ না পেয়ে ভামর ছেলেটিকে ছোট একটি চিমটি কাটল ; সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন।

পাদরী খাড়া হয়ে উঠে তার কাছে গিয়ে বললেন, 'আহা হা কান্‌ছে কেনে মাই দে গো।' তারপর বদনকে বললেন, 'ওরে বাবা বদনচাঁদ তুই যা রে এখন।'

'যাই গো মশায়, বাবা এখন আশীর্ব্বাদ কর আসছে জন্মে যেন বাপ হতে পারি··· ধম্ম যেন একটা হয়'—বলে বার বার গড় করলে।

কয়েকদিন পার হয়েছে। সেরেনডির উৎরাই অনেক বড়, এখানে বহু লোক হাল চযে। ছোট ছোট ছায়া ফেলে মস্ত মস্ত এঁড়ে কাঁড়া হালে, জলের উপর দিয়ে ঘোরাফেরা করে। বদন হাল চযে। এটা যত্নর জমি, সে জনমজুর। বদন কিন্তু তার দুঃসাহসের কথা এতাবৎ প্রকাশ করেনি, কেননা সে জানত যে সে কথা লাগসই হবে না ; আর যে সকলেই মারমুখো হবেই। তাই যত্নকে সে বলে, 'আমার মনে লয় মাগী পাঁচ হাত তোলা··· ।'

যত্ন তাকে ঝুটো তাড়না করে বললে, 'মর বেহুড়োলে (অমানুষ)' বলে হালের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে এক ঘুরতি মেরে এসে বললে, 'তুঃ শালা···' অর্থাৎ সে প্রশ্ন করেছিল।

'ওগো বলি শোন মাগী বড় সুবিধের লয়, লাঙসোঁয়ারি'

যত্ন একথায় খুব খুশি হয়, সে হে হে করে সবাইকে ডাকল। এর মধ্যে প্রায় লোকেই ক্রিশ্চান। সকলেই ইদানীং শিশুপুত্রের জন্য বেশ গর্ব্বিত। যত্নর তাদের মত দরদ ভক্তি থাকার কথা নয়, কারণ তার বিশ বিঘে জমি আছে তাছাড়া সে মন্ত্র নেওয়া হিন্দু। এবং সকলের থেকে একটু বেশী বোতলে ঝুমুরে মন। সকলে হাল ঠেলে আলের কাছে আসতেই, জলের উপর ছোট চাবুকটা মেরে যত্ন অকারণে বেশী উল্লসিত হয়ে বললে, 'তুঃ শালা হিজড়ে! শুন শুন তোমরা হে—'

'শালা বলে মান্য করলি আমার কুথাটাকে মান···' বদন বললে।

'শালা পাজী মিছাই বলছিস···এরা শুনলে বলবেক কি···'

সমবেত অনেকে এ সকল কথার কোন কিছু অর্থ ঠাওর করতে পারছিল না, শুধু তাদের দেহ অস্বস্তিতে নড়ে এবং তাদের দৃষ্টি যত্নর মুখ থেকে বদনের মুখে আনাগোনা করছিল। আর মাঝে মাঝে এই সরল মানুষেরা কিছু রগড়ের আশায় হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

'বুকের পাটা থাকে ত বল না এদের সামনে হে,' যদু বললে।

'আমি আপখোরাকী লোক, আমি কি ডরাই!' বলে বুকের গামছাটায় একটু ঠিক দিয়ে বললে, 'মিছাই বললে আমার লাভ কি গো। না কি বল…' গলাটা তার নেমে আসছিল; পরে আস্তে আস্তে বললে, 'দূতবাবুর মা…উঃ শালী লাঙসোঁয়ারি' বলেই বলদকে হেট্ হেট্ করলে, তারা চলতে লাগল।

সমবেত ক্রিশ্চানমণ্ডলী, চোখ বড় করলে, নিজেদের মধ্যে হে হে করে যখন গোলমাল সৃষ্টি করছে, তখন বদন বলদের ল্যাজ মলা দিয়ে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। যারা যারা ছিল পাপের ভয়ে এবং কিছুটা আঘাত লাগায় লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল, বলদ জোড়া এগিয়ে গেল আর বদনকে জলে ফেলে দিল। অনেকেরই নিজেদের ঠোঁট খুলে গিয়েছিল; কোমরলগ্ন ঘুনসির তামা রোদে চক্‌চক্ করে উঠেছিল। যে যার হাল ধরতে চলে গেল, বদন তখনও জলে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে।

ক্ষেত যখন ফাঁকা, তখন যদু বললে, 'উঃ শালা মিছাই বলবে কেনে উঃ শালা ত ঢোঁড়া গো…ঢেঁটার গো'

এই অসভ্য কথাটা একটু এপাশ ওপাশ হল। ফলে গির্জ্জার রাস্তায় কেউ বেরোতে গেলেই অন্যে সন্দেহের চোখে দেখত। পরিহাস তামাশা করবার মত তখনও কিছু সাহস আসেনি।

কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন যদু একটি বৃহৎ ছাগল নিয়ে এসে, পাদরীর দরজায় হাজির। চোখে তার কাজল, কাঁধে একটি পরিষ্কার গামছা।

শিশুপুত্রের নাম চারিদিকে ছড়াচ্ছে জেনে পাদরী বাবা প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এ কারণে যে, তাঁর বিশ্বাসে সকলেই প্রত্যয় করে; এবং প্রত্যয় হেতু তার চিত্তবিনোদন হয় না, প্রগাঢ় ভক্তি আসে, শিহরণ হয়।

যদু বললে, 'বাবা গো, ভালয় ভালয় খেত রুইলাম এবার ধান কাটব তাই…' বলে ছাগলটিকে দিলে, সে আরও বলেছিল, 'ফসল হইছে…হবেই দূতঠাকুর যখন আছেন…' বলে শিশুপুত্র এবং তার মাকে দেখে, ভাঙা বুক নিয়ে ফিরে গেল।

পতাকী এসেছিল আর একদিন, সে আর এক বদমায়েস। এসে কাঁদলে, বললে, 'আমায় ভাল করে দাও গো…।'

ভুলুয়ার জ্ঞানগম্য নেই, সে ভীত হয়ে পতাকীর সামনেই বললে, 'বাবা গো এদের দশা লাগা নজর…ভারী কেউটে গো…!'

পাদরী এ কথায় অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা অনুভব করলেন। পতাকী চলে যাবার পর বললেন, 'ভুলুয়া খারাপ বলে কিছু নেই…।'

'না দেখে লিলেই খারাপ হবে গো, বেগুন না দেখে লিলেই কানা দিবে, বিড়ি আদ পয়সার না দেখে লিলেই ভাঙা দিবে।'

'প্রভুর নাম যেখানে যেখানে হয় সেখানে খারাপ আর থাকে না…'

'হে হে খারাপ নাই—রোজ আমার বিড়ি চুরি করে কে? এখন আমি ট্যাঁকে রাখি…' বলে ট্যাঁক দেখালে।

ভুলুয়ার অগামারা হাস্যধ্বনি মতিলাল পাদরীকে ঈষৎ বিমনা করেছিল। ধোঁয়াটে স্মৃতির মধ্যে একদিনের কথা; ভামর সামনের তক্তপোশে বসে, কোলে তার শিশুপুত্র, আপনকার কোমরের কষি আঁটতে গিয়ে টক্ টক্ টক্ করে তিনটে বিড়ি পড়ল, তার মধ্যে একটি অর্দ্ধদগ্ধ। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাদরী চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'আর খেও না…।'

'এগুলো ভুলুয়া আমায় রাখতে দিয়েছে…।'

মর্ম্মাহত না হয়েই মতিলাল পাদরী বললেন. 'তুমি আর রাখবে না,' একটু পরে আবার বললেন, 'ভামর তুমি জান না কার মা তুমি, নির্ম্মল হও।' বলে শিশুপুত্রের ছোট পা খানি আপনার মাথায় ঠেকালেন।

ভুলুয়ার বিড়ির কথায় সে কথা মনে পড়ল। কিন্তু তবু এই নবতম পুরস্কার তাঁকে মতিলালের আর এক আনন্দের মধ্যে নিয়ে জমা করে রেখেছিল।

অনেকে অনেক কথা আলোচনা করছে। ফুলল একদিন এসে বলেছে, 'বাবা তুমি বল আমরা কি জবাব দিব!'

স্থির পাদরী বাবা তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, 'ঈশ্বর আছেন।'

ফুলল অবশ্য নিজেই না হয় অবোধ ভুলুয়া মারফৎ প্রশ্ন করেছে, সব থেকে তারই উৎসাহ বেশী। বহু হাটে অনেক লোককে সে প্রশ্ন করেছে সঠিক উত্তর কখনও পায়নি। প্রথম দিনের ধারণাই এখনও তার বদ্ধমূল, 'মাগী লষ্ট দুষ্ট।' ভামরেরও দোষ আছে, ভুলুয়াকে সে বলেছে, রায়নায় বাড়ি, ফুললকে বলেছে সারেঙ্গা, আর কাকে বলেছে বেলপাহাড়ী।

ফুলল প্রায়ই বহুদূর গ্রামের লোক চৌকিদার নিয়ে এসেই বলে, 'দূর গাঁয়ের লোক আসছে রাজাকে দেখতে গো…।'

মতিলাল এতশত বুঝতে চেষ্টা করেন না। ভামর ছেলে কোলে করে ভীত

ইঁদুরের মত চেয়ে থাকে, আর মনে মনে জপ করে পাদরী বাবা না উঠে যায়। পাদরী উঠে গেলেই দর্শনার্থী চোখগুলো ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, আর ফুললকে একাই প্রশ্ন করে, 'তোমার মানুষ কোথায়, দেশ কোথায়?' ভীত ভামর চোখ মোছে।

এইভাবে অনেকদিন চলে গেল, ভামর যে কে তার হদিশ কেউই করতে পারল না।

ভামর যেন মনে হয় পাগল হয়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যায় পাদরী যখন গির্জ্জা-ঘরে প্রার্থনায় সমাহিত, ভামরের বিরাট সুন্দর দেহটি এখানে এসেই পাথরের মত হয়ে গেল। নিশ্চল ভামর কখন যে পাদরীর পা ধরেছে তা সে নিজেই জানত না, পায়ের তলায় তার মুখখানি, কেশদাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, অশ্রুজলে মাটি সিক্ত।

পাদরী তার উষ্ণ অশ্রুজলের ছোঁয়ায় আরও ধীর, শুধু মুখ ফিরিয়ে দেখে পা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আলুথালু ভামর কোনমতে মাটি থেকে এবার চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলে, 'বাবা…।'

'গির্জ্জা থানে মানুষের পায় হাত দিতে নাই ভামর।'

'আমার কি হবে?'

'লোক অনুতাপে নূতন জীবন পায় গো মা! তুমি অনেক অনুতাপ করেছ তাই এই নূতন জীবন পেয়েছ—যে জন্মেছে তাকে চিন—অতি বড় সাধু হে… সে তাঁর নাম প্রচার করবে হে…।'

পাদরী সন্ধ্যায়, রাত্রে, প্রাতে শিশুপুত্রের সামনেই প্রার্থনা করেন। এখানে বাক্য নেই, শুধু মন স্থির করা ছিল। কখন শিশু মায়ের কোলে শায়িত, কখন কোলে, কখনও স্তন্যপানকালে। এছাড়া টিলায় টিলায় মধ্যরাত্রে ত প্রার্থনা আছেই।

একদা মধ্যরাত্রে, পাদরী বারান্দায়। টিলায় যাবেন বলে তৈরী হচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন ভামর অদ্ভুতভাবে আপনার ঘর থেকে বার হয়ে আসছে, এ অন্ধকারেও তার চোখে শুধুই সাদা, মণি বলে কিছু যেন নেই। তাঁকে দেখেই ছুটে এসে পায় পড়ল। শুধু অস্ফুট স্বরে বললে, 'বাবা…।'

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বললেন, 'প্রভুকে ধন্যবাদ তুমি নবজীবন

পেয়েছ মা। একে দেখ,' বলে শিশুপুত্রকে দেখালেন।

ভামরের জন্য মতিলাল পাদরীর বড়ই কষ্ট হয়েছিল এবং ভালও লেগেছিল যেহেতু মন এমন পীড়িত হলেই তবেই মুক্তি।

আর এক রাত্রে। তখন ভাঙা চাঁদ নিম্ন আকাশে। এ টিলা বড় নিঃসঙ্গ। বড় বড় পাথরের ঢিবি চারিদিকে, তখন মাত্র প্রার্থনা সেরে উঠেছেন, দেখলেন ভামর খানিক স্খলিতবসনা; তাঁকে দেখে, বোধহয়, চমকে উঠে এসেই পা ধরে বললে, 'আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখ কাঁটায় আমার পা বিক্ষত··· আমার কি হবে?'

পাদরী তাকে বললেন, 'ওকে আদর কর—সব দূরে যাবে···।'

আর এক রাত্রে।

ইদানীং শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাদরী প্রার্থনা করতে যান। বড় বড় শালের ছায়ার মধ্য দিয়ে ছোট পাহাড়ী সারনদো নদী বয়ে গেছে, মাঝে ছোট জলাশয়, সেখানে অন্ধকার, এর মধ্য দিয়ে জলস্রোত। পাদরী এর পাড়ে এসে দেখেন ওপারে পাথরের উপর কে একজনা। পাদরী বললেন 'কে?'

'আমি বাবা।'

জল অতিক্রম করে বালি মাখা পায় এসে ভামরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এখানে?'

'আমি কাঁদি···ওখানে কাঁদলে আপনার খারাপ লাগবে···।'

'ছিঃ কাঁদতে নেই, তুমি তো পেয়েছ' বলে তার কোলে শিশুপুত্রকে দিলেন।

মতিলাল লোকের কথা একবার স্মরণ করেছিলেন! মনে হল, ভামরের মত শুদ্ধতা আকাশের তলায় ক্বচিৎ আছে।

শিশুপুত্র এখন সর্ব্বক্ষণ তাঁরই কাছে। এই ছোট্ট রূপটির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। পাদরীর কোলে কোলে সে অনেক মধ্যরাত্র দেখেছে, অনেক টিলায় কেঁদেছে, বিরাট আকাশের মধ্যে শিশুর ব্যাকুলতা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। কত ক্ষেতে সে পা দিয়েছে, অসুস্থ রোগীর মাথায় তার পা ছোঁয়ান হয়েছে। এইরূপে এখন সে বেশ বড়সড়। পাদরীকে বাবা বলে, দুরন্তপনা ক'রে মাঝে মাঝে বাইবেলের পাতা খুলে দেয়, তাতে তিনি নিগূঢ় অর্থ খুঁজে পান। একথা খুব আশ্চর্য্যের, খুব গর্ব্বের যে, সে কখনও একটি পাতাও ছেঁড়েনি। পাদরী 'ও প্রাণ, প্রাণ' বলে তাকে ডাকেন, সে থপ থপ করে আসে।

একদিন শিশুপুত্র কাঁধে, নিমড়া থেকে ফিরছেন হঠাৎ সরতার ছোট শা
আর মহুয়া কুঞ্জে দেখলেন একটি আসর বসেছে।

চেটাই পাতা ; যদু, জহর, বদন হিজড়ে, ভোলা পাইক, পতাকী সকলে বসে
কয়েকটি বোতল, জগা বসে কয়েকটি তিতির ছাড়াতে ব্যস্ত। পাদরীকে দেখেই
কয়েকটি বোতল আড়াল হল, যদু শুধু একটি বোতলের মুখে হাতের তালু দিে
ঢেকে বসে।

পাদরী থমকে দাঁড়ালেন, ওরা গড় করলে। তিনি বললেন, 'ও কিরে…?'

'আজ্ঞে এ আমাদের সন্ধ্যেবেলার কেরাছিন।'

'কেরাসিন ?'

'আজ্ঞে না খেলে আলো জ্বলবেক্ না গো…'

'ছেড়ে দেরে ওসব খাওয়া, দেখ না কে এসেছে…'

'দেখলাম না ?…ও তো আমাদের উদ্ধার করবে গো—আমরা এ জন্মে পাপ
করি—'

'ছিঃ ছিঃ, এখনও পাঁকে ডুবে থাকবি রে…'

'পাঁক না হলে তুলবে কো'থিকা গো…'

ক্রিশ্চানরা কেউই কোন উত্তর দেয়নি, একমাত্র যদুই দিয়েছিল। পাদরী
দুঃখিত মনে নিজের পথ নিলেন। উনি জানতেন, এরপর কলসী আসবে।

এখন অনেক রাত, হঠাৎ তাঁর মনে হল সন্ধ্যার সেই আসরের কথা। ওদের
নিষ্ঠুরভাবে 'পাঁকে ডুবেছিস' কথাটা বলা ভারী অন্যায় হয়েছে বলে তাঁর মনে
হল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁর মনে হল, ওদের কাছে গিয়ে তাঁর সত্যই ক্ষমা
চাওয়া উচিত। একবার দোমনা, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্থির। বেরিয়ে পড়লেন।

যদুর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলেন, সে ফেরেনি। জহরও বাড়ি নেই।
ফলে অনেকগুলো চড়াই উৎরাই ভেঙে পাদরী চললেন নিমড়ার দিকে। এখন
সমস্ত প্রহর ছুটে এসে ফাল্গুনে বিক্ষিপ্ত। মহুয়া ফুটছে। এই চড়াইয়ে উপরেই
সেই মহুয়া কুঞ্জ। যেই তিনি চড়াই বেয়ে এখানে, হঠাৎ কার যেন গলা শোনা
গেল, 'হেইগো, হেইগো, পাদরী বাবা আসছে…হে' কাদের যেন সাবধান সজাগ
করে দিতে চাইছে।

অদূরে, পাতার ছায়ার ফাঁকে চাঁদের আলোয় দেখা যায়, দু-একটি লোক মুখ
গুঁজড়ে পড়ে, বোতল গড়াচ্ছে, কলসী কুকুরে চাটছে, একটু নিকটে আসতেই
স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি স্ত্রীলোকের সুন্দর দশাসই দেহ। যেন ছিটকে পড়ে মাটিতে

তার মুখ গুঁজড়ে আছে। উদম নির্লজ্জ বিবসনা। হাওয়ায় চুলগুলো খেলে বেড়ায়। আর বিভ্রান্ত তিতিরের পালক ওড়ে। কে একজন বললে, 'হেইগো ভামর, পাদরী গো।' এই সেই দেহ যাকে একদিন মনে হয়েছিল শরতের মেঘসদৃশ।

কোনমতে ভামর মাথা তুলে বললে, 'বাবা, আমার কি হবে গো?'

এই বীভৎসতা তিনি আশা করেন নি। নিজের গলার স্বর নিজের কানে এল, 'নবজীবন পেয়েছ' 'তুমি জান না তুমি কার মা!' নিজেকে অপদস্থ হতে দেখে, ঠকতে দেখে, অপমানিত হতে দেখে, বুকটা তাঁর ব্যথিত হয়ে উঠল। তাঁর বৃদ্ধ ক্ষমাশীল চোখে জল এল। দেহ নিস্পন্দ, শুধুমাত্র হাওয়ায় দাড়ি নড়ছে, পিঠে যেন কেউ লাথি মেরে মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়েছে। রাগ আর লজ্জায় গলা ফুলে উঠল। চোখের জল নিয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে এসে গির্জ্জাঘরের সামনে বালকের মত কাঁদলেন। গির্জ্জাঘরে পা দিয়েই তিনি চমকে উঠেছিলেন। এখানে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না।

ঘরের পথে, রাস্তায় একবার তাঁর হাতদুটি ক্যানা পাতা ছিঁড়তে উদ্যত হয়েছিল। ঘরে এসেই আলো তুলে বাইবেল খুললেন, মন কিছুতেই বসল না। একবার ইচ্ছা হল ভুলুয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, ভামর কোথায়? ফলে বারান্দায় এসে ঘুমন্ত ভুলুয়ার দিকে চাইলেন, কিন্তু ওপাশে জানলার দিকে চাইতে গিয়ে তাঁর রোমহর্ষ হল, সেখানে অন্ধকার! চেয়ারের হাতল জোর করে চেপে খানিক বসে রইলেন, ঘামে মুখমণ্ডল সিক্ত। দ্রুত নিশ্বাসকে সরল করা তাঁর সাধ্যাতীত!

এখন গির্জ্জার মাঠে। মনে হল একবার প্রার্থনা করতে, কিন্তু দেহের অন্তরে যে মন, সে ত নিশ্চয়ই, এমন যে অস্থিনিচয় তাও চূর্ণীকৃত। যে মতিলাল পাদরী এক পলকের জন্য পরম পিতাকে ভুলে যায়, তাহলে তার আর অস্তিত্ব রইল কোথায়? ঘোড়ার ছুটন্ত পা তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এখন বুক নেই, হৃদয় কোথায়? আত্মা সে ত বাইবেলের একটি লাইন মাত্র, বিধর্মীরা যার কাগজ পুড়িয়ে ছেলের দুধ গরম করে।

কোথাকার একটা পাশবিক জঙ্গল চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লান্তি তাঁর নেই, আজকের পৃথিবী সেটুকু অপহরণ করেছে, দূরের পাপিয়ার ডাক তাঁকে ফেরাতে পারেনি যেখানে সৃষ্টির শেষ মাধুর্য্য ছিল। অকারণে নিজের মনে হল, আমার ভক্তি ছিল না, ছিল ভীরুতা।

স্ফীত নাসাপুট, উষ্ণ নিশ্বাস, কুঞ্চিত চোখ আর ভয়ঙ্কর দাঁত যখন লাগাম ধরে তখন তারা আর এক কথা ভাবায়, আর এক পথ দেখায়। শুধু মনে হল 'আমি

ঠকেছি' আর এক-একবার মহুয়া কুঞ্জের সেই উদ্ভিন্নযৌবনা দেহটির কথা মনে পড়ে, আর তিনি পাগল হয়ে যান।

একদা শুধুমাত্র প্রভুর নাম শুনে মনে হয়েছিল, আমরা সত্যই দেবদূতগণের থেকে সুখী, কারণ তাঁর নাম শুনেছি, আমরা জিতেছি। এখন শুধু মনে হল ঠকেছি। সত্যই জনমজুরের থেকে পাদরীরাই বেশী ঠকে।

বেচারী মতিলাল। বারান্দার খুঁটি ধরে নিজের আঙুল দাঁত দিয়ে যত জোরে চাপছেন ততই চোখের জল হু হু করে পড়ছে। এমন সময় আর এক কান্নার শব্দ আলো হয়ে, বর্ণ হয়ে তাঁর কাছে আসতে চাইছে। তিনি গম্ভীরভাবে সেই দিকে চাইলেন। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, ফলে লণ্ঠনের আলো কাঠখোদাইয়ের কিরণের মত হয়ে গেছে, তারই মধ্যে শিশুপুত্র—সুন্দর গোলাপী একটি বেদানা যেমত। পাদরী চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবার চোরা চাহনিতে শিশুকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। চাঁদের আলো-অন্ধকারে তাঁর মত মানুষকে এমন দেখায় না, কারণ মানুষ ত নখী দন্তী নয়। তবু চকিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল এই মতিলাল পাদরী। মাথাটা তাঁর ঘুরে গেল, বসন ভূষণ এলোমেলো হল, বিরাট একটা বাদুড়ের মত ক্ষিপ্রবেগে ঘরে প্রবেশ করেই শিশুপুত্রটিকে একটানে তুলে নিলেন। মনটা মচকালেও তিনি নিজের গতিকে ক্ষিপ্র করে রাখতে কৃতসঙ্কল্প। শিশুপুত্র হয়ত কাঁদতে গিয়েছিল কিন্তু সে কিছুই থৈ পায়নি।

শিশুটি তাঁর দিকে চাইল এবং বুঝল, এ ত পুরাতন কোল। পাদরী একবার তার দিকে চাইতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

পাদরী দ্রুত লম্বা পায়ে চলেছেন, কখনও বেসামাল, কিন্তু বদ্ধপরিকর। কতবার ক্ষেতের আল থেকে পা পিছলে গিয়েছে। কিন্তু আবার পথ। এক ছেড়ে অন্ত পথ। এটা আর একটা।

আকাশ মুক্তার মত হয়ে এল। ক্রমে আলো টিলা দিয়ে গড়াতে গড়াতে আর টিলায় যাবে। ছায়াগুলি লম্বা ও গভীর হবে। পাখী উড়ছে, ডাকছে। শিশুপুত্র জেগেই হাসতে লাগল।

পাদরীর ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি অসম্ভব কঠিন, একবার তার দিকে চাইলেন, আরবার চাইলেন। কঠোর সঙ্কল্প বুকে পাথর হয়ে রয়েছে। হঠাৎ তাঁর কপাল কুঁচকে উঠল, তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু স্থিরতায়, পাছে তিনি পুনর্ব্বার মতিলাল পাদরী হয়ে যান, সেই আশঙ্কায় পা দু'খানিকে, ওইভাবে দাঁড়িয়ে

থেকেও গতিশীল রাখছিলেন। এবং নিজের কোল থেকে শিশুপুত্রকে কাঁধে উঠিয়ে আবার চলা শুরু হল। রাস্তায় দু-একটি মেয়ে গোবর কুড়োতে বার হয়েছে, তারা ঝুড়ি রেখে পথেই এগিয়ে তাঁকে গড় করলে। তিনি কোনদিকে না তাকিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন।

এটা খোন্দাড়ির জঙ্গলের অভ্যন্তর।

তিনি থমকে দাঁড়ালেন, কত পাখী উড়ে চলে গেল। শাল কেন্দ বয়ড়া আমলকী গাছ আর পলাশ ফুটে আছে, তবু জল হয়েছে। পাতা ঝরে স্থক্ স্থক্ করে জল পড়ছে। রাতে বৃষ্টি পড়েছিল, ফলে নিম্নে বনধোয়ানির ঝরনার শব্দ আর কিয়ৎ উপরে নিস্তব্ধতা।

এই চত্বরটি আরও পরিচ্ছন্ন। আঁঠরালতা উঠে গেছে শালগাছে, নিম্নে গুলঞ্চ আর চারদিকে দোনার ঝোপ। শিশুপুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাদরী দাঁড়ালেন। আঙুল মটকাতে গিয়ে কি যেন মনে হল, সেখানে যেন প্রার্থনার কথা ছিল, আঙুল মট্‌কে প্রার্থনাকে ভেঙে দিলেন, তুই তোকারির সাদামাটা জগৎ থেকে সে প্রার্থনা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

পাদরী নিঃসঙ্গতার দিকে চাইলেন, ফোঁটা ফোঁটা জল কভু হাওয়ায় ঝর্ ঝর্ করে পড়ছে। শিশুপুত্রের এরূপ নিঃসঙ্গতা বহু জানা, বহু বিদ্‌ঘুটে রাতের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। পাদরীর আঙরাখা ধরে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে, জলের ফোঁটায় কৌতুক অনুভব করছিল আর মাঝে মাঝে···'বাব্‌বা···ও ও' বলে উঠেছিল।

বনধোয়ানির আর পত্রচ্যুত জল পড়ার শব্দকে পাদরীর মনে হতে পারত, এ যেন গির্জ্জার মধ্যে অনুতপ্ত সকালের ব্যাকুলতায় কাঁপা ঠোঁটের শব্দ। কিন্তু তিনি কুড়ুলের মতই দৃপ্ত, ছিলার মত সোজা। অন্যমনস্ক ভাবে পকেট থেকে ঝুমঝুমিটা বার করে, তার হাতে দিতে গিয়ে দূরে ফেলে দিয়েই চমকে উঠলেন। শিশু হাতীর মত আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে নিতে এগিয়ে গেল সেখানে, যেখানে পাতাগুলো দুর্ব্বল জন্তুর মত কাঁপছিল।

ইতিমধ্যে পাশের দোনা গাছটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। একটা জন্তু যেন ঝোপ ভেদ করে চলে গেল। দোনার কাঁটায় পাদরীর আঙরাখা ছিন্ন, তবু তিনি কোনমতে পার হয়ে এলেন।

শিশু যেদিকে ছিল সেই দিকে, কম্পিত গাছ থেকে ফুল দু-চারটা ঝরে পড়ল। এই ফুলঝরা তিনি পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেলেন। আর দেখলেন এক একটি ফোঁটায় বড় বড় জল পাতা খসে পড়ছে এবং শিশুপুত্র

বিচলিত আন্দোলিত পাতার দিকে অতীব খুশিতে চেয়ে আছে।

মতিলাল পাদরীর নিজের ভিতর থেকে অস্ফুষ্ট উঁ উঁ শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে চোখ বন্ধ করে আবার আস্তে আস্তে হাত খানিক নীচে নামালেন, হাতদুটি (যা করযোড়-নিমিত্ত তৈরী) ইদানীং সে দুটি কম্পিত হয়। দোনার কাঁটায় বৃদ্ধের কপাল কিছুটা ছড়েছে। অনিমেষ নয়নে দেখছিলেন, শিশুপুত্র হাত পেতে আছে। তার হাতের তালুতে পট পট করে জল পড়ে।

ভারী খুশি, শিশুর ছোট ছোট দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যায় ঝুমঝুমি তুলে ধরে আবার সেই খেলা। পাতা নড়ে জল পড়ে, খেলনা ঝুমঝুম করে ওঠে। এবার শিশুপুত্র তার একটা হাত আঙরাখার উদ্দেশ্যে তুলে দিলে, হাতটা একাই ভয়ঙ্কর ভাবে পাদরীকে খুঁজছে আর এক হাত ক্রীড়ারত।

পাদরীর আঙরাখার হদিশ না পেয়ে চকিতে শিশু ফিরে তাকালে, চারিদিকে তাকালে, ঠোঁট কেঁপে উঠে 'বা-ও-বা' বলে কেঁদে ফেলল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অসম্ভব ক্রন্দন— প্রথমদিন এমনি সে কেঁদেছিল।

কান্নার শব্দ মতিলালকে বিচলিত করলে না, সাপে তাড়া খাওয়ার মত দু-চার রশি দৌড়ে গিয়ে হঠাৎ একটা মানুষ-গভীর গর্ত্তে পিছলে নেমে পড়লেন, গা-ময় কাদা, কান্নার শব্দ এখনও আসছে। চোরের মত সন্তর্পণে উঠে, আস্তে আস্তে মুখটা অল্প বার করে রাখলেন।

এখান থেকে দেখা যায়। শিশু কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে, এবার খর জমির উপর পড়ে খানিক হামাগুড়ি দিয়ে সে কোনমতে উঠে দাঁড়াল। তার কচি হাঁটুতে দু-একটা কাঁকর লাগা, আর রক্ত।

এই প্রকাণ্ড বনভূমি, সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি, তির্য্যক্ আলোকপাত। সমস্ত কিছুই রহস্যময়। শিশুর ভীত চোখ এখনও কাকে খোঁজে, চোখ অনবরত মোছার ফলে মুখমণ্ডল মলিন হয়েছে। সে কাঁদে, এগিয়ে আসে।

আলোক ভেদ করে তার কান্নার শব্দ। পাখী উড়ে যায়, পাতা উড়ে উড়ে পড়ে আর দু-চারটে শাল ফুল পালকের মত দুলে দুলে নামে। শিশুপুত্র টলতে টলতে আসছে।

পাদরী নিজের বুকে যেন লাথি মেরে লাফ দিয়ে উঠেই দৌড়ে শিশুর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। শুধু তার ছোট দেহে মুখ ঘষতে ঘষতে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ও প্রাণ, প্রাণ।'

তার হাঁটুতে মুখখানি বুলাতে বুলাতে চোখের জলে ধোয়াতে ধোয়াতে বললেন, 'আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্!'

দেশ, ২৯ চৈত্র ১৩৬৪

তাহাদের কথা

আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্ত বেলা, পাতা ছিঁড়ে বিকালের আলোর ছিনিমিনি তার মুখমণ্ডলে, অধিকন্তু পাতার সবুজতা; এতে করে তার মনের অধৈর্য্য আরও যেন বেশী করে প্রকাশ পায়। সে ক্ষুৎপিপাসা-কাতর, না অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল।

গাড়ি আসে, কোচোয়ান পা দিয়ে পাটায় আওয়াজ করে, ছিপটি ঘুরায় এবং হাঁকে, 'আমবোনা আমবোনা' 'গড়শিমলা ই ওঃ'। অথবা সাইকেল কিম্বা গরুর গাড়ি, কভু বা কল্যাণময়ী সাঁওতাল রমণীরা— তারা নালিশ-করা-সুরে কথা কয়, তাদের দেহ বড় গড়বড় করে। কখনও বা মামলার ফিকির আঁটে কতিপয়, একজনের পায়ে বুট জুতো, সে মাথার উপর হাতের হল্কা খেলিয়ে বললে, 'লিল্‌লিহো শালা, উয়া জমি ডিহি আমি একো গরাসে খাই লুব হে! দেখ বটে,' থেমে 'সন তের শ চৌদ্দ' গলার স্বর নেমে ছিল না দূরে গিয়েছিল। আর ক্বচিৎ, ছোকরারা ফিসফিস করে কথা কয়, নিশ্চয় স্বদেশীর কথা।

মামলার সূত্রে কোর্ট, কোর্টের ঘণ্টা দূর থেকে শুনলে জ্যোতি ত্বরিতে ফাঁকা মাঠে পৌঁছে যায়, বড় অসহায় বোধ করে। এখন সে পিরানের মধ্যে হাত গলিয়ে পৈতেটা টেনে কাঁধে তুললে। হাফপ্যাণ্টটা ঢাউস। এর একটা ঠ্যাঙের মধ্যে তার সমস্ত শরীর গলে যেতে পারে। বাবুই দড়ি একটা ছিল, এখন নেই; সুতরাং সে কাপড়ে যেমত গিঁট দেয় তেমন তেমন গিঁট দিয়েছিল। ছোটার সময় অবশ্য তাকে প্যাণ্ট ধরেই ছুটতে হয়।

ক্রমাগত সে তিক্ত হয়ে ওঠে, অন্নপূর্ণা কেন যে এখন আসছে না? এর জন্য তার রাগ; সে কারণে তার অভিমান। এই রাস্তায় তাকে ফিরতেই হবে, তখন জ্যোতি তাকে দেখে নেবেই; তার মন বড় তছনছ হয়ে আছে। সে সাহস করে একবার রাস্তায় উঠল, এখন গাছের পাশে ফিরে আসছিল।

'কে বটে জ্যোতি লয়?'

জ্যোতি কোন এক সামগ্রী চুরি করতে গিয়েই হাত সরিয়ে নিলে— এমনই

তার স্বর, তথাপি বিপিন গুপ্ত মশাইকে দেখে হাসবার চেষ্টা করার থেকে মাথ
বেশী নাড়ল। বিপিন গুপ্ত কাঁধের থেকে ছাতাটা নামিয়ে শান্ত চোখ দুটিকে
তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'প্যাণ্টালুন বিলেতী নয় ?'

অসহায়ভাবে মুখটি আন্দোলিত করে জ্যোতি উত্তর করলে, 'জানি না, এক
জনা দিইছে বটে।'

'আহা হা! বাবা কেমন রে' – বিপিন গুপ্ত এ-প্রশ্নে জ্যোতির উত্তরটা মুে
দিয়েছিলেন। তাঁর নিশ্চয় কষ্ট হয়েছিল। 'তুই আর তুয়ার দিদি একবার আসি
কথা ফয়েসলা আছে বটে,' বলেই আবার হাঁটতে লাগলেন। ছাতাটি পুনর্ব্বা
ঘাড়ে খোলার কথা – হতে পারে – মনে নেই। তাঁর ক্যামবিসের জুতা জোড়া
দিকে জ্যোতি শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়েছিল। জুতা জোড়া পাঁচ খানায় ধূলালাল, ে
একবার প্যাণ্টালুনের দিকে দেখেই মুখ তুলেছিল। স্বদেশীদের উপর তার কি
ভাল ধারণা থাকার কথা নয়, বিপিন গুপ্ত স্বদেশী নিশ্চয়ই হলেও তাঁর কং
আলাদা। এ-কারণে নয় যে তিনি তাদের মাসে চার টাকা বন্ধু-ভাণ্ডার থেে
সাহায্য করেন। যেহেতু তিনি সবাইকে ভালবাসেন। বড়লোকদের ভালবাসবা
কোন সুযোগ নেই, তা না হলে তাও তিনি বাসতেন। বিপিন গুপ্তই একমা
লোক যিনি সত্যই চন্দ্রসূর্য্য ওঠার রহস্য অবগত ছিলেন। তাঁর কথা আলাদা
কিন্তু জ্যোতির স্বদেশীতার উপর রাগ ছিল। কেননা, স্বদেশীতাই তাদের কাল

জ্যোতি রাস্তার দিকে চাইল, একবার মনে হয়েছিল, তাকে যদি অন্নপূ
দেখতে পেয়ে অন্য পথে গিয়ে থাকে ? মনে মনে সে সময়ের হিসেব নিে
ভ্রূ কুঁচকালে; দৃঢ় হল যে, এ-সময়ের মধ্যে অন্নপূর্ণা খুব বেশী হলে দুর্গাবা
পর্য্যন্ত। এবং দুর্গাবাড়ি থেকে তাকে ঠাওর করা সম্ভব নয়। হিসেব সত্ত্বেও ে
দোমনা হয়েছিল। অবশেষে এরূপ মনস্থ করে যে, 'আর চারটে সাইকেল···ন
সাইকেল বড় ঝটঝট করে আসে, বাঁক ? উঁহু গরুর গাড়ি যদি চারটে আসে।'

দ্বিতীয় গরুর গাড়িখানি – মুখোমুখি ঘোড়ার গাড়ির দাপটে – রাস্তার
ঢালে নেমে গেল, এখন স্পষ্টই দৃশ্যমান কশ্চিৎ বালিকা রাস্তা ছেড়ে নীে
শালগাছতলে স্থির। একটি অতি সাধারণ খবরের কাগজের প্যাকেট অত্যং
সাবধানে বুকের কাছে ধরা; ভয়ে তার খোঁপা খসে, এবার দেখা গেল রে
রয়ে খসে পড়ছে। রাস্তা স্বাভাবিক দেখে মেয়েটি নিশ্বাস ফেলে স্বস্তির হা
হেসেছিল।

গরুর গাড়ি যখন ঢালে নামে, জ্যোতি জিব দিয়ে তখন 'আ-র-র' শব

করলেও, স্থান ত্যাগ করেনি, সে ডাল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মাত্র। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মেয়েটি ব্যতিব্যস্ত, এ-কারণে যে, সে হাতের প্যাকেটটি কোথায় রেখে চুল গোছ করবে? দাঁত দিয়ে ধরবে, না বগলদাবায় রাখবে? ছোট অস্থিরতার নিষ্পত্তি করেই, গাছের গুঁড়ির কাছে মোটা শিকড়ের উপর সন্তর্পণে রেখে অযত্নের চিল-পিঙ্গল চুলগুলিকে সহজেই জুত করে কাপড়ে মৃদু মৃদু নিয়মমত ঠিক দিয়েছিল।

সে যে অন্নপূর্ণা একথা বুঝতে জ্যোতির ভুল হয়নি, অন্নপূর্ণার রক্তগৌর মুখ-মণ্ডল বিকালের চাঁপা আলোয় কঠিন। সে ভীরু চাহনিতে কি যেন-বা ঢাকবার চেষ্টায় চঞ্চল, কাপড়ে কোন ছেঁড়া অংশ নিশ্চিত। জ্যোতির কি যেন মনে পড়ে গেল, দেহ তার দ্রুত নিশ্বাসে ধড়ফড়, তবু তারই মধ্যে সে হাফপ্যান্টের যেখানে ছেঁড়া সেখানে হাত দিয়ে অনুভব করেছিল, এবং মুহূর্তের জন্য অন্নপূর্ণার উপর তার মায়া হয়। তথাপি সে আপনার চোয়াল নাড়িয়ে মনকে দৃঢ় করলে। অন্নপূর্ণা প্যাকেটটা তুলে না-লাগা ধুলো খুব আদরে ঝেড়ে ফেললে। আবার পথে। তার মুখে পরিতৃপ্ত আহারের খুশি, নিশ্চিন্ত ঘুমের সুস্থতা বর্ত্তমান। জ্যোতি এতদ্দৃষ্টে ঘৃণায় টান হয়ে হয়ে উঠল।

অন্নপূর্ণার চলার মধ্যে কেমন যেমন পালানো পালানো ভাব, যদিচ এ-ভাব যুবতীজনোচিত হলেও এ ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য নয়। এক-একবার সে বেশী করে নিশ্বাস নেয়, অবশ্য এর জন্য তার গতির কোন হেরফের নেই। সে খানিকটা এসে চকিতে দেখল, পাশের আতা গাছটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল, এবং কে একজনা অতর্কিতে ঝটিতি তাকে ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে গিয়েই ফিরে ফিরতি তার সামনে উদয় হল। অন্নপূর্ণা থমকে থেমে প্রথমে এক পা এবং পরে আর একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, প্যাকেটটা কখন যে মাতৃ-ব্যগ্রতায় বুকে আঁকড়ে ধরেছিল, তা তার জানা ছিল না। ফলে সে সহজে নিশ্বাস নেয়। অবশ্য এ সময়ে তার আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয় ধাঁধিয়ে উঠে শান্ত স্থির। 'কি' এ-কথাটাকে যেন মুখখানি উঁচিয়ে টেনে টেনে গলার গহ্বর থেকে বার করে আনল। পুনর্ব্বার খোলাখুলিভাবে বললে, 'কি।' এরপরই যথেষ্ট নরম করে সাধারণ করে বলেছিল, 'কি রে?'

'কি রে? ভাবছ বটে আমি কি কিছু জানি না,' জ্যোতির গলা আরও রুক্ষ আরও অসংযত হয়েছিল, বললে, 'বাণ্ডিল কি বটে শুনি?'

অন্নপূর্ণা সাহস ফিরে পেল, তখনও অবশ্য জ্যোতিকে মনে হয়েছিল দুর্বৃত্ত

আর পাঁচটা পুরুষ চরিত্র যেমত হয়। ইতিমধ্যে রাস্তাটা একবার খতিয়ে দেখে উত্তর করলে, 'ভাল হচ্ছে না জ্যোতে, রাস্তা ছাড় বলছি...' বলেই আর সময় অপব্যয় না করে জ্যোতির পাশ কাটিয়ে সে চলতে শুরু করল।

জ্যোতি সেইভাবে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'লজ্জা করে না' বলেই একটি গাড়িকে রাস্তা ছেড়ে আর-এক ধার দিয়ে যেতে যেতে গঞ্জনা দিতে লাগল, যথা 'ধাড়ি মেয়ে' ইত্যাদি।

'ঝেঁটিয়ে...জ্যোতি...বেশী চালাকি...' বলে অন্নপূর্ণা রাস্তার নজর নিলে।

'তোকে বুন বলতে সরমে মরি, আসছে জন্মে যেন পাথর হই...ছি-ছি ধিক গো.. লুকিয়ে ছিট কেনা হয়...' বলে নিজের গাল থাবড়াতে লাগল।

'পোড়ারমুখো...এতে ছিট আছে কে বুললে ?'

'নাই যদি, তবে খুল্ না কেনে, দেখি হে তুমার শ্বশুর কি দিল বটে ?'

অন্নপূর্ণা সত্যি ধরা পড়ে গেল, এতে তার রাগ হয়, এতে তার চোখে জল, ক্রোধ-বশে মিথ্যা বললে,'আমায় কুণ্ডুদিদি দিইছে' বলেই সে চলতে শুরু করল।

'কুট হবে গো দিদি কুট হবে, ধ্যা ধ্যা মিছাই বলা তুয়ার ঠোঁটে আটকায় না, হায়া নাই চামার রুইদাস, বাবার একটা ওষুধ বদ্দি নাই...আর তুমি...'

'বেশ করব বাঁদর, চল না ঘরকে...মাকে...'

অন্নপূর্ণার বাক্যে গাত্রদাহ ছিল। জ্যোতি ভীত, মূঢ়, কোনক্রমে সে সকল কিছুর দিকে চেয়েছিল। বৃক্ষলতাদি অন্নপূর্ণার এবম্প্রকার অবজ্ঞার কথা শুনল। ছেলেমানুষটির পৌরুষকে নয়, কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসাকে তুচ্ছ করা হল। যে ভালবাসার বলে এত দুঃস্থ হয়েও সে দাম্ভিক। সে—বালকেরা ক্ষোভ রাগবশে যেমত খুঁ খুঁ শব্দ করে সেইরূপ— শব্দ করতে করতে নিমেষেই রাস্তা পার হয়ে অন্নপূর্ণার দিকে গেল।

ভাইবোনে সদর রাস্তায় অনাত্মীয় হয়ে উঠল। এই সময়ে জ্যোতি তার প্যাণ্ট এক হাতে সামলাচ্ছিল, অন্য হাতটি প্যাকেট ছিনিয়ে নেবার জন্য ব্যগ্র এবং অন্নপূর্ণা বারবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে যুঝবার চেষ্টা করেছিল। চাঁটি মারছিল, চিমটি কাটছিল এবং অল্পকাল পরে নিজেই প্যাকেটটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছিল।

কাঁকরে রাস্তার এতাবৎ খরখর ভাঙা,ছেঁড়া রুক্ষ আওয়াজ চুপ! জ্যোতি তার নিশ্বাসের শব্দ শুনলে। ক্ষণেক বাণ্ডিলটার দিকে চেয়ে, অন্যবার দিদির প্রতি ভীতভাবে চাইলে। দিদি আপনার হাত মুঠো করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে

কাঁদছিল, শব্দহীন কান্না নিমের থেকেও তিক্ত, শাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। জ্যোতি প্যাণ্ট পরবার সুযোগ পেলে, নিজের গোঁয়াতুর্মি বুঝে তার ঘাড় হেঁট হল, ঠোঁট কাঁপল। সে হয়ত বলেছিল, 'আমি রগড় করছিলাম বটে,' এর কিছু পরে বলেছিল, 'দিদি, বাবার জন্য আমার বুক ফাটে গো তাই'। কখন যে তার দৃষ্টি থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত সরে গিয়েছে তা সে টের পায়নি। মুখ তুলতেই দেখল, বেশ দূরে অন্নপূর্ণা, নিশ্চয়ই চোখে তার কাপড়। জ্যোতি বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে ধূলা ঝেড়ে দৌড়ল। অন্নপূর্ণা ভাইয়ের ডাক শুনে দাঁড়ায় নি, গতি কথঞ্চিৎ আড়ষ্ট হয়েছিল মাত্র। জ্যোতি যারপর নাই গলা রুগ্ন করে মিনতি করছিল।

মানুষে চলতে চলতে এরূপ যে আছড়াতে পারে, জ্যোতি তা কখনও দেখেনি। সে হাঁ করে স্থির থাকে, কখনও-বা পা মাটিতে ঘষে উপায় ঠাওর করে আবার দৌড়য়। কখনও চলন্ত গাড়ির পাশ অনায়াসে কাটিয়ে বলে, 'হেই গো, এখনি চাপা খেতাম গো…তুমার মনে মায়া মমতার খোরাক নাই, ঘর করবি কেমনে লো, আমি সাত জন্ম যেন আটকুড়া হই, মাইরি আমি কখন ভাবি নাই তুই এমন বদলাবি…বাবা-অন্ত পরাণ ছিল তুয়ার…'

অন্নপূর্ণা ভাইয়ের কোন কথা বোধহয় শোনেনি। অন্নপূর্ণা প্যাকেটটাও নেয়নি, এখন তারা দু'জনেই একটি রোগা গলিতে। জ্যোতি বললে, 'দিদি লিবি তো লে। না হলে'– বলে, একটি কারুকার্য করা কাঠের থাম দেওয়া রকের উপর প্যাকেটটা রাখতে গিয়েই চমকে উঠে একীভূত হয়েছিল। প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ আসে। অন্নপূর্ণা ঘুরে দাঁড়ায়; তার দেহ ছুটবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত। এখন দুজনেই মুখোমুখি। জ্যোতির দেহে ছুটে যাবার ব্যগ্রতা, অদ্ভুত, ঈষৎ বাঁকা।

গোলমাল উত্তরোত্তর মুখ খারাপ করে উঠেছে। ক্রমবর্দ্ধমান হো হো শব্দ। 'লে লে মার শালা ঢ্যামনাকে…ক্ষেপা পাগলকে থাপান দে।' রকওয়ালা বাড়ির পিছনে বাজার। গলি ঘুরে গেছে। জ্যোতি নিশ্চিত যে, পুলিসের হাঙ্গামা এ নয়, ফলে তার চোখ ফেটে জল, হাঁপছাড়া স্বরে বলে উঠল, 'দিদি, বাবা!' উচ্চারণ করতে মুখ তার দুমড়ে ত্যাওড় হয়ে গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণার হাতদুটি উঠেছিল, ত্রস্ত বিভ্রান্ত অন্নপূর্ণা জ্যোতির গলা মিলিয়ে একই নিশ্বাসে বলেছিল, 'বাবা'।

গোলমাল বাজার-খোলা থেকেই আছে সুতরাং জ্যোতি ছুটল, দিদির গায় অল্প ধাক্কা লেগেছিল। রাস্তা থেকে সে একটা পাথর কুড়াতে গিয়ে পারল না, আর একটা পারল; অন্নপূর্ণা এইটুকু মাত্র দেখেছিল, তার গালের পাশে হাতটির

আঙুলগুলি কুষ্ঠগ্রস্ত, মহা আক্ষেপে মাথাটি কেঁপে উঠল। কান্না যাকে ত্যাগ করে গেছে, তার বুঝ দেবার কি রইল! সে ত্বরিতে রকের উপর থেকে প্যাকেটটা ছোঁ-মেরে নিয়ে ছুটল অন্যপথে, তার চোখে জল।

সে অনতিদূরে বন্ধ দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়াল। দরজার পাশে কাঠে হাত দুটি ধরে নিজেকে আটকে রেখেছিল। এক হাতে প্যাকেট। তার সুন্দর মঙ্গল-কারী দেহ ভয়ে পাতার মতই দুলছিল।

গোলমাল ধাঁধিয়ে গমক দিয়ে ওঠে। যে লোক এই মুহূর্ত্তে ছিল এখানে, পরক্ষণেই সরে গিয়ে অন্যত্র। মুখে চোখে বিকট বিলাতী অট্টহাস্য, পার্শ্বস্থিত দোকানসমূহের দড়িতে ঝুলান হুঁকা পাখা সাজি ঠেকা, শত শত সামগ্রী দুলে ন'ড়ে ত্রাহি ত্রাহি; দোকানীরা দোকান সামলাতে ব্যস্ত, কেউ সামগ্রী কুড়ায়, কেউ বা ষাঁড় রুখতে তৎপর। জ্যোতির শিবনেত্রদ্বয়ে মেঘ ডেকে উঠল, সে বুঝতে পেরেছিল তার প্যাণ্ট আলগা হচ্ছে, এবং সময়ক্ষেপ না করে হস্তধৃত পাথরটি ছুঁড়ে মারলে। ভীড় হে হে করে সরে গেল। পাথরটি যে তাদেরই উদ্দেশ্যে ছোঁড়া এ কথা বুঝবার সময় ছিল না। কে একজন কোমর বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'বড় লিয়ে মার, নয়ু।'

ভীড় সরে যাওয়ার কারণে দেখা গেল, জ্যোতি দেখলে, কে একজন তার বাপের গায়ে এক খাবরি জল ছুঁড়ে দিলে। যে লোকটি তখনও তার বাবাকে দেওয়াল-ঠেসা করে মারছিল, তার চোখে মুখে জল পড়ল, জলসিক্ত মুখ মুছতে মুছতে সে বললে, দূর অ শালা···শালা'। জ্যোতি এক হাতে প্যাণ্টটা টানতে টানতে এসে তার ভিখারী হাতে লোকটিকে ঘুঁষি মারতে উদ্যত হল, লোকটি সরে গেল। সেই ঘুঁষি পড়ল তার বাবার পিঠে। বাবার পিঠটা দুমড়ে গেল, বললে, 'মার মার···ওঃ ওঃ— মন বিষয় চেয়েছিলে।' জ্যোতি সজলনেত্রে দেখল, তার পিঠের জলগুলো খুর খুর করে গড়িয়ে এল।

শিবনাথের মুখ দেওয়ালের দিকে ছিল, হাতদুটি প্রাচীন বন্দীদের কড়া আট-কানো হাতের মত উর্দ্ধে উঠে গেছে, তার কিছু পাশে বর্ষা-পানির ভাঙ্গা নল, সেখানে একটি বাচ্চা অশ্বত্থ। জ্যোতি দুর্দ্ধর্ষ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, সেই লোকটি নাল-মাখান হাসি হেসে বলছিল, 'লে লে খোঁকা মার শালা ক্ষেপা ঢ্যামনাকে আশি সিক্কা'— বলে নিজের কব্জিতে একটু আরাম দিতে দিতে তুখড় মাগী-মচকান চোখে চারিদিকে চাইতে লাগল। লোকটি নির্ঘাত মফস্বলের, তাই যদি

নয়, তাহলে কি জ্যোতিকে এইভাবে কুৎসিত উৎসাহ দেয়? কারণ অন্যেরা এখন সমবেদনা জানাচ্ছিল।

শিবনাথের পিঠে, জ্যোতির ঘুঁষি যেখানে পড়েছিল, সেখানে লোকে যাতে না বুঝতে পারে এমনভাবে জ্যোতি হাত বুলাতে লাগল। এবং সেইসঙ্গে সামনের লোকটিকে বললে, 'শালা জুতিয়ে,' বলেই ঝপ করে একটা ঘুঁষি মারতে গেল। লোকটি 'আরে' বলে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি ছুঁড়ল। জ্যোতি অন্য লোকদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, তার মুখ ফুলে গেল, সে আস্তে আস্তে উঠে লোকটিকে এমনভাবে কাবু করলে যে সকল লোক অবাক। এ লোকটি পরিত্রাহি চীৎকার করে 'গেলাম গেলাম গো'। বাজারে লোকেরা হাঁ হাঁ করে এসে ছাড়িয়ে দিলে। কাবু হওয়া লোকটি মাটিতে বসে পড়ে কেমন যেন করতে লাগল। হয়ত মনস্থ করে-ছিল, এবার থেকে ল্যাঙ্গট পরবেই।

জ্যোতির মনে কোন বীরত্বের ছায়া পড়েনি, কারণ শিবনাথ এখনও একই-ভাবে দণ্ডায়মান। কাল্পনিক চাবুকের আঘাতে তার পিঠ বেঁকে চমকে দুমড়ে উঠেছে এবং সেইসঙ্গে করুণ আর্ত্তনাদ। নিপীড়িত কণ্ঠে শিবনাথ অনেক কথাই বলেছিল, যথা 'ওঃ টুপীভোর ইংরাজ, আজ তুমি বিরাট মহীরুহ…দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে (?) ভূমে, নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ, তুমি অস্তাচলে…'

জ্যোতি বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময়, যেমন তেমন করে আশপাশের উৎসুক রগড়প্রিয় ইতরজনমণ্ডলীকে দেখছিল। ইতর শ্রেণীর ছেলেরা জঘন্যতম অভিনয় দেখিয়ে হি হি করে উঠছে। জ্যোতির আর রাগ করবার ক্ষমতা ছিল না। সে ক্ষোভে অপমানে শতচ্ছিন্ন, পিরানের হাতায় চোখ মুছবার কালে হঠাৎ পাখা ঝাপটানো আওয়াজ শোনে। কে যেন কথা বলে।

'হাঃ রে ঘরকে কেউ নাই আগল দিবার গো, শিকল আঁটন দাও' : এ গলার স্বরে গভীর আন্তরিকতা নিহিত ছিল ; জ্যোতি পিরানের হাতা থেকে চোখ তুলে কাকে যেন দেখল, এখন তার নিজের দৃষ্টিতে ঘোরহেতু সম্মুখের সকল কিছুই আবছায়া। ইদানীং স্পষ্ট, একটি বালক মাত্র। যার পায়ের বেড়ী থেকে শিকল উঠেছে হাতে ; হাতের কড়ার শিকলে মস্ত কাঠ। সাদা সাদা দাঁতগুলি বার করে এতেক কথা সে-ই বলছিল ; আর পুনঃ পুনঃ আপনার শিকলটি দেখাতে লাগল। কিন্তু সে হাসছিল। এ ছেলেটি রামপ্রাণ ঢালির ছেলে ফেলা। ঠিক যেমন পুরাতন কাঠে কোঁদা দাসমূর্ত্তি।

সাপের শব্দ মনে হয় শিকলের মধ্যে আশ্রয় করে আছে, রোমহর্ষে জ্যোতির কাঁধে ভাঙন খেলে গেল। অবশ্য এ সময়ে শিবনাথ তার দাড়ি ধরে আদর করতে করতে অতি স্নেহময় নিষ্ঠাবান কণ্ঠে বলেছিল, 'মাই ডিয়ার সন, ডিয়ার সন, ওঁ তত্ত্বমসি তৎ'।

বাজারের লোকেরা এখন পাগলের মুখ থেকে কিছু আপ্তবাক্য শুনতে চায়। কে একজনা শিবনাথকে অনুকরণ করে বলছিল, 'মাই সন মাই সন—ইয়া বটে ইংরাজি মনে লয়'—ইত্যাকার অজস্র মন্তব্য আরও।

জ্যোতি ছেলেটিকে যেন সহ্য করতে পারছিল না। ছেলেমানুষ বড় ভয় পেয়েছিল। সে ডাকল, 'বাবা!'

এখানকার খুচরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় রাস্তা ক্রমে ঢালু হয়ে গিয়েছে এবং দূরে জ্যোতি আপনার বাপকে সামলাতে সামলাতে নিয়ে যায়। শিবনাথের মুখে অজস্র উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরবিভঙ্গ। জ্যোতি এ রাস্তায় যেতে সত্যই ভয় পাচ্ছিল, এ কারণে যে এখান থেকে পাড়া আরম্ভ, এবং শিশুরা যে কিরূপ নিষ্ঠুর তা সে জানে। রাস্তায় নামবার পূর্ব্বে সে দেখল, বেশ ভীড়; কি যেন একটা হচ্ছে আত্মারামবাবুর বাড়ির সামনে। কোন উপায়ে যদি পার হওয়া যায়। কিন্তু রাস্তায় পা দেওয়া মাত্রই শুরু হয়ে গেল। 'হেই পাগলা মাথা আগলা'। জ্যোতির কাছে এই ব্যাপারটি অত্যধিক মনঃকষ্টের। সে যে কি করবে তা ভেবেই পায় না, অথচ শিবনাথের মুখে ষোল আনা হ্যাকা হ্যাকা হাসি, যদিচ দাড়ি থাকার দরুন অতশত মনে হয় না। জ্যোতি কাউকে তাড়া দিলে, কাউকে গাল; একদলকে যেই সে একটি পাথর তুলে তেড়ে গেছে অমনি দেখলে বিপিন গুপ্ত মশাই একটি বড় মত ছেলেকে ধরেছেন। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলেছিলেন, 'ছিঃ।' এরপর একটু দম নিয়ে বলেছিলেন, 'ধর, যদি তোমার বাবা হত'। কথাটা বিপিন গুপ্তর মত লোকের পক্ষে একটু নিষ্ঠুর হয়েছিল।

এ কথায় জ্যোতির কষ্ট হল, দেখলে ছেলেটি তার বোতামের দিকে চেয়ে আছে, তাঁর গলার স্বর এক প্রকারের, এ স্বর মানুষকে বড় পুরাতন করে দেয়। বিপিনবাবু ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে কোনমতে জ্যোতির কাছ বরাবর এসে 'আবার' বলেই একটা দুঃখবাচক শব্দ করে মাথা নীচু করে রইলেন। অল্পস্বরে বললেন, 'লোকে অনেক কথা বলে, তাই তখন তোমাকে বলেছিলাম আসতে; আজ এখানে গোলমাল, কাল সেখানে ঈশ্বরবৃত্তির কৌটা ছিনায়; বলে শিকল

দিন'—শিকল কথাটা তাঁকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। অনেক পথচারী তাঁকে নমস্কার করেছিল; তিনি অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়েছিলেন, ইতিমধ্যে সজোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, 'আমার বটে ঘড়ি ঘড়িকে চেন দেখলে বেগোড় করে তা আবার শিকল, এম-এ পাশ সে লোক কত উজিয়ে পাগল হবে গো···চেন শিকল !' বলে থেমে মুখের ইশারায় কাউকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখ না বড় কষ্ট লাগে'। যাকে তিনি দেখিয়েছিলেন, সে রামপ্রাণ ঢালির ছেলে ফেলারাম। এ কথা সত্য যে জ্যোতি তাকে দেখেছিল।

আত্মারাম মাড়োয়ারীর আজ ব্রত উদ্‌যাপন। পাখি ছাড়া হচ্ছিল। ফেলারাম পাখি উড়া দেখে অতীব আনন্দে নাচে। আর হাতের কাঠের গুঁতো খাবার ভয়ে অনেকেই আশেপাশে ছিল না। মাঝে একবার সে তার বাঁ পা দিয়ে শিকলে লাথি মেরেছিল কাঠে মেরেছিল। তবু সে নাচছিল।

আত্মারামবাবু এখানে উপস্থিত, ঠিক কাঁটার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, মুখে তাঁর অনর্গল শ্লোকধারা। তাঁর পায়ের কাছে বেনারসী পাখমারা। ছেঁড়া জুতোর মত মুখটা সকল সময়ই আড়াল করে, এটা তাদের মুদ্রাদোষ ! এখন সে আঁঠরা লতার ঢাউস ঝুড়িটার মধ্যে হাত দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করে কিছু নিশ্চয়ই খুঁজছিল। সহসা বলে উঠল, 'আকাশ পাবি গো , ডর কি রে, আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরাণ'। এবং অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে একটি পাখি বার করে আনল। একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছুভাগ, বনের কিছুভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি! অনেকেই পাখি দেখে নমস্কার করেছিল ! বেনারসী পাখিটিকে আত্মারামবাবুর কাছে এগিয়ে দিলে।

পাশের একজনা গঙ্গাজল ছিটালে, আত্মারাম তখন একটি অমোঘ চাতুর্য্য খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কোনরকমে ডানা দুটি হাতে চেপে একটা দোলা দিয়ে উড়িয়ে দিলে ; সঙ্গে সঙ্গে জয় রাম জয় রাম ধ্বনি উৎসারিত হল ; নীলকণ্ঠ এদিক সেদিক করেই ক্রমাগত বিমানচারী হয়ে গেল। আত্মরামের হাতদুটি জোড় হবার পূর্ব্বে থমকে ছিল, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে সে নিশ্চয় বলছিল, 'হা রামা তুমি আমায় মুক্তি দিও !' বেনারসী পাখমারা তার আহত আঙুল চুষছিল আর দেখছিল। কাবুলিওয়ালা নিজের মালা ফিরাতে ফিরাতে আকাশের দিকে চেয়েছিল।

আশ্চর্য্য যে এসময় ফুলকারী বৃষ্টি হয়। লোকে বৃষ্টির জলহেতু চোখ বন্ধ করে আনন্দে বলেছিল 'পুষ্পবৃষ্টি'। ফেলারাম নাচছিল। জ্যোতির দৃষ্টি নিবদ্ধ, তার

মনে হয়, আকাশ বড় আপনার জন! সত্যই নীল নয়! বললে জ্যেঠামশাই আকাশে রাত্তির হয় না—না?' ভাগ্যে একথা খুব অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছিল, তা না হলে সে বড় লজ্জিত হত। সে এবার তার বাবাকে দেখল, এখনও তার দৃষ্টি আকাশে, মুখে শুধু 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ'।

বিপিন গুপ্ত বললেন, 'ওরে বাড়ি চ…' তারপর ঘাড়ে ছাতা তুলে চলতে চলতে বললেন, 'তুয়ার…' বলে একটু গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'বুঝলি ওদের বলবি একটু আঁক আগড়ে রাখতে গো…আমি যাই রে।'

'ওদের' কথাটা জ্যোতিকে যেন হারিয়ে দিলে, আজকের জেতাটা বৃথা হয়ে গেল। ওদের বলতে দু'জন, মা আর দিদি। সে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে কি যেন ভাবল, মার কথা সে ভাবতে সাহস করল না। সে গম্ভীর হয়েছিল।

রইল অন্নপূর্ণা! ইদানীং অন্নপূর্ণা শিবনাথের বিপদ দেখলেই অন্তর্হিত হয়। অথচ এই দিদি, বাবার জন্য কত জপতপ করলে তারা ভাইবোনে কত সন্ন্যাসী অবধুত করলে। আজও সকল কথা স্পষ্টই মনে আছে। সকাল বেলা, দিদি ঘুরে ঘুরে চুল বাঁধছিল আয়নায়, এমত সময় শিবনাথ একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। আয়না খান খান হল। আয়না ভাঙার শব্দ সৃষ্টিছাড়া, আকাশ বিচলিত হয় ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায়। দিদি 'মাগো' বলে বসে পড়েছিল চারিদিকে টুকরো টুকরো আয়না, এক সেখানে একাকার। শিবনাথ যে পলকের মধ্যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তা জ্যোতি বুঝে পেল না! এসময় এমন কি বাজারের সাবেক 'সাধের বুলবুল' পাগলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হ্যাঁ গো আমার বাবাকে দেখেছ?' পাগলা উত্তরে বলেছিল, 'আমার সাধের বুলবুল—আমার সাধের বোলবোয়ুল।'

অবশেষে ডেপুটির বাড়ির মেহেদির বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে জ্যোতি দিদিকে ডেকেছে। বন্দুকধারী বুটের আওয়াজ উঠল; মোটা গলায় হাঁক এল—'কে তুমি?'

জ্যোতি বুঝেছিল খোদ ডেপুটি। ডেপুটির প্রতি তার অতীব ঘৃণা ছিল, কারণ তার একটি ছোট কথাবার্তা মনে ছিল: তখন সন্ধ্যা, মা আর দিদি ঘরে বসে, দিদি বললে, 'বড় ভয় করে।' উত্তরে তার মা বললে, 'মনকে পাপ আনস নি, ডেপুটি বাপের বয়সী বটে, আদর করে বটে আদর করে…মনকে পাপ আনিস না,' এ কথার পরই তার মা হেমাঙ্গিনী জ্যোতিকে দেখেই অন্নপূর্ণার গা টিপে দিয়েছিল, তবু একটি ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর এল, 'ভয় করে বড়!' এ গলা অন্নপূর্ণার। জ্যোতি বুঝেছিল, ডেপুটি ভাল লোক নয়।…এখন জ্যোতি মেহেদির বেড়ার

উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমি অন্নপূর্ণার ভাই...আমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' তার মুখের সামনে বেয়নেট ছিল!

অবজ্ঞার হাসি হেসে—'অন্নপূর্ণা কি করবে? পাওয়া যাচ্ছে না, যাবে'—ডেপুটি বলেছিল। জ্যোতি এই উত্তরে নিখোঁজ, মনে হল সে বড় ধরনের কোন মিথ্যা বলেছে, সুতরাং সে দোষী! কার যেন 'অন্নপূর্ণা' 'অন্নপূর্ণা' ডাকে হারমোনিয়াম বন্ধ হল, অন্নপূর্ণা এসে ভাইকে দেখে মাথা নীচু করেছিল। ডেপুটি মুখ দিয়ে ইশারা করাতে সে, সুরকি বিছান পথটি যেন তারের, তারই উপর দিয়ে কোনক্রমে জ্যোতির কাছে এসে দাঁড়াল, রূঢ় গলায় প্রশ্ন করলে 'এখানে কি?' জ্যোতির উত্তর শুনে বারান্দার দিকে চাইল, আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে অপরাধীর মত কি যেন বললে, তার চোখে জল ছিল! ডেপুটি তাকে কাছে টেনে অযথা আদর করতে করতে অভয় দিতে লাগলেন। এ দৃশ্যটি জ্যোতির বড় কটু লেগেছিল, সে মাথা নীচু করেছিল।

অন্নপূর্ণা ছাড়া পেয়ে এসে বড় কর্ম্মতৎপর। জ্যোতি চোরা-চাহনীতে লক্ষ্য করলে যে, তার গলা উঠছে নামছে; সে নিশ্চয়ই সহজ হতে চাইছিল। জ্যোতি বললে, 'চ একবার বাড়ি ঘুরে যাই।' অন্নপূর্ণা একাই বাড়িতে গিয়ে কিছু পরে ফিরে এসেছিল। তার মুখখানি বিশ্রী সাদাটে। জ্যোতি অবাক, যদিও সে জানে তা ব্রণর জন্যই শাঁখের গুঁড়ো! তথাপি সে বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল যারা খারাপ তাদেরই মুখে ব্রণ হয়। অন্নপূর্ণার মুখে দু-একটা ব্রণ ছিল। সে, জ্যোতি, রুক্ষ হতে গিয়ে পরক্ষণেই বড় কষ্ট অনুভব করলে। বললে, 'দিদি, বাবা আয়না ভেঙেছে বলে তুই রাগ করেছিস দিদি?'

'পাগল' বলেই অন্নপূর্ণা জিব কেটেছিল।

আজও মনে পড়ে। রাস্তায় বিধুদিদির সঙ্গে দেখা, টান করে ঘাড় তুলে খোঁপা বাঁধা, অন্নপূর্ণাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বললে, 'ধন্নি মেয়ে বাবা, একবারটি দেখা নাই লো' বলে একটা বাড়ির সামনে টেনে নিয়ে গেল। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে গলি মত এবং তারই শেষে উঠান। গলিতে দাঁড়িয়ে অন্নপূর্ণাকে বললে, 'হরি-দিদি তোকে কতদিন দেখতে চেয়েছে।' দুজনেই চুপ হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর বাণবিদ্ধ গোঙানি শোনা যায়, বিধুদিদি আঙুল দিয়ে সেইদিকে দেখালে, অনেক মেয়েছেলে, কারও মুখে হাসি। বিধুদিদি বললে, 'এখন ব্যথা উঠেছে, হয় হয় বটে।' অন্নপূর্ণা যেমন বা কোন নিকৃষ্ট গন্ধে অস্থির, সে বোকার মত বলেছিল, 'কেনে? ইস্ কেনে গো?'

'দুঃ ন্যাকা, বিয়োবে বটে, তাই নাট খাইছে…মাইরি আমায় যেন ঠাকুর করেন, ঠাকুর করেন (ছোট নমস্কারান্তে) ছেলে পিলে পেটে ধরতে না হয়' বলে বিধুদিদি মৃদু হেসেছিল। ইত্যাকার কথায় অন্নপূর্ণা যেন চোর হয়ে গেল। বিধু আবার শুরু করলে, 'দেখবি'খন সব ভুলে যাবে, কিম্বা চারআনি গয়নার ছলে বলবেক আমার ভাল লাগে না, যেই পাবে অমনি ওয়াক ন্যাকার, পা ছড়িয়ে পাত-খোলা চিবুবে ; মা তাই বলে, সোয়ামী বড় শত্তুর— ছেলে কোন ছার— সেকুল কাঁটা দিলে টপকে আসে, দেখ না কেনে ঘনাদার বৌ মাগী আজ তারিখ পর্য্যন্ত খালি পেটে…'

বিধুদিদির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নুয়ে আসছিল। কতশত সে জানে। অন্নপূর্ণা কেন যে এ সকল কথা শুনছিল তা সে জানত, কান এখানে থাকলেও চোখে দেখেছিল, আবর্ত্তিত গোঙানির মধ্যে সে যেন বা শুকনো পাতা ; শব্দ আপনার স্বরূপ দেখাল, পৃথিবীতে যে এত যন্ত্রণা গোঙানি আছে তা অন্নপূর্ণা ভেবে দেখেনি। পুনর্ব্বার বিধুদিদির কণ্ঠস্বর কানে এল, 'তুই ছেলে হওয়া দেখেছিস ?' অন্নপূর্ণা অন্যমনা, তবু মাথা নেড়েছিল। 'ওমা সে কি লো, চ না শিখে রাখ।'

'না ভাই…বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ওমা সে কি ও-ইঃ দেখ বলিস কি লো !'

অন্নপূর্ণা সদরের কাছে আসতেই জ্যোতি কাঁচুমাচু হয়ে 'কি হইছে গো…দিদি' জিজ্ঞাসা করল। অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করলে না, কিছুটা পথ এসে আবার প্রশ্ন করেছিল জ্যোতি।

'ছেইলা হবে বটে…মা হওয়া কি পাপ !'

'মনে লয় ভাদ্দর মাস গোঙআইছে গো, নদীতে' বলেই নিজেকে ধাক্কা দিয়ে জ্যোতি বললে, 'ইঃ শালা কিসের গোঙানি গো, শুনছিস !…তবে শালা বুঝি শূয়ার ফুঁড়ে' বলেই কানে আঙুল দিয়ে চলতে লাগল। অন্নপূর্ণাও কানে আঙুল দিতে বাধ্য হয়েছিল। এবং জ্যোতি বললে, 'মা হওয়া পাপ ! কি গোঙানি বল ! আমি, আমার মার জন্যে বড় কষ্ট হয়, যখন বড় হব না…তখন মাকে একটা বেনারসী কিনে দুবো…দিদি কেনে বল ত, আমার ভাঙা দরজা দেখলে কষ্ট হয়, সবার জন্যে…বাবা ভাল হলে আমি সন্ন্যাসী হব…তুইও ত বলেছিলিস সন্ন্যাসী হবি…শূয়ার এখনও গোঙাইছে ?'… বলেই কাকে যেন দেখে হুড় হুড় করে নদীর পাড়ে নেমেই শুয়ে বললে, 'দিদি লুকা গো বগলা দা বগলা দা।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণা গাছের পাশে লুকাল। কিছুক্ষণ পরে বললে, 'ওপাশে চলে গেছে, উঠ···তুই এত ডর করিস কেনে?'

'ভারী শয়তান গো···ডেপুটির মত পাঁজি বটে,' বলেই অপ্রস্তুত। অন্নপূর্ণা যেন শুনেও শুনতে পায়নি, সে তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'তুই খুঁজতে এসেছিস না গাল-গল্প করতে···।' এরপর দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ভাই বোন বাপকে তন্ন তন্ন করে নদীর ধারে খুঁজেছে। কভু বা দূর টিলার উপরে ভেড়িয়ালকে দেখে ছুটেছে, কখনও নদীতীরের অর্দ্ধভুক্ত শবকে শকুনির ফাঁক দিয়ে দেখেছে। অবশেষে সন্ধ্যাগত। অন্নপূর্ণা নদীজলে পা মেলে কাঁদছিল, জ্যোতি ওপারে গেছে, এমতকালে গীতধ্বনি শুনে তার দেহখানি সোজা হয়ে উঠল। নদীপথে গীতপ্রবাহ বড় রকমারি ভাবে আসে, তবুও সে বালি মুঠো করে দৃঢ় বিশ্বাসে বললে 'বাবা' হাতের বালি ছুঁড়ে ডাকলে 'জ্যোতি হি ই রে'। অন্নপূর্ণার ডাক কিছু কিছু ব্যাহত হয়েছিল একারণে যে, গৃহাভিমুখী গরুসকল নদী পার হয়, উপরন্তু রাখালের হির হির শব্দে। ঠিক এ সময় অন্য পার থেকে আওয়াজ হয়েছিল 'দিদ্‌ই'—অন্নপূর্ণা দেখল, ছেলেমানুষটি শিথিল জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দোনামোনা করছে।

জ্যোতি অন্নপূর্ণা দ্রুতপায়ে ছুটল, দুটি বুড়ী যাদের কাপড় এখনও ভেজা, পায়ের কাছে কলস, জড়সড় হয়েছিল; এরা প্রশ্ন করলে বুড়ী দু'জন ভীত উত্তর দিলে, 'আমরা কাঙাল বটে,' পুনর্ব্বার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বললে, 'আমরা মাঢ়খাগী কটা-কপালে রাঁড়ী—বাবাই গান শুনালেক, উঠেন গেল···'

নদীমধ্যে চর, খাড়া কালো কালো পাথর। দু'জনে সেখানে গিয়ে ডাকলে 'বাবা'। অন্নপূর্ণা পাথরের পাশ দিয়ে উঁকি মেরেই নিশ্চল, খোঁপা তার খসে গেল। সে চুল দিয়েই মুখ ঢাকবার চেষ্টা করেছিল, জ্যোতি ত্রাসে পিছু হটে গেল। তারা পাথরের পাশ দিয়ে দেখে, যে কে-একজনা আপাদমস্তকাবৃত করে শুয়ে আছে এবং মাথায় নরকপাল। ভাই বোন একটু সাহস সঞ্চয় করে যখন খানিকটা পালাতে পেরেছে, তখন বিকট হাসির শব্দ শুনা গেল। এবং পরক্ষণেই স্খলিত কণ্ঠে গান এল, 'আমি যারে তত্ত্ব করি'। এ গীত শুনে অন্নপূর্ণা হেসে বললে, 'বাবা রে চ—'

'দিদি আমার ভয় করছে তুই···'

'হারামজাদা···বাবা না' অন্নপূর্ণা জ্যোতিকে জলের উপর দিয়ে বালির উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার মুখে 'তারা তারা' নাম, কখনও বা

'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ'। জ্যোতিও বার বার রামকৃষ্ণ নাম করছিল।

গীত তখনও থামেনি, রামপ্রসাদের গানের অনাহত মুহূর্ত্ত সকল, তাঁর গানের অমরতা নদীপথে ভ্রমণ করে ফেরে। নরকপালের পিছন থেকে একটি হাত বালি বা পাতা দিয়ে অর্ঘ্য দান করে এবং 'শিব কেবলাঃ' 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ' ধ্বনি মুহূর্ত্তের জন্য স্থখকর হয়েছিল। অন্নপূর্ণাই সাহস করে দৌড়ে গিয়ে তাকে ঝাঁকানি দিয়েছিল। নরকপাল মাথায় করে শিবনাথ উঠে বললে, 'যাঃস্ শালা! শালী এখনও দাঁড়িয়ে দেখছিস, হাতে হেঁতেল লিয়ে, মায়ার বন্ধন কাট'। এখন তার হাতে নরকপাল আর একপাশে জ্যোতি অন্যপাশে অন্নপূর্ণা। এবং পিছনে সন্ধ্যার তন্দ্রার মায়ার অঙ্গে নদীর পরিপ্রেক্ষিত।

এসকল কথা জ্যোতির স্পষ্টই মনে আছে, সেই অন্নপূর্ণা আজ কি অদ্ভুত বদলে গেছে। বদলে গেছে সেই কালীপদর সঙ্গে হাঙ্গামার পর থেকে। সে নিজে কালীপদর লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে, তার বাপের অবস্থা কাহিল, ইত্যবসরে ঘুরন্ত বাতাসের মত ত্বরিতে অন্নপূর্ণা এসে কালীপদকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে কালীপদর হাতের মধ্যে চলে গেল, তবু অল্পবয়সী মেয়েটির কিল মারা থামেনি, অন্যপক্ষে কালীপদ হি-হি করে হেসে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি দিয়ে অন্নপূর্ণার ফরসা কাঁধে (যেহেতু সেমিজ সেখানে ছিন্ন) ঘষে কিছু উৎফুল্ল করবার চেষ্টা করেছিল। অন্নপূর্ণা, বেচারী অন্নপূর্ণা, মর্ম্মান্তিক চীৎকার করে উঠল!

এরপর থেকে অন্নপূর্ণা কোনদিন আসেনি, পৃথিবী তার একাগ্রতাকে কোন সূত্রে কেড়ে নিয়েছে। জ্যোতি একা, বিরাট অবাধ্যতাকে, শিবনাথকে ভালবাসার জন্য বসে, এক-এক সময় তার বড় ভয় করে। তীব্র বৈরাগ্যের নিশ্বাসে তার দেহ মোচড় দিয়ে ওঠে, নিজের সমস্ত বীরত্ব প্রায়শ নোংরামির সম্মুখীন হয়ে থাকে, তার জন্য তার দুঃখবোধ নেই। কোথাও একটা গর্ব্ব ছিল, যার ফলে অন্তও সে দূরাগত বনগন্ধ পেয়েছিল।

শিবনাথের খোলা কোঁচার বস্ত্রখণ্ড তার হাতের উপর দিয়ে আলুলায়িত; মুখে ঘন দাড়ি, চক্ষুদ্বয় আরক্ত। অনৈসর্গিক শুদ্ধতা সারা অঙ্গের লাবণ্য হয়ে আছে; দেখলে সত্যই ভুল হয় ভক্তি হয়। জ্যোতি কোনপ্রকারে বাবার দিকে আড়ে চাইল এবং পরক্ষণেই আকাশের দিকে চেয়েছিল। সেখানে কোন এক স্মৃতি হাততালি দিয়ে ওঠে। কিছু পূর্ব্বের বেনারসী পাখমারাকে মনে পড়ল, ওজনের কাঁটার কথা মনে পড়ল, আর মনে হল উড্ডীয়মান নীলকণ্ঠের কথা। উজ্জ্বল,

সুন্দর বাবু, নীলরঙ ফের ক্রমাগতই শূন্যতায় পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে, আশ্চর্য্য! দূর দূর যায়। এই দৃশ্যের সবটুকুই সে বাপের জন্য উৎসর্গ করে দিতে পারে।

জ্যোতির হাতের মধ্যেই শিবনাথের হাত ছিল, ফলে সে বুঝতে পেরেছিল যে বাপের হাতে উষ্ণতা, স্বাভাবিকভাবে যে উষ্ণতা থাকে, এখন নেই। ভোরের শীতলতা বর্ত্তমান! এমত অনুভবে সে সাহসী হয়ে বলে ফেললে, 'তুমি এমন কর কেনে গো...তুমি বুঝ না তুমাকে লোকে হেনস্তা করলে আমাদের...আমার বড় বড় কষ্ট হয়,' জ্যোতি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, তার কণ্ঠ আড়ষ্ট, মেঘময়।

শিবনাথ অতর্কিতে থেমেই যোগীর মত একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, এতক্ষণ বাদে কি জানি কি মনে হল, এইটুকু বোঝা গেল, সে আর যেন বা মাথা স্থির রাখতে পারল না। জ্যোতির হাতটি কষে ধরেই বললে, 'শাল্লা·· র···ছেলে,' জঘন্য গালমন্দের বক্যলি দিয়েই জ্যোতিকে ধরে মার! হয়ত জ্যোতির শান্ত প্রশ্ন তার কাছে নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল। প্রহারের সময় তাঁর মুখে অন্য কথা, 'আঁকে লব্বই পাওয়া হারামজাদা···কাঁড়া চরা গা,' শিবনাথ যখন সত্যিই পিতা, সেই স্মৃতি এ কথার মধ্যে ছিল। জ্যোতিকে শিবনাথ এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে খানিক দূরে গিয়ে একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে কি যেন ভাবলে।

জ্যোতি অদ্ভুতভাবে গাছের গুঁড়িতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। শিবনাথ তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, 'জ্যোতে আয় তোকে গান শেখাই···আগে একটা বিড়ি খাওয়া মাইরী···'

জ্যোতি আস্তে আস্তে মুখখানি নাড়িয়ে না বললে।

'তবে শালা কারু কাছ থেকে মেঙ্গে লিয়ে আয়···'

জ্যোতি হাতের তালু দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ডাকলে, 'বাবা'। এই ডাকের মধ্যে যে ব্যাকুলতা ছিল তা শিবনাথের দেহকে ওতঃপ্রোতভাবে নাড়া দিয়েছিল, তথাপি সে আধা-হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'লে লেশালা, আবার বাবা, একটা বিড়ি যুগাবার ক্ষমতা নাই, লে চন্দনী লিয়ে আসবি,' বলেই শিবনাথ অন্যদিকে চাইল। সেদিকে সন্ধ্যার শুদ্ধতা ব্যাপ্ত।

দূরে মুঠো মুঠো পাহাড়, অতীব দূরে অরণ্যরেখা; প্রান্তরের শূন্যতাই নিশ্চয়ই অনাদিকাল। শিবনাথ ছোট একটি পাথরের উপর পা রেখে চুপ, আস্তে আস্তে বলেছিল, 'বেশ হাওয়া দিচ্ছে না রে আঃ!·· জ্যোতি।'

জ্যোতি মুখ ফিরিয়ে বাবাকে দেখেছিল, শিবনাথ সম্বন্ধে তার যে ধ্যানধারণা ছিল, সে কথাই মনে হয়, শিবনাথ পাগল নয়! জ্ঞানীরা এমন হয়, বালকবৎ

উন্মাদবৎ জড়বৎ পৈশাচিকও বটে। যেহেতু প্রত্যহ তার বাবা ভোরবেলা 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ' বলে, যখন মধুর কণ্ঠে 'কে জানে মন কালী কেমন' অথবা 'মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না মা—রামপ্রসাদ বলে দুঃখ পেয়েছি—ঘোলে মিলে ঘুলব না'। জ্যোতি এ গানের দুঃখ বোঝে, রহস্য-জগতের বাস্তবতা তার মনে শিবনাথ এনে দিয়েছে। সুতরাং জ্যোতি এখন দৌড়ে এসে বাপের ডানহাতটিতে মুখ ঘষতে ঘষতে পুনঃ পুনঃ বলেছিল, 'বাবা বাবা'। তার ধারণা ছিল বাবাকে ঠিক ডাকতে পারলেই আবার সে ফিরে আসবে, শান্ত হবে। এইসঙ্গে তার মনে হয়েছিল, দিদি মা এরা যদি থাকত।

শিবনাথ বললে, 'ব্রিলিয়েন্ট…গ্র্যাণ্ড…ফাঁকা না রে! তোর ভাল লাগে ?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'কেনে বটে ভাল লাগে ?'

'তোমার ভাল লাগে যে।'

'ওরে বাগড়ী মুলুকের ছুঁচো…'

এ কথায় জ্যোতি বাপকে জড়িয়ে ধরে মুখ উঁচু করে একই বিশ্বাসে দেখছিল। হঠাৎ শিবনাথ তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটল। জ্যোতি যে এতবড় ভার কেমন করে বইবে কে জানে! শিবনাথের পিছনে কুকুর ছুটছে, জ্যোতিও আর দাঁড়াতে পারল না।

২

অসম্ভব মিল দেখা যাবে, এই বাড়িটির সঙ্গে এবং ছোট ছেলের আঁকা ছবির সঙ্গে। খাপরার চালের বাড়ি, পাঁচিলেই সদর দরজা, তারপর উঠান, শেষে উঁচু রক। সবকিছু এখন অস্পষ্ট দেখা যায়। জ্যোতির একটু অস্বস্তি হয়েছিল, তবুও সে নিজেকে যুত করে, রোজগারী দর্পে যেক্ষণে সদর দরজায় পদার্পণ করেছে, অমনি তার মা—হেমাঙ্গিনী তার কানটি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রকের কাছে ঠেলে দিলেন। জ্যোতি ঘাড় দিয়ে কানটিকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। পরক্ষণেই চেয়ে দেখলে, রকে সেই প্যাকেটটি এবং আর কিছু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অন্নপূর্ণা বসে। সর্ব্বত্রই দিব্যি অন্ধকার, ওপাশে শিবনাথ উবু হয়ে বসে। ইতিমধ্যে হেমাঙ্গিনীর গলা শুনে তার অন্তরাত্মা কম্পিত হয়ে উঠল। 'এত্তেক আস্পদ্ধা নচ্ছার, রাস্তায় ধরে ওকে শাসানো! হারামজাদা কেরে

আমার এঁটেল মাটির রামচন্দর—ঝেঁটাই তুয়ার চটকা তামাদি করি তুবো··· পিত্তিভক্তি, ওহো পিত্তিভক্তি যতি দেখাবি ত লথাই মালের দলে লাম লিখা গা,' হেমাঙ্গিনীর গলা অনেক দূর যায়। অনতিদূরস্থ গৃহস্থ বাড়িতে গীতসাধনা 'যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেথানে' ছাপিয়ে গিয়েছিল সে গলা।

জ্যোতি মার দিকে একবার চাইবার চেষ্টা করে। হেমাঙ্গিনী সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ; তার বর্ণচ্ছটা ভরা সন্ধ্যায় চোখে পড়ে ; অন্যদিকে অন্নপূর্ণা নির্লজ্জ। কেউ আজকের বিবরণ জানবার কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেনি, শিবনাথের সেই শান্ত মুহূর্ত্ত যা দেখে জ্যোতির মনে হয়েছিল সে একা, সে বিবরণও নয়। যদি মা দিদি থাকত, বাবাকে 'এস' বলে ডাকত, তাহলে নিশ্চিত শিবনাথ ফিরে আসত। কিন্তু এরা সবাই আর-এক রকমের, কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। হেমাঙ্গিনীর গালির আর অন্ত নাই। জ্যোতি, ভাগ্যে এখন অন্ধকার, কোনরূপে আত্মসম্মানটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমত সময় বিন্দি পিসিমা এলেন, বিন্দি পিসিমা পাশের বাড়ির নবীন মোক্তারের বোন। হাতে তার লণ্ঠন, এসেই বললেন, 'হে গা বৌ ভরা সঞ্জেবেলা, ছড়া গঙ্গাজল নাই, সন্ধ্যা নাই ছেলেটাকে দুষছ কেনে বৌ···?'

হেমাঙ্গিনী বিন্দুবাসিনীকে দেখলেই অতিমাত্রায় রুক্ষ কৃষ্ণকায়া হয়ে যেতেন। মনে হত, সে যেন বা অত্যধিক বৃদ্ধা, কেননা বিন্দু পিসিমার ডাগর রূপ ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল অঢেল। এ-কারণে তাঁর নিজেরই ছিল ত্রস্ত লজ্জা, কেননা তিনি বাল্যবিধবা। হেমাঙ্গিনী তার স্বভাব অনুযায়ী উত্তর দিলে, 'এঠেনকে তুলা পেঁজা হইছি স্বগ্‌গে গিয়ে সন্ধে তুবো···তুমাকে আর···তুমি এলে কেনে···?' হেমাঙ্গিনী অনেকবারই তাঁকে ছোট করেছে, কতবার আঙুল মটকে অভিসম্পাত করেছে কিন্তু বিন্দুবাসিনী মরেন নি, তাঁর ভিতরে যে মনটি ছিল তাও মারা যায়নি।

'বৌ ক্ষেপা হইছ···তুমার কি আটকল নাই !'

'লাও লাও ঢেল হইছে, আটকল ? আমার আঁটকল শিখরভূমে,' আরও তিক্ত মন্তব্য কিছু খুঁজে না পেয়ে বললে, 'যিদিনকে শাঁখা ভাঙব, সিন্দুর গঙ্গা করব এঠেন উয়ার নামে বেনা গাছ পুতব···।'

'ছিঃ ছিঃ' করে উঠে বিন্দুবাসিনী কানে, হাতে লণ্ঠন সত্ত্বেও, আঙুল কোনমতে দিয়েছিলেন, ফলে মাথা আড় হয়েছিল। তারপর হাত নামাতে গিয়ে আড়চোখে শিবনাথকে দেখলেন। শিবনাথের দাঁতে চাপা বিড়ি, দুই হাতের তর্জ্জনী বঁড়শীর মত করে আটকান। অদ্ভুত একটা স্বরে সে ক্রমাগতই বলেছিল, 'লেগে যা শালা

লেগে যা যা…লারদ লারদ!'

'ছিঃ গো তুমি বামুন লয়, কি কথা বল গোঃ! পুনি উঠ্ না কেনে বাতি বুতি জ্বালা লো—'

'তুমি সাউকিড়ি কোরো না ঠাকুরঝি—আবার আমার সঙ্গে—ঝ্যাটা—! পুনি ত আর তেমন নাই, ডাগর সোমত্ত বটে, বলে কলসী থাকলে বিটিছানার লাজে আগড় পড়ে, তাই বলে কি কাজখাটালীতে কলস বুকে করে যাবে গো? —এ ত আর ধানভানা লয় যে গতর শুধু বড়ঠাকুর দেখলেক, মা-মরা ভাগ্না দেখলেক আর কাঠবিরালী দেখলেক। পাঁচ দশ চোখ সেখানকে ঘুরে—'পরক্ষণেই গলায় মোচড় দিয়ে একটা অপূর্ব্ব স্বর বার করলে, 'একোটা ব্লাউজের কাপড় কিনছে, এতদিন ত উয়ার কামিজ কেটে চলল!' বলে রাস্তার সকল কথার উল্লেখ করে বললে, 'যেমনি বাপ, ছেলে কত হবে, পুনিকে গরিত গঞ্জনা কল্লে, না বাপের ওষুধবদ্দি নাই—টনক-লড়া ক্ষেপা দশ মাগেও ভাল হয় না—'

'তা ছেলেমানুষ বটে—যাক শুন গো, একটা ভাল শিকড় পেয়েছি। বেটে—আমলকী…'

'ওসব আমরা পারব নি—সারা জীবন আমায় ছেঁকা দিলে—আবার—'

'আহা বৌ ফেরাক দাও কেনে গো, জ্যোতে ছোঁড়া আছে, মানুষটা কি এমন হয়ে থাকবে, যাত্রাসিদ্ধি করুন ভাল হয়ে উঠুক, মরেও সুখ—' বলে শিবনাথের দিকে চাইতেই সে ষোল আনা ছড়ি ঘুরানো বাবুর মত গান ধরলে 'এমন ধনী কে শহরে আমার পাখী রাখলে ধরে—মিছে হিয়ায় দিলে যন্ত্রণা'। মিশ্র পূরবী, চোখ নাচিয়ে গলা কসরৎ করে শিবনাথ গাইতে লাগল।

'বলি নাই টনক-লড়া; লাও দেখ কি লটরা ড্যাঁই বজ্জাত, সাধে কি লোকে—'

'আঃ বৌ তোমার দিব্যি! থাক থাক মাথার ঠিক নাই—।'

'ঠিক নাই—দেখ ভাল হচ্ছে না—কাণ্ডজ্ঞান নাই দিদি না তুমার—'

'দিদি না—' শিবনাথ মুখ বিকৃত করে উত্তর দিলে। 'চুপ কর দিনভাতারী—রাত—'

'ফের ফের মুখ আঁশটে করুনি বলছি—না হলে চেলা কাঠ।' সুন্দরী হেমাঙ্গিনী এখনও সুন্দর। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুবাসিনী হেমাঙ্গিনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, 'সব্বনাশ, তোমার সোয়ামী যে গো—'

হেমাঙ্গিনী তাঁর হাতখানি খানিক সরিয়ে মহা আক্রোশে বললে, 'অমন সোয়ামীর মুখে—'। ইত্যাকার উত্তর বিন্দুবাসিনীর হাতটা অনেকখানি দূরে সরিয়ে

নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মুখখানি বিস্ময়ে অসম্ভব হাঁ হয়েছিল, মাথা আন্দোলিত করে সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন, 'পা খসে যাবে পা খসে যাবে!'

'যাক পা খসে—' বলে সিঁড়িতে সজোরে একটি পদাঘাত করে উঠে গেল। বিন্দুবাসিনী মুখখানি উঁচু করে তাকে দেখবার চেষ্টা করে বিড় বিড় করে বললেন, 'বৌ তোমার বুক না উঁই ট্যাড়? শুধু কি চোনা ভরা গো! হায় হায়!' বলে কষ্ট চেপে জ্যোতির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'ক্ষেপা উয়ার কম্মফল, এক ছটাক চেংড়ার সাধ্য কি তাকে রাখে ঢাকে— একটু যদি সোহাগ সাঙাতি দেখাতে···বললে বড় দোষ হবে···যে···' তাঁর গলা শুনলে মনে হবে যেন ভোর হচ্ছে।

জ্যোতি রকে হেলান দিয়ে একমনে লণ্ঠনের দিকে চেয়েছিল। শুধু মনে হল, যেমত প্রায়ই হয়, বিন্দি পিসিমা যদি আমার মা হত। সে কোনরকমে লণ্ঠনে আটকান দৃষ্টি ছাড়িয়ে নিয়ে বিন্দি পিসিমাকে দেখলে। তিনি তখনও সেইভাবে বসে। সত্যিই তিনি বাবাকে বড় ভালবাসেন। মনে হয় আপন বোন। যেদিন শিবনাথ প্রথম আর এক রূপে দেখা দিল···আজও সেকথা জ্যোতির কাছে ছবি হয়ে আছে।

আজও যে কথা জ্যোতির মনে আছে সেকথা এই যে···তদানীন্তনকালে চিঠির মাথায় 'দুর্গাশরণং' 'গড্ ইজ গুড'-এর পরিবর্ত্তে 'বন্দেমাতরম্' এল। পর্দ্দানশীনতা সর্ব্ব অর্থে ছিঁড়ে শতচ্ছিন্ন। মহাজনরা কেউ বললেন না যে, মেয়েরা ঘরে থাকবে না সত্য, কিন্তু ঘর মেয়েদের বুকে থাকবে! এই সময় শিবনাথ স্বদেশবাৎসল্যের জন্য চাকরী হারাল, মাস্টারী পেল এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলেছিল। হেমাঙ্গিনী সুযোগ পায়, তার মনে বলও ছিল কেননা সে জানত, শিবনাথ দুর্ব্বল অর্থাৎ আমরা যাকে বলি ভদ্রলোক। শিবনাথ মুখ ফুটে স্ত্রীকে কোনদিন কিছু বলেনি, একদা সকালে ঘরের মধ্যে হো হো করে উঠে ক্রমাগত শিশি বোতল এটা সেটা ভাঙল, তারপর মাছের মতন লাফ দিয়ে পড়ল উঠানে। মনে হয়, ইচ্ছাকৃত : অন্নপূর্ণা ও জ্যোতি এ ব্যাপারে হতচকিত, জ্যোতি খানিক উঠে, অন্নপূর্ণা এক পা বাড়িয়ে পাথর, শুধু হেমাঙ্গিনী হাতে তকলা, একবার আড় করে দেখে, উর্দ্ধস্থিত হস্তের তুলার দিকে মনঃসংযোগ করল।···বিন্দুবাসিনী ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে তখন ছাতা ছিল, বলেছিলেন, 'বৌ তার থেকে উয়ার গলায় পা দে না!' হেমাঙ্গিনী ভীত হয়েও শক্ত হয়েছিল। বিন্দু পিসিমা চোখের নিমেষে ছাতা ফেলে কুয়োর নিকটে রক্ষিত

বালতিতে হাতের চানকা মেরে এসে শিবনাথকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। কোনরূপে শিবনাথকে রকে তোলা হয়, অন্নপূর্ণা শিবনাথের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলি মুছে যখন টিনচার আইডিন দেয়, তখন শিবনাথ বুকফাটা চীৎকার করে উঠেছিল। তার ব্যথায় বিন্দু পিসিমার মুখখানি গামছা-নিঙড়ানর মত হয়ে গেল। একবার তিনি শুধু কঠিনভাবে হেমাঙ্গিনীকে ডেকেছিলেন—'বৌ।'

এই ডাকটির মধ্যে অনেক গঞ্জনা ছিল, হেমাঙ্গিনীর চেতনা নড়ে উঠেই স্থির, বললে, 'লাও লাও কোর্ট কলম দেখতে হবে না ঠাকুরঝি, তোমার বুককে যদি এতেক ফোঁড়া কাটছে···তাহলে তুমি কেনে না তাকে লিয়ে ফিটকারির ছানা কেটে···স্যাঙা কর না?' হেমাঙ্গিনীর চোখ তুলার দিকে, ফলে দেখা গেল যে, তার গলাটি উঠল নামল। হেমাঙ্গিনীর কথায় অন্নপূর্ণা পর্য্যন্ত জিব কেটেছিল।··· এসব কথা জ্যোতির খুব মনে আছে। সমস্ত ভালবাসা এসে জমেছিল ছেলে-মানুষের হাতে, যেমন এইটুকু পৃথিবীর নিয়ম।

এতক্ষণ বাদে বিন্দি পিসিমা বললেন, বৌ, তুমি ত আর কোনদিনই··· তোমাকে বলা দরকার বলেই বললুম···জ্যোতি ঘৃতকুমারীর পাতা চিনিস ত?'

'থাক থাক আর ওষুধ শিকড়ে কাজ নেই—সে ত এমনি তুমির বশ···'হেমাঙ্গিনীর এখনও বিলক্ষণ রাগ ছিল! একদার দুর্ব্বল শিবনাথ, আজ পাগলামির মধ্যে ভয়ঙ্কর, ইতর এবং শত্রু! সুস্থ অবস্থায় যা সম্ভব হয়নি এখন তা হয়েছে।

জ্যোতি, বিন্দি পিসিমার দেওয়া মোড়কটার দিকে চাইল; ওদিকে ভারী শিলনোড়ার দিকেও তার নজর পড়েছিল। তারই কিছু কাছেই হেমাঙ্গিনী দণ্ডায়মানা। সে যেন কালো আকাশের বজ্রের মত সুদৃঢ়! অনেকদিন আগেকার কথা, একদিন ঠিক এমনিভাবেই হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে এক পা দিয়ে নোড়াটা ঘোরাচ্ছিল; আর কেমন কেমন কথা, নিম্নে, নিকটে, উঠানে স্বদেশী বামনদাসের সঙ্গে কইছিল। আজও সেই নোড়ার শব্দটা মেঘডাকার শব্দের মধ্যে ছিল। কি ভয়ঙ্কর হয়েই না আছে! অন্নপূর্ণা মার হয়ে শিলনোড়াকে প্রণাম করেছিল, কারণ বাবার খাদ্য ওতে প্রস্তুত হয়। বাবার জুতায় অসাবধানে পা লাগলে এরা নমস্কার করে, পাপ যাতে না হয়। হেমাঙ্গিনী শুধু বলেছিল, 'যা যা ওসব আজকাল কেউ মানে না, ধুয়ে নিলেই হবে।'

বিন্দি পিসিমা উঠানে নেমে লণ্ঠনটাকে একটু যখন ঠিক করতে যাচ্ছিলেন তখন হেমাঙ্গিনী বললে, 'ওসব শিকড় বাকড়ের কাজ লয়, আগড় লিগড় চাই—।'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি ঘুরতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, শুনলে মা বলছে,

'তুই পুনি, ভুষণ কামারের কাছে গিয়েছিলি···শিকলের কি করলে?'

'বৌ ছিঃ ছিঃ লোকটা যে শুনবেক গো···'

না মার না মেয়ের মনে কিছু রিলি কাটলে। অন্নপূর্ণা তার কাপড়ে পায়ের গাঁট ঢাকতে ঢাকতে উত্তর করলে, 'বললে···ও কড়া হবে না,' বলে সে ঝটিতি জ্যোতিকে দেখে নিয়েছিল।

'কেনে? সে যে তার পায়ের মাপ লিয়ে গেল?'

'বললে আমাদের এখানে কড়া আটকাবার সাট নাই···বললে দুটা মিলারের তালা দিবে···শিকল পাক দিয়ে···'

এ হেন কথাবার্ত্তায় জ্যোতি পুড়ে যাচ্ছিল, বিন্দুবাসিনী শুধুমাত্র কঠিন হয়েছিলেন, তারপর তাঁকে আর দেখা গেল না। জ্যোতি রাগে লজ্জায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করেছিল। হেমাঙ্গিনী তখনও থামেনি, বললে, 'কালই যেন শিকল লিগড় আসে, তারপর দেখি কত বড় বজ্জাত তুমি···বলবি ভূষণ বেদান্তীকে···একোটা টাকা বেশী ল্যয় লিবে—উপোসী যাব···কাল যেন···'

জ্যোতি তবু সাহস করে বলেছিল, 'শিকল!'

'শিকল হ্যাঁ হ্যাঁ।' এই উত্তরে শিকলের ওজন-আওয়াজ দুই-ই ছিল।

জ্যোতি পুত্রমাত্র, যার মধ্যে স্বপ্নের রঙ আর ক্ষয়িষ্ণুতা দুই দুমড়াবে, সে এতাবৎ সন্তানমাত্র—খাদ্যই। আপনকার উষ্ণতা দিয়ে যে সমস্ত সমতা এনেছে, আজ হঠাৎ সে একাই বড় নিঃসঙ্গ। তার অন্তরে অর্গলহীন দরজা ঝোড়ো হাওয়ায় আছাড় খায়! দূরে দরজার অবকাশ দিয়ে দৃশ্যমান শূন্যতা। যে-জ্যোতি নিঃশঙ্ক চিত্তে রাস্তার যে কোন গোলমালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, এখানে সে কীটাণুকীট, এই সঙ্কল্পের সম্মুখে সে নির্জ্জীব। ছোট মুঠোটা থুতনিতে আঘাত করতে করতে সে ভেবেছিল বিন্দি পিসিমার কথা 'সোহাগ সাঙাত' ভালবাসা! একবার জ্যোতির মনে হল বিপিন গুপ্তকে খবর দেয়, কিন্তু তিনি ত কলকাতায় চলে গেছেন, তবে আর ত কেউ নেই যে তার বাপকে শিকল পরানোর বিরুদ্ধে যাবে। তার এমন সাহসও নেই যে, বাবাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়, কেন না দু-তিনবারই এমন হয়েছে যে, শিবনাথ চোর চোর বলে চীৎকার তুলে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে, আর জ্যোতি মার খেয়েছে!

ব্লাউজের মধ্যে মাহিনার খুচরা টাকা কয়েকটি ঝিলিপ্ ঝিলিপ্ আওয়াজ করে ছেলেমানুষ অন্নপূর্ণাকে পুরুষোচিত মর্ম্মবেদনা দিয়েছিল। তবু এইটুকু খুশি ছিল, কুর্ত্তির ডাল খেতে হবে না। এ খুশির কোন জোর নেই, বাড়ির সদর পার

হতেই 'ঝিলিপ' করে শব্দ হল, এই শব্দে তার কেমন যেন লজ্জা হয়েছিল। দেখলে, হেমাঙ্গিনী জলের বালতিটা মাজছে, তার পরনে শতচ্ছিন্ন গামছা। অন্নপূর্ণা গম্ভীর, গম্ভীরভাবে তাকে দেখলে। মনে হল, হেমাঙ্গিনী স্ত্রীলোক। অন্য পক্ষে হেমাঙ্গিনী ছবিলা হাসি হেসে বললে, 'পেয়েছিস ?' এসময় তার পুরো মুখখানি দেখা গেল : বাবুয়ানা পাতাকাটা, নাকে একটি ফেরোজা, কানের থুপি লাল রেশমী হয়ে আছে, গায়ের রঙ যেমন বা উলুধ্বনি করে উঠে।

অন্নপূর্ণা মায়ের প্রশ্নে কেবলমাত্র সুন্দর মুখখানি একবার এপাশ একবার ওপাশ করেছিল। আর মনে মনে ভেবেছিল, মা-দের কুৎসিত হওয়াই ভাল। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল, এ কারণ যে, অন্নপূর্ণার মনে যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ছিল, সেটাই যেন বা সহসা প্রতিভাত হল! একবার সে বাপের ঘরের দিকে চাইল, জানলার দিকে মুখ করে শিবনাথ দাঁড়িয়ে। সে আর কিছু ভাবতে চাইল না।

ঘরে এসে যখন টাকাগুলো হেমাঙ্গিনীর পায়ের কাছে রেখেছে প্রণাম করবে বলে, তখন হেমাঙ্গিনী বললে, 'উঁহু আমি প্রদীপটা জেলে দি আগে ঠাকুর প্রণাম কর, প্রথম মাইনে!' অন্নপূর্ণার একবার মনে হল, ঘরের স্বল্পান্ধকারে এই পালা শেষ হলে ভাল হত। আলো জ্বলল। অন্নপূর্ণা গম্ভীরভাবেই গোপীবল্লভকে প্রণাম করে উঠতেই তার মা বললে, 'ওঁকে এখান থেকে প্রণাম কর!'

অন্নপূর্ণা ঢিপঢিপ করে মাটিতে শিবনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখা গেল তার চোখে জলস্রোত। হেমাঙ্গিনীর চোখে পড়েনি, এবার তার পায়ের কাছে টাকাগুলি রেখে যখন প্রণাম করছে, তখন অদ্ভুত এক উষ্ণতা অনুভবে হেমাঙ্গিনী পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'উ কি লো কাঁদছিস কেনে!'

অন্নপূর্ণা আর থাকতে পারল না, হেমাঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাগো ই টাকায় শিকল কিনো না গো, আমার পাপ লাগবে মা,' বলে বোকার মত বললে, 'জ্যোতি টাকা পেলে…'

হেমাঙ্গিনী যে চোখে স্বামীর দিকে চায়, সেই চোখে চেয়ে বললে, 'ও! এখনি আমার তোমার!' বলে টাকাগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

অন্নপূর্ণা কিভাবে মাকে যে বুঝাবে, তা স্থির করতে পারলে না। সে বসে পড়ে অনুতাপের আবেগে বলেছিল, 'মা গো মা গো, বুকে বড় বিল্লী আঁচড়ায়…বাবা শিকল পরবে কেমনে সইব ?'

হেমাঙ্গিনী অন্নপূর্ণার একটি কথাও শুনবার প্রয়োজন বোধ করেনি, দেওয়ালে

মাথা ঠুকে বলেছিল, 'আমার কেনে মরণ হয় না!' অন্নপূর্ণার গলা থামল, তখন তার কণ্ঠ শোনা গেল, 'তুয়া ছুঁড়ির পরাণ টেঙোয়, সে ছোঁড়ার পরাণ আছে, ভাতারখাগী বিন্দুদাসীর পরাণ উতল এলোম্ভ হয় আর আমার মরণ নাই,' বলে দেওয়ালে পুনঃ পুনঃ মাথা কুটতে লাগল। সত্যই তার লেগেছিল। হেমাঙ্গিনী কাঁদছিল।

এসময় নোটগুলি সন্ধ্যে-হাওয়া উতলা হয়ে এদিক সেদিক সরে যায়, কক্ষে দুটি ক্রন্দনরত স্ত্রীলোক এবং মধ্যে মধ্যে প্রদীপ চচ্চড় করে উঠে। শুধু পাশের ঘর থেকে শুদ্ধ গানের পর্দ্দা ভেসে আসছিল। অন্নপূর্ণা মাকে বুঝাবার জন্যে বললে, 'মাগো বড় বুক আঁচড়ায়…'

একথায় হেমাঙ্গিনীর কান্নার দুঃখ সত্যই বাঁধ মানল না, সে বললে, 'তোরা কি ভাবিসলা যে আমার বুকে চোনা, লয়? নিত্যি নিত্যি মানুষটা রাস্তায় মার খাবে, আর আমি মাগী—' সহসা প্রদীপের চচ্চড় শব্দে হেমাঙ্গিনীর গলা স্তিমিত হল, প্রদীপে বোধ করি জল ছিল, সে কারণে এই শব্দ। 'লোকটাকে সকলে ঢিলাক, মারুক…মুখে বলব শিকল দিব না লাপতের লরুণ অঙ্গে লাগবে ফোঁড়া কাটব না, শিকল দুবো না…বেশ আজ দুটো টাকা…বেশ আমি ভিক্ষে করে…' ভাঙা ভাঙা কথা শোনা গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণার মন সায় দিতে চায়নি, কিন্তু হেমাঙ্গিনী যখন পুরাতন কথা তুলে বললে, 'যেমন কপাল ভেঙে দিয়েছিল লোকে, তেমন যদি প্রাণেই অঘটন হয়, তুইত আর যাস না, একা ছোঁড়ার…'

অন্নপূর্ণার চোখের জল এই যুক্তিতে শুকিয়ে গেল, তবু সংস্কার…প্রথম মাহিনার টাকায় বাবার শিকল কেনা হবে একথা মনে মনে ভাবতেই চাইছিল না। বড় কষ্ট হচ্ছিল। হেমাঙ্গিনী একটার পর একটা শিবনাথের অপদস্থের কথা উল্লেখ করলে, অন্নপূর্ণা প্রদীপের দিকে চেয়ে শুনতে লাগল। হেমাঙ্গিনীর স্বর তাকে যেমন বা নিঙড়ে মুচড়ে দিলে। সে এক ফাঁকে বুঝলে শিকল ছাড়া গত্যন্তর নেই; টাকাগুলো কুড়িয়ে মার হাতে দিয়ে বললে, 'ঠিক আছে আমি ভূষণ বেদান্তীর কাছে যাই।'

অন্নপূর্ণা বাহিরে বারান্দায় এসে শুনল তার বাবার স্খলিত কণ্ঠে গান 'এবার আমি ভাল ভেবেছি…যে দেশে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।' অন্নপূর্ণা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কিছুকাল নির্জ্জীব হয়ে থেকে বাবাকে অতি মাত্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা তুমি কি সত্যিই পাগল?'

শিবনাথ মৃদু মৃদু মাথা দুলিয়ে বোধ হয় সায় দিয়েছিল !

ভাটিতে ছোট একটা হাঁড়ি, ওপাশে বৌ আপন শিশুকে স্তন্যদান করতে করতে হাপরের শিকলে মৃদু টান দিচ্ছিল। নেহাইয়ের এপাশে ছোট চৌকিতে ভূষণ বেদান্তী। অন্নপূর্ণা যে এসময় আসবে, তা সে জানত, তথাপি প্রস্তুত ছিল না। বৌকে বললে, 'আঃ গে হিঃ আকালের অপয়া গো তুই…বটে, বামুনদিদি এল…তু যার হাতকে দুটো চাল ফুটোতে দু-দু রেল পাশ।' স্বামীর কথার উত্তরে বৌটি জোর জোর হাপর টানতে লাগল। ভূষণ বেদান্তী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'খাড়াও কেনে গো, বইসো, মাগী দুটা ভাত ফুটাইছে…বইসো গো।'

'না-না বসব না, ভূষণ তুমি ঝটপট লাও…'

'লে তুয়ার হাঁড়ি সরা,' বলে নিজেই হাঁড়ি সরিয়ে কিছু কয়লা দিয়ে ভাটির মুখে শিক দিয়ে ডাঁই করতে করতে বললে, 'আঃ তুমার ভাই আসছিল গো'। বলে খুব রগড় করা চোখে বললে, 'বলে, ভূষণ বেদান্তী, তুমি যদি এক বাপের বেটা হও, তবে শিকল করবে না, যদি কর ত বিপিন গুপ্তকে…আরে হুঁ… আমি বললাম কি…আমি বিলাতি জিনিস বিয়োই না ঠাকুর ! শুধু মস্করা করে বললাম বটে…। তুমি বলেছ কাউকে বলতে না। আমি জাত কামার, চোরে কামারে সাখেত (সাক্ষাৎ) নাই সিঁদকাটি তৈরী হয়।…আমি শিকল করি না ঠাকুর। উ বলে, দেখ বেদান্তী যদি কর ত আমি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দুবো। যাই বলা আমি ধুলা তুলে তিন তিন থুৎকুড়ি কেটে যাই তার দিকে চাই…দেখি…পলাইয়ে—।' কথা শেষ করে হেসে গড়িয়ে পড়ল ভূষণ বেদান্তী। এরপর অন্নপূর্ণার গভীর মুখখানি দেখে বললে, 'ছেইলা মানুষ বটে…আর দু দণ্ড গোড় আলতা গরম হোক পান দুবো…না হলে কড়া মজবুত হবেক না দিদি…' বলে ভূষণ বেদান্তী শিকলটিকে টেনে নিয়ে ভাটির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে দিতে লাগল। শিকলের শব্দে অন্নপূর্ণার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, তার গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল : সে কিছু একটা বলা দরকার বলেই বলেছিল, 'মজবুত করার, মানে খুব কড়া করার দরকার নাই, বেশী কড়াতে লাগবে, ভূষণ।'

ভূষণ বেদান্তী অন্নপূর্ণার কথা শেষ করতে দিল না, অট্টহাস্য করে উঠে বললে, 'হে হে বামুনদিদি গো, বেদান্তে বলছে, তুমি বিটিছানা ছেইলে মানুষ…তুমার দেখি মরা মাগের চুড়ি ছিনানয় বুক ফাঁটা গো, বাবু শিকলে মিছরি দুবার ঘর নাই…বেদান্ত কি বলে, বলে, নরম আর কড়া সোনা আর লোহা শিকল,

শশুরে বেটা শিকলই।' যে কোন সূত্রে কিছু সৎ কথা বলতে পারলেই ভূষণ বেদান্তী প্রীত হয়। অন্নপূর্ণা অবাক হয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল। ভূষণ তার কথার বাক্যে সায় সমর্থন না পেয়ে তার বৌকে বললে, 'বুঝলি ক্ষেপি এসব বেদান্তের কলম।'

বৌটি হাপর শিকলে টান দিতে দিতে বললে, 'তা বটে শিকল দিবে কেনে গো ঘরকে...'

ভূষণ কথাটাকে শেষ করতে দিলে না, হঁা হঁা করে বলল, 'ক্ষেপি ছ্যাকা দুবো তুয়াকে। আমি শুধ্যই তুই লবেল পড়িস নাকি গো, নাঃ, শিকলে বান্ধবেক না তুয়ারে অঞ্চলে বান্ধবেক! উয়ার দশা লাগছে রে উয়ার কথা ধরো না দিদি, বলে থাকলে সে শিয়ালের সঙ্গে ঘর বান্ধত...লে টান...'

ভাটির আলোতে অন্নপূর্ণার মুখে জোনাকি খেলে, তার হাত ঘামছিল...শিকল লালাভ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। পিছনে কাকে যেন সে অপরাধীর মতই অনুভব করে। কানে বহু দূরাগত শব্দ। এই সময় কিছু দূরের ঝোপে অল্প আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠেছিল, ফলে হাত থেকে তার টাকা দুটি খসে মাটিতে পড়ে গেল।

ভূষণ বেদান্তী আর কিছু তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকাল। বললে, 'কি গো...' বলে টাকা দুটি কুড়িয়ে তাকে দিতে গেল।

'কিসের শব্দ বটে, টাকা থাক তোমার,' এইটুকু কথা বলতে পেরে অন্নপূর্ণা যেন বেঁচে গিয়েছিল এবং সে নিজেই মন্তব্য করলে, 'শিয়াল বোধ হয়।'

ভূষণ ওপাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দুই সাঁড়াশী দিয়ে শিকলকে যুত করে তুলে ধরছে, অন্নপূর্ণা অস্ফুট স্বরে 'আঃ' বলেই সরে গিয়েছিল।

আর একজন ঠিক এই সময় নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকারগ্রস্ত। সে জ্যোতি। যার আওয়াজ কিছু পূর্ব্বে অন্নপূর্ণা পেয়েছিল। জ্যোতি দেখল, লালাভ শিকলটা তুলে কামার যুত করতে চাইছে। দূর থেকে এই লাল নরমুণ্ডমালার মত বস্তুটা তার কাছে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। সে খুঁ খুঁ শব্দ করে উঠেছিল। জ্যোতি সাহসে নির্ভর করে এখানে আসেনি, ভয়ই তাকে এখানে এনেছিল। ভূষণ বেদান্তী বোধ হয় রহস্য করেই একটি ছড়া কাটলে, 'লাগ হাতযশ বাপের ছেলে, দুগ্‌গা দুগ্‌গা নাম পেলে, তড়কা ভাঙ্গা ভাঙ্গা আগুন ড্যাঙা, ত্রিভুবন হইবে বাপ বলে ত্যাঙা। দুগ্‌গা দুগ্‌গা লাও,' বলে শীতল জলের মধ্যে শিকলটি ডুবিয়ে দিলে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত প্রলয়ের ধ্বনি উত্থিত হল। এই আওয়াজে ঝঞ্ঝার স্মৃতি ছিল।

অন্নপূর্ণার দেহখানি ভয়ে ত্রাসে মুচড়ে দুমড়ে নৈনেত্তর। অন্তরে যা কিছু সুবাস ছিল, সে সকল ম্লান, সে যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল।

জলের দ্রুত বাষ্প উত্থিত হয়, পাঁশুটে ধোঁয়া মহা আক্রোশে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত, বিভ্রান্ত অন্নপূর্ণা। তবু এই সুযোগে, নিজেকে প্রকাশ করবার পথ পেয়েছিল। বাপের জন্য যে বেদনা তাকে ক্রমাগত ধিক্কার দিয়েছে, একটি ছোট করাঘাতে তার খানিক হয়ত উপশম হত। সে দু'হাতে খুঁটি ধরে থেকেও আরও ভাল করে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। মুখখানি তার কিছুটা খুঁটির অন্ধকারে ছিল।

ভূষণ কামার 'হই' বলে কোলের ছেলেটির সঙ্গে রঙ্গ করতে করতে গাইলে, 'মন ওই শিকলে মাকে বান্ধিস···শিশুর মনের শিকল দিয়ে···কোনটা শিকল লয় ক্ষেপি, ই খোলটা (দেহ) শিকল লয়? অবিদ্যে মায়ায়···তুমি ঠাকরুণ একটু খাড়াও,' বলে জল থেকে শিকল টানতে লাগল। জলসিক্ত শিকলটা ক্রমাগত নিষ্ঠুর শব্দ করত জল থেকে বার হতে লাগল। অন্নপূর্ণা পুনঃ পুনঃ শিউরে উঠে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। ভূষণ বেদান্তী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিকলের রঙ পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'ইঃ শা বানালাম ঠাকরুণ ই তোমার জাহাজ বান্ধবেক···মত্ত আঁতঙ্গ (মাতঙ্গ) বান্ধবেক।' সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাসঙ্গীতও শোনা গেল এবং বললে, 'ব্যস ইবার শুধু কাঠে গেঁথেন দুবো ব্যস।'

জ্যোতি ঝোপের মধ্যে ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠেছিল, এক হাতে লাঠি অন্য হাতে পাঞ্জা। মদন পাঞ্জাটি তাকে দিতে বাধ্য হয়েছে, একারণে যে মদনের কাছে জ্যোতি সাহায্য চাইতে গিয়েছিল, মদন নানান দুঃসাহসের কথা বলার পর বললে, 'না ভাই যাব না, বাবা বকবে।' নিশ্চয়ই সে ভূষণ বেদান্তীর নামে ভয় পেয়েছিল। কেন না ভূষণ বেদান্তী ভূতের ওঝা এবং বাণ মারণ উচাটনে সিদ্ধ, তার গলায় বিড়ালের তাঁতে বাঁদরের অস্থি বাঁধা। মদন বললে, 'একমাত্র বগলাদাই ওকে জব্দ করতে পারবে।' ফলে জ্যোতিকে বগলাদার কাছেই যেতে হল। বগলাদা জ্যোতিকে দেখে হৃষ্ট হয়ে উঠল। এই দুঃখের সময় এমন জঘন্য ব্যবহার বগলাদা করবে, তা সে ভেবে পায়নি, বগলাদা একবার করে দূরে যায় এবং নিজের বাইসেপ ট্রাইসেপ দেখায় এবং ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার দিয়ে উঠে, 'ন্যায়াত্মা বলহীনেন লভ্য, তোর ভাবনা কি আমি আছি,' বলে কাছে এসে আদর করে।···ছেলেমানুষ জ্যোতি বলে উঠেছিল, 'কি হচ্ছে বগলাদা, আমি আমি!' জ্যোতির আপত্তিসূচক কথায় বগলাদা বললে, 'ও শালা, তবে যাও শালা আমি যাব না—।'

জ্যোতি একা। নিসিন্দের ঝোপের মধ্যে থেকে স্পষ্টই সবকিছু দেখা যায়। কখন যে ঠিক ভূষণকে সে আক্রমণ করবে, তা ভেবেই পাচ্ছিল না, পা তার মাটির সঙ্গে জুড়ে আছে, হাতের ঘাম প্যাণ্টে অনবরত মুছেছে, কিন্তু কোন প্রকারেই ছুটে যেতে আর পারছে না। এখন সে দেখতে পেল, ভূষণ তলাকার ঠোঁট দিয়ে গোঁপগুলিকে অদ্ভুতভাবে টানছে ফ্লপ ফ্লপ শব্দ করে, আর ভালভাবে শিকলটিকে পরীক্ষা করছে। এবার শিকল রেখে, গোঁফ পাট করে একটা গুঁড়ি সরিয়ে আনতে ব্যস্ত হল।

অন্নপূর্ণা অস্বস্তিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। তার দেহে যেন অতি প্রাচীন একটি মাকড়সা ঘুরে ফেরে। অধীরতায় সে মাটিতে পা ঘষছিল। তার মুখের কাছে ভৌতিক একটি আয়না বার বার খাড়া হয়ে উঠেছে। লোহার ঠাণ্ডা হওয়ার মেঘমন্দ্র আওয়াজ এখনও তার দেহে কম্পিত। এমত সময় শিয়ালের চাৎকার শোনা গেল। অন্নপূর্ণার কাছে স্থানটি মুহূর্ত্তেই বীভৎস হয়ে উঠল, চকিতে সে পিছনদিকে চাইল, মৃত্যুতিক্ত অন্ধকার এখানে সেখানে! দেখলে, কে একজন হাহা শব্দ করে ছুটে আসছে। অন্নপূর্ণা পলকের জন্য স্থির হয়ে এক পা সরে গেল।

বেচারী জ্যোতি বোকার মত লাঠিটা উঁচু করেই ছুটে আসছিল। একথা তার মনে উঠেনি, কামারশালের চাল অতীব নীচু, ফলে তার লাঠি আটকে যাবে। সুতরাং তার লাঠি চালে আটকে গেল।

ভূষণ বেদান্তী দ্রুত দৌড়ের শব্দ শুনেই, ক্ষণেকের জন্য চেয়ে দেখে, বাঁ হাতের সাড়াশী শক্ত করে ধরে এবং নিমেষেই ডান হাতে কিছু ধুলা তুলে থুৎকুড়ি কেটেই ধুলা ছুঁড়ে বললে, 'হোংরীং···হোং-রীং'। শব্দে মুখ বিড় বিড় করছে, চোখ তার ক্রমাগত স্ফীত হচ্ছে, এসময় ভূষণ তার গলালগ্নী মালার হাড় চুম্বন-করত বললে, 'আই গো!'

ভূষণের বৌ তটস্থ, সে কোনমতে বসা অবস্থায় পা উঠিয়ে কোলের ছেলেটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সে অবাক হয়ে দেখল, জ্যোতি টাল খেলে, লাট খেলে, লাঠি পড়ে গেল। দু-এক পাক ঘুরে মাটিতে চক্র দিতে লাগল। মুখে গাঁজলা, অন্নপূর্ণা বিস্ময়ে হতবাক্। এমত সময় ভূষণ হাপর শিকলে দু-একটা টান মেরে বললে, 'লে লে ক্ষেপি মাগী হাপর টান।' বলে সে ছুটে বাইরে এল। ক্ষেপি সত্বর ছেলেটিকে পাশে শুইয়ে, ঝপঝপ হাপর টানতে লাগল। অন্য হাতে ল্যাম্প ধরা। হাপরের আগুনের শিখায় দেখা যায়, বার বার অস্পষ্ট হয় যে, জ্যোতি

ভৌতিকভাবে মাটিতে চাকার মত ঘুরছে। হাতের পাঞ্জার খর খর শব্দ হয়। ক্ষেপি বললে, 'বুধ হয় বাপকে পরাণ ভাবে গো ছেইলা!'

'থাম থাম ক্ষেপি, সবংশে নিধন হব, বামুন মারলুম গো!' বলে দৌড় দিয়ে খানিক জল নিয়ে এসে জ্যোতিকে প্রদক্ষিণ করে ছিটোতে লাগল। অন্নপূর্ণা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাইকে ধরতে এসেছিল, কিন্তু ভূষণ বললে, 'এখন ছুঁও না!'

জ্যোতির মুখে এখনও গোঁঙানির আওয়াজ, মুখময় ধূলা। মুখ পা ছেড়ে গেলে চোখ খুলতে পারছে না, কেননা চোখে অজস্র ধূলা। ক্রমাগত জলের ঝাপটায় অনেকটা যখন সুস্থ, তখন সে দৈহিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। অথচ সেইকালে মুখে তার বীরত্ব ছিল, 'শালা শালা আমি দেখে লুব।' অন্নপূর্ণা কাপড়ের থুপি করে মুখের ভাপ দিয়ে চোখে সেঁক দিতে ব্যস্ত। ভূষণ জ্যোতির কথা বললে, 'ঠাকুর তুমি জুঁন্‌তো মেরো গো···আমি তোমার···থাঁই গো···! ঠাকরুণ আমি পৌছাই দিব গো···' বলে সে তাড়াতাড়ি শেষ কাজটুকু সেরে ফেলতে লাগল, মুখে সর্ব্বক্ষণ 'হায় হায়'।

'দিদি, দিদি আমি তোদের আর দেখতে পাব না···বাবাকে···'

'আহা বাবা-অন্ত পেরাণ গো,' ক্ষেপি এ সময় অগোছাল কাপড় টেনে বলেছিল।

'দিদি বাবার জন্যে শিকল···'

'না···না···তুই চুপ কর জ্যোতি···'

রাস্তায় অনেকবার জ্যোতি থেমেছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিসের শব্দে সে থেমেছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে। অদৃশ্য বস্তুর উদ্দেশ্যে আঙুল নির্দেশ করে বলেছে, 'দিদি···কিসের শব্দ গো?'

'ও কিছু নয়।' বলে পরম স্নেহে জ্যোতিকে সামলে নিয়ে অন্নপূর্ণা চলেছে। ভূষণ পাশেই ছিল, সে মাথায় শিকল কাঠ নিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। সে ইশারায় অন্নপূর্ণাকে কিছু বলেছিল, ফলে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, অন্নপূর্ণা জ্যোতিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, এক হাতে ভাইয়ের হাত অন্য হাতে তারই কাঁধ। জ্যোতি বললে, 'দিদি আমার বুক ছুঁয়ে বল যে শিকল আনছিস না?'

অন্নপূর্ণা পরম যত্নে কাপড়ের থুপিতে মুখের ভাপ দিয়ে বললে, 'বুক ছুঁতে নেই··খুব কষ্ট হচ্ছে···নারে?'

'আমার কিন্তু বড় ভয় করছে দিদি!'

বাড়িতে পৌছে, যখন জ্যোতির চোখে অন্নপূর্ণা গোলাপ জল দিচ্ছিল এমত

সময় জ্যোতি কিসের আওয়াজ পেয়ে উঠে বসল, 'কে এল দিদি…?' অন্নপূর্ণা তাকে সত্বর শোয়াবার চেষ্টা করে বলল, 'কোথায় আবার ?' এইসময় ফিস ফিস করে পুনর্ব্বার কথার আওয়াজ, এবং আলো এবং অন্ধকার জ্যোতিকে কেমন উতলা করে তুলেছিল। বেচারীর দেখবার কোন উপায় নেই। এবার লোহার শব্দ হল, জ্যোতি শিউরে উঠে অন্নপূর্ণাকে জড়িয়ে ধরতেই মধুর কণ্ঠে অন্নপূর্ণা প্রশ্নের আগেই বললে, 'কুয়ার কড়ায় বোধহয় বালতি লাগল নবীন জ্যেঠাদের বাড়ি।' বাড়ি যেন ভৌতিক হয়ে উঠেছে, এমন কি এ ঘরে অন্নপূর্ণাও ঘামছিল। তারও হয়ত ইচ্ছে হচ্ছিল ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠতে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল, কে যেন ডিঙি মেরে চলে গেল। দরজার শব্দ, খিল দেওয়া, সকল কিছুই বীভৎস হয়ে উঠছিল। জ্যোতি বললে, 'দিদি, বাবা কোথায় গো…?' বলে তক্তপোশের উপরে বাপের পা খুঁজতে লাগল। 'আমার বিছানা সরিয়ে দে…দিদি…' সুতরাং বিছানা সরানো হয়, এবং জ্যোতি শিবনাথের পা দুটি একত্র করে ধরে শুয়ে রইল। অন্নপূর্ণা এ ব্যাপার লক্ষ্য করলে।

ভোর হয়, গাছের পাতা অযথা কালো, পাখীর উড়ায় শূন্যতা উদ্‌ব্যস্ত। কখন যে তার হস্তদ্বয় শিবনাথের পা ছেড়ে দিয়েছে তা সে জানবে কেমন করে, তার বিছানাও সরে গিয়েছিল। সে উপুড় হয়ে ঘুমায়। কি এক দুঃস্বপ্নসূচক শব্দে তার ঘুম ব্যাহত হয়, সে তেলচিটে বালিশ থেকে মুখ তুলে চাইতে চেষ্টা করলে, যেমতভাবে কুকুরছানারা চাইতে চেষ্টা করে। এখন সেই চাপা গলার স্বর, 'লাগা তাড়াতাড়ি আর যেন ক্ষেপা…হ্যাঁ হ্যাঁ…ঠিক ঠিক দে।' কট করে শব্দ হল। 'লে লে ঝটপট…হ্যাঁ হ্যাঁ পায়ে দেখিস।' জ্যোতি জোর করে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে, দেখলে দিদি তখন বাপের পায়ে শিকলের বাঁধন দিয়ে তালা লাগাতে ব্যস্ত, নিশ্চয়ই তার হাতে ঘাম হচ্ছিল তাই সে মুছে বারবার। তার মুখটা কর্ম্মপটুত্বে বিকৃত, জিভ বার হয়ে আছে। পিছন থেকে ভূষণ বাপকে পাঁজড়া বাঁধন দিয়ে অনবরত মুখ দিয়ে বীভৎস শব্দ করত গোঁফ মুখ দিয়ে টানছে। অন্য পাশে মা…আর এক পাশে বিন্দু পিসিমা বাবাকে জব্দ করে রেখেছে।

জ্যোতি চোখ বড় বড় করবার চেষ্টা করলে, এ দৃশ্য সে বুঝে নিতে পারেনি, শেষে বিন্দু পিসিমা এদের সঙ্গে! সে যেন কাঁদতে গিয়ে বিকট চেঁচিয়ে উঠল, কেমন করে উঠে দাঁড়াতে হয় সে ভুলেছিল। অন্নপূর্ণা এখন তালা লাগাল, শব্দ হল, সকলেই 'হাঃ' করে নিশ্বাস ফেলে শিবনাথের দেহ ছেড়ে দিতে যাচ্ছে,

তখনই জ্যোতি 'বাবা' বলে লাফ দিয়ে উঠল। অন্নপূর্ণাকে ধঁ্যা করে একটি ঘুঁষি মারতেই তার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এবং জ্যোতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বাবা'।

শিবনাথ বললে, 'জ্যোতি, মারিস নি,' বলে, লৌহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করত বলেছিল, 'খুব ঠাণ্ডা রে খুব ঠাণ্ডা।'

দেশ, ২০ ও ২৭ ভাদ্র ১৩৬৫

ফৌ জ-ই-ব ন্দু ক

'খত্ আয়া হায়, য়ুও খত্ নে চাকু মারা' কোথা থেকে চিঠি এসেছে এবং সেই চিঠি ছুরি মেরেছে। 'চাকু মারা' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি নশ্বর চীৎকার দুস্তর অন্ধকার যেন বা অতিক্রম করে এল। গীতের মধ্যে অবশ্য চকমিলান যে-সরলতা ছিল, যে-মায়া বর্ত্তমান, তাই করতার সিং গাইতে চেষ্টা করছিল। গীতের ধ্বনি এখানে সেখানে যায়, যেখানে দেওয়ালে অজস্র গুলির ঠোকাইয়ে আদিম চিত্র অঙ্কিত, কভু বা সে-দেওয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ে, যেখানে জানলার পাল্লা দুলছে, যেখানে এখনই একটি সাধারণ ফ্রেমে বাঁধাই পারিবারিক ফোটো অজস্র ভাঙার মধ্যে কবরস্থ হল— হয়ে লোকগল্পের অভিশপ্ত শেষ উক্তিকে প্রতিধ্বনিত করলে, যেহেতু এখানে এখন যুদ্ধ হয়।

সম্মুখে অগণন আলো, কেননা এখনও সকাল, চারকোনা আধভাঙা গোলাকার ছেঁড়া-ছেঁড়া সতরঞ্চ-কাটা আলো, শিশির-শুকানো আলো, সদ্যঃপ্রসূত দুধেলা বাছুরের মত শাদা। আয়না ছিল না, এখন সে এই সকল আলোর দিকে তাকিয়ে আপনার চুল অবিন্যস্ত করছিল, এমনও হতে পারে যে, বেশ কয়েকদিন পূর্ব্বে নিজেকে মুখোমুখি দেখাটা স্মরণ করেই ইদানীং এই প্রসাধন। করতার একটি হাত সোজা উঠিয়ে চুলের শেষটি ধরে দাঁড়িয়ে, অবশ্য বাঁ হাতটি তার চুলের গোছ ধরে ছিলই, আরও যে এসময় তার দাঁতে দাঁতে কাঁকুইটিও ধরা ছিল; আলোর দিকে চেয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে —এই জন্যই সে থ, যে, তার অল্প-বোজা চোখে সম্মুখবর্ত্তী পরিদৃশ্যমান ধ্বংসাবশেষ যেমত বা লাঙল-দেওয়া জমির মতই প্রতীয়মান হয়, যে-জমিতে রাত্রি নামে না; ফলে সে ভারি খুশি, তারপর সে গীত গেয়ে উঠে।

চিঠির প্রসঙ্গ এবং আলোর হিলমিল তাকে খাকি পোশাকের মধ্যে রাখেনি; এত যে গুলিবিদ্ধ দেহ, বারুদের গন্ধ আর ভেঙে পড়ার আওয়াজ— তার কাছে সকল কিছুই ঢোঁড়া, এখন তার মনটি এখান থেকে গুরুজনওয়ালার গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যে গ্রাম থেকে পোস্ট অফিস বেশ দূর। হঠাৎ করতার কিসের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠল, ভারি বুটের 'থ্যালপ' করে শব্দ হল, পরক্ষণেই সত্বর

চুল গোছ করেই পিছন দিকে, নীচে, মাটিতে তাকাল ; লোকটি কেমন যেমন অষ্টাবক্র আধশোয়া, তার নিজের হাতের উপরেই মাথাটা ঢুলছে, নিশ্চিত সে ঘুমায়। সেখানে, ঠিক তারই পাশ বরাবর সামনে মাটিতে লাল, সবুজ, হলুদ ল্যাবাঞ্চুস— গতকাল তারা লুঠ করে পেয়েছিল— তা দিয়ে সুন্দর চিক্কণ লতা-পাতার কেয়ারি এবং একটি বড় ফুল করা, ছেলেমানুষে যেমত গোলাপকে স্মরণ করে আঁকে, তেমন যথাযথ ; লোকটি— ফৌজটি এই লতাপাতার উপর ঘুমে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিল, তার হাতের উল্কিকৃত পরীটি এই স্পন্দনে কেমন যেমন জাগ্রত, রসিলা, সোহাগিনী বলে বোধ হয়। এতদ্দৃষ্টে করতারের মন কাঁচা কাঠের মতই সশব্দে জলে উঠল।

করতার আর স্থির থাকতে পারেনি, নিজের ভারী বুটটা দিয়ে ফৌজটিকে নাড়া দিল ; সে জেগে উঠেই মুখের কষটা মুছবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখল, করতার মায়াবীর মত সরে গিয়ে রগের কাছে আঙুলগুলি রেখে গাইছে। ফৌজটির মুখে, এই গীত শ্রবণে নাল ঝরতে লাগল, সে অস্থিরপঞ্চম, উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুট পিছলে গেল, বন্দুকে পা ঠেকল— সেটাকে নমস্কার করতে গিয়ে, গীত খানিকটা এগিয়ে গেল ; তারপর উঠে ত্বরিত পায়ে এসে করতারকে জড়িয়ে ধরে, 'আই হুকী ইই' বলে ত্রাহি শব্দ করে উঠেছিল ; করতার প্রতিধ্বনিত করলে। দুইজনে যেমত বা নদীর এপার-ওপারে দাঁড়িয়ে ডাকছে, এই শব্দে অনেক পশুপাখীও হয়ত বা আসতে পারে। এইভাবে, কিয়ৎক্ষণ ডাকের পর তারা কী করে ? মৃত মানুষের মুখের উপর হেলমেটটা চাপা দেবার জন্য তাদের মন দুখায়। অথবা ফোল্ডার ক্যানভাসের মোড়া খুলে নিজেদের নম্বর নাম সাকিম এবং ছোট— প্রায় হলুদ-হয়ে-যাওয়া— ফোটোটি দেখে আর এক আওয়াজ করে, যাতে করে মনে ধোঁকা লাগে তারা পুরুষ না স্ত্রীলোক।

এমত সময় হঠাৎ বুটের আওয়াজ, এবং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে, ছোকরা কাপ্তান, হাবিলদার এসে দাঁড়িয়ে আপনকার রিভলভারের দিকে চেয়ে, একবার জানলা দিয়ে বাহিরের দিকে— যেখানে অনেক আলো সেদিকে— চেয়ে চোখ মটকাল, তারপর কাঁধ চাগাড় মেরে কর্তব্যসকল কিছু বলতে লাগল, ট্যাঙ্ক চলে যাওয়ার ঠিক পনেরো মিনিট বাদে, যখন সন্ধ্যা হবে তখন।

করতার সিং-রা চোখ হাঁইয়ে আদেশ শুনেছিল, এ-কারণ যে, পরিষ্কার করে না শুনলে নিজেকে ভুলে যাওয়ার দুর্ভাবনা আছে। হঠাৎ এই সঙ্গীন যুদ্ধে নিজেকে ভুলে যাওয়ার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই হতে পারে না, দাঁতে দাঁতে জিব

চাপলেও কিছুই মনে পড়ে না, পূর্ব্ব পশ্চিম যে জ্ঞান তা নিমেষেই শুকিয়ে যায়। করতার এই ছবি-ছবি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, আপনকার আঙুলগুলি মটকালে, বন্দুক ধরে ধরে কেমন যেন বা অবশ হয়েছিল, বিদ্যুৎবিভায় চকিতেই আঙুলের বুনট ঝিলিক দিয়ে উঠল, সে তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতের আঙুল কামড়ালে, এই হেতু যে নিজের ভিতরে রোমহর্ষ উপস্থিত, কেননা বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে, যার শব্দ অনেকটা বন্দুকে সাদর চুম্বনের আওয়াজের মত, কেননা রাস্তা কর্দ্দমাক্ত, কেননা অজস্র ভাঙায় ঝাঁক ঝাঁক হাঁসের ছায়া আর আলো। করতার ভীত চিত্তে রাস্তা দেখল।

নিজেকে চাগিয়ে নেবার জন্য অসম্ভব গালাগালি দিলে, কিছু কুৎসিত কিছু কাঁচা। তবু সে ঠিক সাহস পেলে না, যাতে করে সে রাস্তাটি পার হয়ে যেতে পারে, এমনকি এখন ফৌজ মানোহরও নেই যে তাকে একটি লাথি মেরে ঠেলে দেয়। সে যেমত বা অনড়, জগদ্দল। নিজেকে একা পেয়ে সে একটু আদরও করেছিল, ফোঁড়া হলে যেমন মানুষে হাত বুলায়, সেইরূপে, কিন্তু তবু মন কোথাও নেই; সকালের রোদ, সকালের গীত তাকে কিছুটা অকেজো করেছে।

শত্রুপক্ষের চোখ-ঝলসানো আলোয়, বৃষ্টিভেজা ভাঙা দেওয়াল, জিভ-বারকরা জানোয়ারের মত এবং আর আর সকল কিছু ভয়ঙ্কর। বারম্বার গুলির আওয়াজ কখনও কখনও করতারের পিছনে অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। আর এই সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয় মানুষের মর্ম্মান্তিক চীৎকার; করতার বোকার মত বালিখসা ড্যাম্পধরা ভেজা কর্কশ দেওয়ালটির দিকে তাকাল, মানোহর এখানে যদি থাকত, নিশ্চয়ই তাহলে সে বলে উঠত, 'ডাগ্‌দার নে সুঁই দিয়া হ্যাশালে— আর একটা বিধবা হল।' করতার আর এখানে রইল না; সে দৌড়াল।

সে দৌড়ে যেখানে পৌছাল, সেটা একটা মস্ত দরজা, একটি পাল্লা আধখসা, বন্দুকটিকে কব্জা করে সে উঁকি মারল; সমস্ত কিছুই অন্ধকার। নিজের বুটের দিকে তাকাল, এবং পুনর্ব্বার সে দেখবার চেষ্টা করে, একবার তার মনে হয়েছিল যে শত্রুপক্ষের কেউ এখানে থাকতেই পারে না, এ-কারণে যে খবর পাওয়া গিয়েছে তারা এ-তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে; তবু, সে অতীব সন্তর্পণে টর্চ্চ ফেলেছিল, ঘর আশ্চর্য্য ফাঁকা, সম্ভবত ঘরের আসবাবপত্র দিয়ে রাস্তায় বাধা তৈরী হয়েছে; শুধু দেওয়ালে দেওয়ালে সৌখীন ছবি, বিজলী বাতির সেজ, কিছু বই-পত্তর। কোথা বিশুষ্ক ফুলসমেত ভাজ্ উল্‌টে পড়ে আছে, ছোট্ট ঝাড়ের কলমের আওয়াজে পুরো নিথাদ চমকায়, অদূরে সিঁড়ি। ওপাশে দেওয়াল প্রায় পড়ে

গেছে, সম্মুখে ভাঁই কয়া ইটের উপর দিয়ে দেখা যায় রাস্তা, তারপর আবার ভগ্নস্তূপ। এখানে কোথাও ওঁৎ পাতবার জায়গা নেই। করতার দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আর একটি দরজার কাছে উপস্থিত, কেমন যেন বা গন্ধ, এ-গন্ধ সে এ-বাড়িতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিল ; সে নিজের হাতটা সভয়ে শুঁকে পুনর্ব্বার অন্ধকার ঘরের দিকে তাকাল, ছোট দীর্ঘশ্বাস সমস্ত দেহটিতে পরিপূর্ণ হয়, সে যেমত বা ভারী, নিশ্চয়ই দুঃখিত, এই বীভৎস লড়াইয়ের মধ্যে নিজের ইচ্ছাসুখে এই ভয়ঙ্কর কদর্য্য গন্ধের জন্য একটু দুঃখ করার সময় পেলে।

সে কি ভেবে একবার কালো সিঁড়ির দিকে চাইলে, দোতলায় উঠবার হুকুম ছিল না, দোতলাটা দেখা উচিত, কিন্তু একথা ঠিক, তার এখানে আর দাঁড়াতে ভাল লাগছিল না, তার, অন্যপক্ষে, গা যেন বা ছম্‌ছম্ করছিল, সে আর ক্ষণ-মাত্র নষ্ট না করে সিঁড়িতে পা দিল, ক্রমশঃ ধাপ একটু একটু উঠতেই তার কপাল ঘেমেছে, কেন না একবার ইতিমধ্যে সে ভেবেছিল, ‘মরেগা’। মরব বলতে এবং বলবার পরক্ষণেই যে তীব্রস্বরে উল্লাস করতে হয়, যা স্বাভাবিক, তা সে করেনি বরং ঠোঁটে ঠোঁটে সে চেপেছিল যেহেতু এতটুকু শব্দ না হয় সেই হেতু, কেননা সম্মুখে অন্ধকার। সে যখন সিঁড়ির মোড় ঘুরল, দেখলে উপরে সিঁড়ি যেখানে শেষ, তার কিছু দূরে ছাদ ভেঙে অনেকটা খোলা, এবং চন্দ্রা-লোক। করতার এখানে কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে দাঁড়িয়ে রইল, অনবরত গুলির আওয়াজ অথবা মধ্যে মধ্যে দূরাগত বোমার বিদ্যুতে তার মন স্থির হতে পার-ছিল না, ফলে এই বাড়ির কোন শব্দ সে বিশেষ ঠাওর করতে পারছিল না।

ফৌজের এক সময় পর্য্যন্ত সব কিছু ভাবনা থাকে, তারপর সে যন্ত্র, মৃত্যুকে একটু দেরী করিয়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কোন দায়িত্বই থাকে না, করতার তেমনি মরব বলে যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, পরক্ষণেই অথবা কিছুকাল পরেই মনস্থ করে, আর একটিবার নিশ্বাস নেব। এখন সে সিঁড়ির উপরে, দোতলায়, নতুন করে নিশ্বাস নেবার জন্য যখন সে প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক এমত সময়ে ঝটিতি দরজাটা খুলে পর্দ্দাটি ভৌতিকভাবে উড়তে লাগল, কোথাও বোমাও পড়েছে তার ‘খড়্’ করে আওয়াজও হয়েছিল, ফলে কম্পনে নিশ্চিত দরজাটা খুলেছে, করতার বেহুঁশভাবে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল, কিন্তু কিছু পরেই কোঁচকান চোখ যখন বড় করে চাইল, তখন সে দেখে, ঘরে চন্দ্রালোক ছাড়া অন্য কেউ নেই।

একটির পর একটি ঘর সে দেখে, অবশেষে একটি খোলা বারান্দা তারপর

আবার ঘর···অতি সন্তর্পণে ভাঙা সার্সির ফুটো দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখল, নিশ্চয় একটি জানলার উপরের লিন্‌টেল দিয়ে বাঁকাভাবে আলো এসে পড়েছে, মনে হল একটি পালঙ্ক— সে অতীব সাবধানতা সহকারে নীচু করে এখানেও টর্চ্চটা জেলেই দু-পা পিছিয়ে এসেই রিভলবার তুলবে, না বন্দুক তুলবে নিজে ঠিক করার আগেই সে সহসা যেন বুঝতে পারল তার টর্চ্চ জ্বালাই বন্দুক উঁচানো, মুখ দিয়ে অজস্র গালাগাল বার হচ্ছে, দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজে সে নিজেই চমকে উঠল। সে ভালো করে চেয়ে দেখলে, ভাবলে, এ কে ?

পালঙ্কে কার মূর্ত্তি, নিষ্পলক চোখ দুটি টর্চ্চের আলোয় বিচলিত নয়।

করতার কী ভেবে চতুর্দ্দিক দেখলে। বোধ হয় নিজেকে স্মরণ করতে চাইল, এবং তার মনে পড়ল যে, খাটের উপরিস্থিত মানুষটিকে দেখবামাত্র সে কটু মুখ খারাপের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, 'শালে তুমারা উর্দ্দিকো রঙ ফিরা দেগা'···তারপর বাক্যস্রোত থামে, ঠোঁট ফস্কে এক আধটা গালাগালির ভাঙা টুকরো বার হল, এখন দাঁতের আওয়াজ, এবং হুলো বিড়ালের মত বিরক্তিকর আওয়াজ করে হাস্যকর কথা বলেছিল, 'হুকুম দো !'

তখনও মূর্ত্তিটি স্থির। শুধুমাত্র হাওয়ায় বোধ হয় নয়— অন্ধকারের আলোড়নে চুলগুলি খেলে গেল।

করতারের টর্চ্চ নিভে ছিল, পায়ের অতি নিকটেই চাঁদের আলো, এবং ওপাশে অন্ধকারে মানুষটি, অনেক শব্দ থাকা সত্ত্বেও করতারের কানে ভাঙা সার্সির টুকরো, যা এখনও ছোট কাপড়ের পটিতে ঝুলছিল, তা অন্য কাঁচে লেগে অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করছিল। সে একবার দেখবার চেষ্টাও করলে। ওপাশে আয়নায় বোমার আওয়াজে চিড় খাওয়া ফাটা রেখা দেখা যায়, জন্তুর চোখের মত উজ্জ্বল। এখন সেই আয়নায় কে যেন বা প্রতিফলিত ; করতার আড়ে দেখেছিল, আর একবার দেখবার চেষ্টা করেছিল।

বিস্ময় তার বোধশক্তিকে— এমনও যে হস্তধৃত বন্দুক, সেটিকে পর্য্যন্ত— যেমত বা উদ্ভিদে পরিণত করেছিল ; অত্যন্ত আর্ত্ত রুগীর কণ্ঠস্বরের মতই, সে একদা আপনার সাজ-পোশাকের শব্দ পেয়েছিল কিন্তু তাতেও তার সাড় হয়নি ; এখন বিমূঢ়। অবশ্য এই সময়ে, এই সূত্রে তার চোখের সম্মুখে যেমন ধূপছায়া অন্ধকার ছিল, তেমন স্বপ্ন দেখার মত অসংলগ্ন অনেক এটা-সেটা কথা কালো-সাদা হয়ে উঠেছিল, যে-সকল কথায় অতি ধীরে মাথাটা ছোঁয়াবার চেষ্টা করলে, করলেও সে কৃতকার্য্য হত না। কেননা বুঝতে পেরে কোন কিছু স্থির করা তার পক্ষে

অসম্ভব। এ কারণে যে, এ-সকল কথার মধ্যে লড়াইক্ষেত্রের ভয়াবহ রূপ ছিল। এ শহর পরিত্যক্ত বাঁধানো দাঁতের মত বিসদৃশ আর এখানেই কি করে মানুষটির উপস্থিতি সম্ভব হল, রাস্তা-ঘাট, পালানো, লুকানো, গুলি বারুদ, সব কিছু মিলে করতারের চোখের পিছনটা চৌচির করবার উপক্রম করল। 'জাসুস' কথাটা কোনো সূত্রেই তার মনে পড়ল না, এবং তরুণ বেচারী ফৌজটি সে-কথা কিছুতেই ভাবতে পারল না, ভাববার তার অধিকার নেই কেননা সে ফৌজ, আর একের উর্দ্দির রঙ ফিরাবার পুর্ব্বমুহূর্ত্তে যথা সে কখনও ভাবে না, লোকটি একটি বাবা, না একটি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র।

আকাশমার্গে আওয়াজ নেই, পদাতিকের গোলমাল খুব মৃদু, একথা সে বুঝেছিল; ফলে আর একবার কান খাড়া করে কি শোনবার চেষ্টা করলে, আশ্চর্য্য, এ সময় তার চোখের সম্মুখে অনেক ফৌজ-ই ট্রাক ভেসে উঠে, ট্রাক-গুলি শ্লথগতিতে যায়, মানুষগুলি কি একটা গান গাইছিল, তিমি-মুখো ট্রাক চোখ জলজলে, ক্রমে কাছে এল, রাস্তার আলোয় সে দেখেছিল ট্রাকের বোনেটে উর্দ্দুতে লেখা 'ইরান কি হুরী' ধীরে মিলিয়ে গেলে, অনেক পরে আর একটিতে লেখা 'আশমান কি তারে'; এই দুটি কথায়, তার মাথার মধ্যে সীস্-মহল তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সেখানে কে যেন বা নাচে। মেয়েটি উদ্ভিন্নযৌবনা, সুন্দরী অবশ্যই, হাতে রেশমী রুমাল, সুরমাটানা চোখে চিকণ সোনার ফ্রেমের সৌখীন চশমা।

এখন এই কক্ষে, করতারের কেবলমাত্র 'আশমান কি তারে' কথাটাই মনে পড়ল, যদিও মানুষটি কি স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ, তা একবারও প্রকৃতপক্ষে মনে হয়নি! কে অন্য আর একজনা তার অন্তরীক্ষে নানান কণ্ঠস্বরে 'আশমান কি তারে' কথাটা উচ্চারণ করে চলেছে। এতক্ষণ বাদে সে নিজে বুঝল তার জামা যেমন বা ঘামে লটপটে, ফলে একটু জামা আলগা করবার মানসে হাত তুলতে গিয়েই সহসা সে টর্চ্চটা জ্বালল।

তেমনি সে বসে। স্তব্ধ নিঃসঙ্গ একা।

টর্চ্চ জ্বালার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা সেখানে কোনই পরিবর্ত্তন নেই, জলের ফোঁটার মতই স্বচ্ছ। ফৌজ করতার সিং এতদৃষ্টে যেমত বা বেয়াকুফ হয়েছিল, সে টর্চ্চটার দিকে জন্তুর মত চেয়ে, খানিক পরেই টর্চ্চটা ধরে নাড়া দিল যেমন বা লোকে ঘড়ি নাড়া দেয়। পরক্ষণেই জ্বালাল নেভাল, মুখখানি দেখা গেল, আবার অন্ধকার। তার পরেই সে দৌড়ে খাটের কাছে গিয়ে বিছানায় টর্চ্চটি রেখে, বাঁ হাতে রিভলবারটি তুলে ডান হাত দিয়ে সমস্ত অবয়ব

খোঁজ করতে লাগল। চকিতে ইতিমধ্যে ক্ষণেকের জন্য ট্রাকের লেখা 'আশমান কি তারে' স্পষ্ট হয়েই মিলিয়েছিল।

নিজের হাতটি এতাবৎ অস্ত্রের খোঁজের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, ঢোলে মৃদু মৃদু যেমন ঠেকা দিয়ে চলে তেমনই আঙুলগুলি উঠানামা করছিল, এক দুই তিন গোনার সঙ্গে সহসা আপনকার হস্তদ্বয় কেমন যেন কঠিন বলে বোধ হয়; টর্চ্চ নেভান হয়েছিল, সে অল্প চোখে চাঁদের আলোর দিকে তাকালে, কেমন এক অনুভব যেন বা সেখানে লেখা ছিল, এবং মাথাটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে নিজের আঙুলের দিকে তাকালে, অন্যমনস্কভাবে রিভলবার রাখতে গিয়ে থেমে, সহসা নিজের দেহ যে একটু দুলে গেল তা বুঝতে পারলে, এবং পলকেই সে খাটের কাছে গিয়ে পুনর্ব্বার সেই দেহটি অনুভব করার মানসে জিজ্ঞাসু হাতটি রাখল। করতারের হাতে অপরাধ ছিল না, যা ছিল তা আশঙ্কা। আর পথশ্রম কাতর সৌরভের গন্ধে মন অবশ।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আনারের ভিতর যেমত উষ্ণ থাকে, তেমনি উষ্ণতা, শব্দহীন স্রোতস্বিনীতে হাত দিলে যেমন মুখর হয়ে উঠে, শব্দ বর্দ্ধিত হয়, তেমনি করতারের অনুভবেই এ উষ্ণতা হয়ত বা বর্দ্ধিত হয়েছিল। করতারের হাত যেমত বা বজ্রাহত, ঝটিতি দূরে সরে গেল।

করতারের নিজেকে কেমন কেমন বোধ হল, মনে হল সেই দেহের খানিক দেহ যেমত বা তার হাতে এখনও মাখামাখি হয়ে আছে, সে হাতখানি গালের কাছে তুলতে গিয়ে থমকে স্থির, এ নয় যে তার মুখে অল্পবয়সী দাড়ি আছে; তার হয়ত মনে হয়েছিল এটা কি ঠিক হবে। এবং এখন সে চাঁদের আলোর দিকে আর একভাবে তাকাল।

তার কণ্ঠের শিরা উপশিরা ফুলে মুরগীর পায়ের মত হয়েছিল, কেননা গলার ভিতরে হাজার ফৌজ-ই কণ্ঠে 'আই হিকি কি' পাশবিক ধ্বনি; মানোহরের কণ্ঠস্বর স্পষ্টই সে শুনতে পেয়েছিল, যে-গলা আজই সকালে সে শুনেছিল। স্ত্রীলোক দেখলেই ফৌজরা এমত চীৎকার করে, আর হাত দুটি হ্যালা ভ্যাবলা করে তথা ভাল্লুকের মত করে তুলে থপাস করে নাচে। করতারের কণ্ঠই শুধুমাত্র অল্পক্ষণের জন্য ফুলেছিল। ফুলে যে ছিল তা সে বুঝতেও পারেনি, অবশ্য জামার কলারটা একবার আঁট বলে খেয়াল হয়, যেহেতু এ-সময় আর এক উষ্ণতা অনুভব সে সম্যক উপলব্ধি করেছিল। শীত, ছোট একটু আগুন, সকলেই তারা হাত মেলে বসে, নাপিত রণছোড় শোকসন্তপ্ত লায়লা মজনুর কথা বলে,

এবং কাহিনীর মাঝে মাঝে কাওয়ালের ঢঙে লায়লার প্রতি মজনু তথা দু'জনের প্রতি দু'জনের ভালবাসার রূপের কথাই গায়। আজও মনে পড়ে আগুনের উপর ছড়ানো আঙুলগুলির থেকে সে, করতার, একবার নাপিতের দিকে মুখ তুলতে গিয়ে অসম্ভব আড়ষ্ট হয়েছিল। শুধু তার চোখে পড়েছিল নাপিতের কানের মাকড়ি, তারপর সে মুখ ফিরিয়ে আর একটু পাশের দিকে চেয়েছিল, শুধু নিঃসঙ্গ ধু-ধু জমি আর অন্ধকার এবং ফাঁকা। পরিদৃশ্যমান ফাঁকা শূন্যতাকে সে সুগভীর নিশ্বাসে টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল।

এই পুরাতন কাহিনী শুনবার জন্য যেমন সে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, তেমনি সে-অন্ধকারের দিকে সে-কাহিনী ওতপ্রোত। এখানে বৈশাখের মেঘের মত চক্ষের নিমেষে উদয় হয়ে পরক্ষণেই উধাও। করতার একটি নিশ্বাস নেবার অল্প অবকাশ পেলে; সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব তাকে, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সম্বন্ধহীন করেছিল, অবাস্তব করেছিল। একদা ক্ষীণভাবে ফৌজ-ই কর্ত্তব্যবোধ তাকে নাড়া দিয়েছিল, ফলে সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে সে নিজের রিভলবার তুলে ধরতেই কেমন যেন বা চমকে উঠল; সম্ভবত সে রিভলবারটাকে অসংস্কৃত দাঁতে কামড়াতে চেয়েছিল।

এইটুকু ভদ্রগোছের পাশবিকতা এর মধ্যে ছিল বলেই, তৎকালেই সে, করতার, আকাশে তারা আছে কিনা দেখতে চেয়েছিল; তারার বকলমে আকাশ, তথাই আকাশের নামে কিছু তারা, এ-কারণে যে, সে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পায় সে কথাই আর একবার বুঝে আসবে। এবং কক্ষের বিস্ময় হাতেনাতে পেতে হলে নিজের রক্তেও আর একটা বিস্ময় প্রয়োজন, এই বুঝে নেওয়াই সে বিস্ময়। এবং করতার বন্দুকটা হাতে নিয়ে, একবার স্বাভাবিকভাবে সশব্দে পা ফেলেই সাবধান হয়ে কক্ষ সন্তর্পণে পরিত্যাগ করলে।

এ ভাঙা ছাদের মধ্যে, ছোট আকাশ— শিশু মেষশাবক লাফানোর পিছনে এ আকাশ যথার্থ— করতার দেখবে বলে এসে অনেকক্ষণ ধরেই দেখেনি, অন্য-পক্ষে সে তার পুরু ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে কী যেন মনে করবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ সামরিক কায়দায় ঘুরে দাঁড়াল, একমনে কিছুটা লড়াইয়ের আওয়াজ শুনলে, মৃদু করে হাসল। কেননা এখন তার জলধারা দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, কেননা অঙ্কুরিত ক্ষেত দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, কেননা এ সকল দর্শনে সে করতার সিং কিনা ঠিক ঠিক বুঝতে পারতই।

করতার কক্ষের দরজার কাছে দাঁড়াতেই বুকে যেমন বা অতর্কিতে কি যেন

এসে লাগল—সে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে নিজের আশপাশ দেখে, অসম্ভব অন্য রকম হয়ে গেল; ভিতরে যেমত বা একটি খুশি শিশুহস্তীর মত দুলছে, বহুদূর পথ অতিক্রম করে গৃহে ফেরার যে আনন্দ, বৃষ্টি দেখবার যে আনন্দ, কুর্ত্তিকলাই ঝামরে-উঠা ক্ষেত দেখবার যে আনন্দ, নিজের নামে চিঠি আসার যে আনন্দ, এসকল আনন্দ মিলে এক হয়ে তাকে গোঁয়ার করে তুললেও সে কেমন যেন বা নড়বড়ে, সে আপনার দাড়িতে হাত দিয়েও সেই লজ্জার কিছু বিহিত করতে পারল না, বন্দুকটির এটা-সেটায় হাত দিলে, খুট্‌খুট্ শব্দও হল।

নির্লজ্জভাবে কক্ষস্থিত চন্দ্রালোকে দাঁড়াল; সহসা বন্দুকের দাঁত-ঘষা শব্দে সে চমকে উঠল, এর পরই নিজের বুটের 'খ্যালাক্' করে আওয়াজ নিজের একাগ্রতাকে ভেঙে, মুচড়ে দুমড়ে দেয়; এইজন্য, যে তার নাম, নম্বর, রেজিমেণ্ট, মেডেল-কাঙালপনা মনে পড়ে গেল। আর যে, সে যে অতিসামান্য, সেকথা সামনের অন্ধকারকে আরও কালো করে তুলেছিল। তার ভিতর একথা অস্বীকারের জন্য উঁ-উঁ কাতরোক্তি করে, সে নিজেকে এড়িয়ে কোনক্রমে একবার খাটের দিকে চাইল, অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে, কুঁকড়ে মোচড় দিয়ে, বুটপট্টি উর্দ্দি থেকে, সাপের মতই বার করে নিয়ে এল। 'হুঁা' বলে শব্দ করে উঠল, একারণে যে তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে তার শক্ত পাঞ্জায় হাল ধরা একটি সাবালক ছাড়া কিছু নয়—সকালের রোদে গীত গাইতে গাইতে যে ক্ষেতের দিকে যায়।

অন্ধকার করতারকে খেদিয়ে বেড়াচ্ছিল, সে ক্রমে নিজের আড়ষ্টতা ত্যাগ করত খাটের নিকটে যাবার জন্য বিশেষ আকুল হয়, যেহেতু অন্ধকারসমূহকে সে কোনক্রমে সহ্য করতে পারছিল না, কেননা অন্ধকার তো আর অন্য কিছু নয়, আপনকার ছায়াসকল আপনার দেহে থাকে—ক্রমে জমে উঠে, সুতরাং দেহ আরও ক্লান্ত এবং কালো করে তুলে। ফলে, সে সকালের পূর্ব্বদিকে চেয়েছিল। এ চাওয়া তার ফৌজ-ই ঔদ্ধত্য নয়, পরিচ্ছন্ন শরতের মেঘ।

কব্জির পিতলের চাকতিটা বন্দুকে লেগে ভারী খুশির একটি মেয়েলি আওয়াজ রচনা করেছিল; এবং যুগপৎ ছোট একটি বাধাও মনে সৃষ্টি করে, অনেক পথ হাঁটার কালে মানুষে যেমত থামে, তেমনি সেও থেমেছিল। করতার ইদানীং সঘন আনন্দের মধ্যে যেমন গূঢ়তা, গূঢ়তার মধ্যে যেমন রহস্য, রহস্যের মধ্যে যেমন স্পন্দন, তেমনি এক স্পন্দনে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। নিমেষেই এই স্পন্দনটুকুর বলে, বিছানার কাছে চোখের সম্মুখে আপনার মুখখানি এনেছিল, চক্ষুদ্বয়

সত্যই অতীব রহস্যময় গভীর, শব্দ যেন বা সেখানে প্রতিধ্বনিত হয়।

ফৌজ অত্যধিক আশ্চর্য্য, দিব্য চক্ষুদ্বয় একরূপ অপ্রকৃতিস্থ মনোভাব তাকে এনে দিলে যে, সে যেমন গুলি হাতড়ালে গুলি পায় তেমনি তার বিশ্বাস ছিল যে, জামার পিছনে, মাংসের পিছনে, পাঁজরার পকেটে যেখানে সেটি আছে অর্থাৎ হৃদয়, অনায়াসে সে পাবে এবং এখন ভুল না ভাঙলেও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছিল, জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপুট আর্দ্র করেছিল। এরূপ অসম্ভব একটানা চাহনি, নির্জ্জীব বস্তু ছাড়া আর অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়, তবু হাতিয়ারে উৎকীর্ণ চোখেরও ঠোঁট নড়ে, আঁকা-চোখ তর্জ্জনী তুলে মানুষকে শাসায়, কথা বলে। কিয়ৎক্ষণের জন্য করতার এইভাবে একীভূত হয়ে রইল। পরে মনটা একপাত্র জলের জন্য মুখিয়ে উঠল, কেননা জলে আপনার প্রতিবিম্ব সে দেখবার জন্য ক্ষিপ্ত, একারণে সে যেমত বা ক্রমশঃ নিজেকে ভুলে যাচ্ছিল। অথবা বোধ হয়, কোন সূত্রে একথাও হয়ত বা ভেবেছিল— নিজেকে মানুষের মত দেখবে যে-মানুষের কাছে খিদের কিছু মানে আছে, কিছু রাতের মানে আছে, আবার কিছু রোদেরও ধর্ম্ম আছে।

করতার চকিতে ঘরের এপাশ ওপাশ করল, আর যে তার অসহিষ্ণুতা ঘরখানিকে বড় বেশী করে আয়তনে সংকীর্ণ করে এনেছে; যেন মনে হয় ঘরে আলো বর্ত্তমান, এমত ধারণায় সে এই অসহিষ্ণু চলা-ফেরার মধ্যেই দু-একবার চোরা চাহনিতে মেয়েটির দিকে চেয়েছিল। কি জন্য যে সে এভাবে দৃক্পাত করেছিল তা সে নিশ্চয়ই জানত না, যেহেতু সে এখনও নিজেকে সম্যক করে ধরতে পারেনি, তথা যথাযথভাবে ঠাওর করতে সক্ষম হয়নি, একথা তার মনে নিশ্চিত পড়ে যে, একদা যুদ্ধক্ষেত্রে সে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, ত্রাসে 'একি একি!' বলে তারস্বরে গর্জ্জে উঠেছিল, এবং সে অবশেষে নিজের হাত কামড়াতেই যখনই রক্তের স্বাদ নিজের জিহ্বায় লাগল, বুঝেছিল আমি মানুষ ত্বরিতে পুনর্ব্বার সে যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। সেইভাবেই কি এখানেও এগিয়ে যাবে? এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল সার্সির কাঁচ।

আপনকার মুখখানি গভীরভাবে দেখল; সীসের মত মৃদু আলো তাতে তার মুখের ছাপ প্রতিফলিত, সে বড় খুশির সঙ্গে এইটুকুই দেখতে লাগল— এ সময় বুকের চাকতিগুলি খুব আবেগে চেপে ধরে, হাতের চাকতি যা ধাতুময় তা মুখে কপালে এখানে সেখানে ধীরে ধীরে ঠেকায়— আবার সে গভীরভাবে সার্সির দিকে চাইল; কোনমতে আন্দাজ করে কিছু গোঁফ, অনুভবে আন্দাজ করে

কিছুটা দাড়ি, প্রত্যক্ষ হয়। তাকে যে মানুষ ক্ষণ তারিখ কিছু বলতে পারে না, যার কাছে দিন আর রাত ছাড়া সময়ের আর বিভক্তি নেই, কয়েক ঘণ্টার রেশন দেখে শুধু বুঝে 'কাল চলবে' এই যার ভবিষ্যৎ; বুট যার গৃহ, বন্দুক যার বন্ধু, তার পক্ষে এইটুকু দেখাই যথেষ্ট। তবু সে লোভ সামলাতে পারলে না, টুক করে টর্চটি জ্বালাতেই চোখে পড়ল, সার্সির কাঁচে, আপনার সমুদ্রাহত দুটি চোখ।

করতার নির্ভরতায় উল্লসিত হয়ে উঠে, 'হাঃ' শব্দ করে উঠল, এবং মহা আবেগে খাটের কাছে গিয়েই সে বিচলিত, যেহেতু জিহ্বায় রক্তের স্বাদ, যে স্বাদে একদা সে স্বাভাবিক হয়েছিল, এখনও সে নিজেকে রুখেনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে রক্তিম জিহ্বা থেকে, এক নিশ্বাসে, সমস্ত রক্ত যা তার গ্রাম্যজীবন তথা মাটির সবুজতা এবং আকাশের তারকানিচয়কে আড়ষ্ট করেছিল, অম্লান-বদনে শুষে নিয়েছিল। দু-একবার সাধারণভাবে গলা ভিজিয়েই ক্ষণেকের জন্য আলো জ্বেলেছিল।

সম্মুখে, মধ্যরাত্রের আকাশের গাম্ভীর্য্য। করতারের মনে হল, একি মৃত বালি-য়াড়ি?– অন্য কিছু নয় শুধু পুরুষের দর্পেই মনে হল– প্রথম বৃষ্টিসিক্ত, ফলে সোঁদা গন্ধযুক্ত ক্ষেত, যা সহজেই অক্লেশেই ধুনে দেওয়া যায়। মেয়েটি একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে, যদিও সুন্দর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎমাত্র স্থানচ্যুত হয়নি, তবু চক্ষুদ্বয় এ সময় কিছু ব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু হতভাগ্য ফৌজ তা লক্ষ্য করেনি।

বুটপট্টি সাফকৃত পোশাক-আসাকে এতকাল দাঁড়াতে পেরে যার গৌরবের সীমা ছিল না, আজ এখন সে নিজেকে বড়ই কাবু বোধ করল; মনে হচ্ছিল বুটপট্টি খুলে খালি পায়ে দাঁড়াই, সারা দেহের রোমাঞ্চ কিয়ৎক্ষণের জন্য সত্যই চোয়ালে একীভূত হয়ে পুনর্ব্বার সহজ হয়েছিল; সে মেয়েটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও চোখ ফেরাতে পারেনি, অবশ্য যদিও অন্ধকার। বন্দুকের নলে হাত ঠেকিয়ে যেন তার আশ মিটছে না, গ্রীষ্মের ভোররাতে হিম সেখানে, এই হিমবাহ তার সামনে একটির পর একটি পরিপ্রেক্ষিত খুলে খুলে দিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড শিশমহলের হাজার হাজার করতার তবু কেন–কেন নিঃসঙ্গ! কেননা অনেকদিনের অশুচি দেহের বিড়াল-বিড়াল গন্ধটা তাকে বড় ছোট করেছিল, মনে হল খুব একটা লম্বা পুরো সোডা সাজিমাটি দিয়ে শান্তিকালের স্নান এখুনি করতে পেলে বড় ভাল হয়, বড় লাজবাবই হয়। আর যে, এর পরই হঠাৎ সে নিজের উপর বড় বিরক্ত হয়েছিল।

নিজেই নিজের কাল হল; অন্তত এতাবৎ তাই ছিল, গোঁয়ার হতে হতে

থমকেছে, চমকেছে, এবার সে নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে সোজা উঠে দাঁড়াল; মাথাটা ঘুরিয়ে চতুর্দ্দিকে দেখে দাঁতে দাঁত শান দিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট বাতি বার করে দরজার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল, ভ্রূযুগল একত্রিত করত কি যেন আর একটু ভেবেছিল; এবার হাসল, এবং বাতির মাথায় টর্চ্চটি ধরে জ্বালিয়ে এমনভাবে মেয়েটির দিকে চাইল, যেন ভাবটা এই যে, 'এবার কিছু বলতেই হবে।'

মেয়েটি তখনও জড় শ্বেত সুন্দর চাদরের উপরে মার্ব্বেলের মহিমার মধ্যে স্থির; চক্ষুদ্বয়, করতারের হাড়ের সঙ্গে মাংসের বন্ধন ছিন্ন যদিও করেনি তবুও তাকে বোকা সচকিত করেছিল, মোমবাতি জ্বালার অর্থ এই যে মৃত্যুকে পথ দেখিয়ে আনা। একারণে যে লড়াইয়ের মৃত্যু আলো বিনা অন্ধসদৃশ; মোমবাতি দেখে নিশ্চয়ই মেয়েটি অধৈর্য্য হয়ে উঠবেই। অথচ মেয়েটি শিলা যেমত বা।

এত সৌন্দর্য ফৌজ করতার কোন চোখেই দেখেনি, তবু বাতি জ্বালানোর মতিভ্রম সৃষ্টি করলেও সাহস সে সঞ্চয় করতে পারেনি; সে জবুথবু থ। টর্চ্চ জ্বেলে কিছু একটা স্পষ্টত জেনে নেবার কারণে ঘরের চারিদিক দেখেছিল, সে ক্রমশ বড় গরীব হয়েছিল যেহেতু এখানকার আবহাওয়া আসবাবপত্র বড় বিধর্ম্মী—সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বড় জড় হয়, তবু সহজ চোখে পালঙ্কে আসীনা অনড় অনিন্দ্যসুন্দর রমণী তথা রঙমশালে দীপ্ত ফোয়ারাটিকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। ওপাশে কেয়ারি-করা নেটে ঢাকা আয়না নিম্নে মেঝেতে পশুর চামড়া। ওদিকে সোনার কাজ-করা দেরাজের উপরে ফুস্‌ফুস্ পরী-গতর ঘড়ি, ছোট ছোট ফ্রেমে ভারি মুখ, নানা ভঙ্গিমা, বড় ফ্রেমে পালঙ্কস্থিত রমণীর আলেখ্য। এই চিত্রদর্শনে করতার একরূপ বিকারগ্রস্ত, এবং তার ইচ্ছা হল ছবিটার উপরেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, কিন্তু কক্ষের আর আর সকল কিছু তাকে বড় ধাক্কা দিয়েছিল— এমত বাবুয়ানা ধাক্কায় প্রথমে, অথচ তার দুরন্ত অভিমান হয়নি একারণ যে তখন দেহেতেই সে মনগড়া ছোট হয়েছিল, উর্দ্দি ঢলঢলে হয়—ইদানীং মনেও যে সে ছোট হয়েছিল।

করতার কিছু স্ত্রীলোক দেখেছে। সে দেখেছে নিদারুণ পাইওরিয়া-ক্লিষ্ট কর্দ্দমাক্ত গলির দুই পাশে, কভু ক্যানেস্তারার উপর অথবা কাঠের টুলে আসীনা স্ত্রীলোকসকল—পুরাতন গালে ট্যাঙ্কের গুঁড়োর উপর লাল ছোপ দেওয়া যৌবন-চিহ্ন—মাত্র পেটিকোট পরা, বক্ষদ্বয় তুখড় যেহেতু হাফ্-আখড়াই কাঁচুলী কবজায়ে, কোমরে চাবির থোকা আর একদিকে জুট-সিল্কের বাহারী

রুমাল। এ-গলি 'আয় হায় আয় হায়—মেরী জান কাচ্ আল্লু' রবে মুখরিত। করতার বোদা চোখে চেয়ে দেখেছিল; ওপাশে পাঠান একজনা শ্লেষ্মাসিক্ত ন্যাকা ন্যাকা আবদারে আপনকার দাঁতে নখ খুঁটছিল; এক জাঠ নালমাখানো মুখব্যাদান করত হাস্যে সমস্ত স্থানটিকে নয়নসুখ আনারকলি করে তুলেছিল। এই মাংস-হিহি পরিবেশ যুবক করতারের উরুদ্বয়কে, হাল ধরাতে হাত যেমত কম্পিত হয়, সেইরূপ কম্পিত করে। রকের উপরে বিদ্যমান স্ত্রীলোকটির চোখে যেমন বা ডুগডুগী বাজছে, সে এক হাতের বুড়ো আঙুল চোষে অন্য হাতের রুমাল উড়িয়ে বলেছিল, 'আয়! মার কাটারি নয়না বাণ' এবং যুগপৎ আহামরি চটুলতার সহিত স্ত্রীলোকটি করতারের মুখে রুমাল বুলিয়ে দেয়; এতে করে করতার মিলনোন্মুখ ঘোটকের মতই লালসা-ঘন লম্পট রব করে উঠে 'আই ইক্ ইকিঃ কি' এবং চকিতেই ভাঙ্ড়া নাচের ঠমকযুক্ত এক লাফে রকে উঠেছিল, আরবার সে আরব্য-রজনীর হাবসীর মত বিকট ধ্বনি-হুঙ্কার দিয়েছিল।…এ সকল কথা আজও বর্তমানবৎ করতারের মনেও আছে এবং যেহেতু মনে আছে তাই সে এখন, এখানে, যদিও অন্ধকার, তথাপি অতিমাত্রায় চোর চোর, ফলে কোথায় যেন বা একটি যন্ত্রণাও অনুভব করলে।

করতার অন্ধকারে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনলে, সহসা মনে হল সে নিশ্বাস—বর্ত্তমান পালঙ্কে আসীনা আনারের অন্তরীক্ষের বাস্তবতাপ্রসূত। কিন্তু শুনলেও, সে কোনক্রমেই অগ্রসর হতে পারেনি, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের দীনতাবোধ তাকে নির্জ্জীব করে রেখেছিল; সে নিজের হাতখানি নাকের কাছ বরাবর আনলে হাতের লোমরাজি নিশ্বাসে বিভক্ত হয়। গলার ভিতরে এ সময় কে যেমন বা সদর্পে ঘোষণা করছিল, আমি বেঁচে আছি, আছি।

সে অধীর হয়েছিল, একবার বন্দুকে, একবার কব্জির চাকৃতিতে হাত দিল, অবশেষে পকেট থেকে ওয়াইল্ড য়ুডবাইনের প্যাকেটটা বার করল, একটি সিগারেট নিঃশঙ্কচিত্তে ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠোঁট থেকে সিগারেট সমেত হাত-খানি ভৌতিকভাবে উঠে গেল, এমত মনে হয় যেন বা গুলি লেগেছে, এবং হাতে কোন সাড়ও নেই, এরপরই নিজের মনের ভ্রম বুঝতে পারল, তবু সম্যক বুঝে নেবার কারণে সে সিগারেটে জোর টান দিয়ে হাতখানি দেখল। এবং তারপর ঘাড় কাত করে আবার একাগ্র হবার চেষ্টা করেছিল।

এতক্ষণ যাবৎ শুধুই সে দেখছে, তার যে সঠিক কি করা উচিত তা কোন সূত্রেই মনে হয়নি, কেবলমাত্র লড়াই-অভ্যস্ত দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখেছে, যথা—

অনেকটা রিভলবার বা বন্দুকে হাত রেখে অবিশ্বাসের চোখে। এখন সে জামার গলাটা কিঞ্চিৎ আলগা করে দিল, বড় বড় নখ দিয়ে গলাটা চুলকালে, পরক্ষণে অনেকটা মরিয়া হয়েই—কারণ যদি ভয় হয়, ভয়কে সে সাধারণত যেমন ভয় করে, ফলে মরিয়া হয়েই ত্বরিতে খাটের নিকটে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু কোন কিছুই হল না, অকারণে এই দেহটির প্রতি অতিমাত্রায় সমীহ এল, এমন কি কাছে পর্য্যন্ত দাঁড়াতে তার শরম হয়, কারণ, প্রথম কক্ষে প্রবেশ করে মেয়েটিকে দেখে শত্রু ভেবে অজস্র মুখ খারাপের জন্য, সহসা তাকে খোঁজ-তল্লাস করার জন্য, এবং আরও পরে রক্তের স্বাদে আপনার সংজ্ঞা ফিরে পাবার কথা ভাবার জন্য ; এককালে তার সারা অঙ্গ হ্রীং-শব্দ করে উঠল, মাথার উকুন-গুলো থর থর করে উঠেছিল। সে সজোরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলে।

নিজেকে যেটুকু বুঝবার প্রয়োজন ছিল তা সে বুঝে নিল, যে-নিশ্বাসের গভীরতা তাকে হাঁস-খেদান করে ; সূক্ষ্ম গাম্ভীর্য্য, যেমন বা সন্ধ্যার কালো দীঘি, তার মধ্যে অর্থাৎ বোধের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল— তথা আমার একটা পড়চা আছে। এতদ্ব্যতীত রমণীর দেহসৌষ্ঠব যে এত ভাল লাগতে পারে, তিলে তিলে ভাল লাগে সে জানত না ; বুটের নাল অনেক ক্ষয়েছে দূরত্ব অনেক বেড়েছে, তবু আশ্চর্য্য এই যে, কখন যে ভিতরটা অগোচরেই দুনিয়ার নিমক খেয়ে বসে আছে তাও সে জানত না। ফলে এখন সেই সাতবাসটে বেগুন ভাজার মত কালো গলিটার রুমালওয়ালী— যদিও স্পর্শমাত্রে দেশী আমস্বরূপ কুনুই অবধি যায় রস গড়ায়—সে যে রমণী নয় সেকথা বুঝেছিল। বুলেট না লাগলেও যে তার লাগে, দরদ হয়, বেহুঁস হয়ে যায় তা বোধ করি সে আন্দাজ করতে পেরেছে। এই অন্ধকারের মধ্যে করতারের আপনকার চক্ষুদ্বয় যেমত বা খোয়া গিয়েছিল, চক্ষু দুটি ফিরে পাবার জন্য এদিক-সেদিক খোঁজ করলে, ফিরে পেলে; একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

একটি দীর্ঘশ্বাসেই সে সিদ্ধ হয়, আর যে মিলিটারী উর্দ্দি থেকে সে যেমন বা বাহির হয়ে এসেছে— ছোলা যেমন মাটিতে কলটি, শিকড়টি, চালনা করত আপনি সোজা খানিক উপরে উঠে খোসা পরিত্যাগ করে, অনেকটা তেমনই ভয় আর নেই, সে বালকের লজ্জা নিয়ে ক্রমে শান্ত ভাবে অগ্রসর হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, টর্চ্চটা খুট করে উঠতেই, সে নিজেই কেমন যেন কেঁপে উঠে ম্রিয়মাণ, পুরুষ মানুষ হিসাবে অল্পবিস্তর মুষড়ে পড়ল, কেননা পুরাতন এক দৃশ্য তার মনে এল।

মনে এল যে, এক কোণে একটি স্তিমিত আলো, সে আর পাঠান মুবারক দরজার কাছে এসে স্তম্ভিত, মাঝখানে কি যেন বা ত্রাহি ত্রাহি করে। অন্যদিকে একটি শিশু হামাগুড়ি দিয়ে সহাস্যবদনে এদের দিকে আসছিল। পাঠানের দেহে কখনও কখনও আলো পড়ে, সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করেই বন্দুকের নলটাকে তড়পার মত ধরে কুঁদো আছড়ে মানুষের বদনাম বিরাট ব্যাঙসদৃশ জীবটিকে আঘাত করেছিল, নিম্নে ধরাশায়ী বালুচর। ব্যাঙতুল্য জীবটি আর কেউ নয়, যুদ্ধব্যবসায়ী ফেরেঙ্গ। পাঠানের মুখে মনুষ্যত্বের ঘাম এবং অনেক সম্বন্ধের কথা। তখনও ঠোঁট কেটে 'শাল্‌লে মরদকা বদনাম' এরূপ কথাগুলি বার হচ্ছিল।

এখন মেয়েটি কি তাকে, করতারকে, ঈশ্বরবিশ্বাসী মরদ বলে মেনে নিচ্ছে না? তাকেও কি তাহলে ব্যাঙসদৃশ ভাবছে? সঙ্গে সঙ্গে করতার আপত্তি-ধমক মিশ্রিত অদ্ভুত এক বাঁকাচোরা গলায় একলপ্ত সখেদ চীৎকার করে উঠল, হাত-বোমা ছোঁড়ার মত দাঁতে দাঁতে ঘষে সেদিকে চেয়ে গর্জ্জন করতে লাগল। এতক্ষণ বাদে অন্ধকার হাতড়ে, খাটের উপর একটা হাঁটু রেখে হাত দুটো চাদরের উপর রেখে শব্দের বন্যা বইয়ে দিল। তুমি কি ভেবেছ আমি সাধারণ ফৌজের মত বদমায়েস শয়তান দুশমন। যে ক্ষেত কখনও চষেনি, আঁধি কখনও দেখেনি, আকাশ যে জানে না। যে শিশুকে দেখেনি, কোলে করেনি, বাপ আদর করছে মা স্তন্যদানরত যে শোনেনি। গরুর হাম্বা-রব যার কখনও স্মরণ নেই, যে কখনও বাড়ির চিঠি পায়নি, ভিক্ষা কখনও দেয়নি, শবদাহে সঙ্গী হয়নি, বাদশাহের ভাঙা কিল্লায় যে খেলা করেনি, ইত্যাকার বহু বহু কথা যা তার রক্তে ছিল, ইদানীং যা তার গর্জ্জনে, আকুতির মধ্যে, ছায়াপাত করেছিল। অবশেষে করতারের আর্ত্ত ব্যাকুল স্বর শোনা গেল, 'কসম আমি মামুলি ফৌজের মত চোর চোট্টা বদমাসের দুশমন নই, আমি মরদের বদনামী নই, আমি, আমি সাচ্চা লোক···সাচ্চা···' বলতে বলতে অন্ধকারে তার গলা যেমত বা আটকে গেল। গুরুমুখী আড়ষ্ট হয়েছিল!

করতার গলাটা কোনক্রমে ভিজিয়ে পুনরায় কিছু বলবে বলে তৈরী হল, এবং বললে, 'আমি ফৌজ সত্যিই' বলেই চুপ। একারণে যে এ সময়ে মানোহরের কণ্ঠস্বর তার স্মরণে এল। সে বলত, আমি তো লোককে মারছি না, মুক্তি দিচ্ছি বলেই শোক মোহ পরিত্যাজ্য, তোমার শোক অপহৃত হল, তোমার মোহবন্ধন ছিন্ন হল, হে সাকাররূপী নিরাকার তুমি পুনর্ব্বার নিরাকার হলে; এবং কবীরের

দোহা গাইত, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ, কাকে ছাড়ব কাকে বন্দনা করব। আবার কখনও সে বলত আমি উপলক্ষ মাত্র। করতার এতটুকু চুপ করে থেকেই সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। একবার সে, আকাড়ে ত্যাওড় চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে পাগলের মতই ভাবল, খানিক চাঁদের আলো ছুঁড়ে দি। প্রস্তরবৎ চাহনি উজ্জীবিত হোক।

করতারের মনে হল, তার নিজের খোলা ছায়াটা মেয়েটির কোলের উপর কাঁপছে, মেয়েটি তাই কিছু স্পন্দিত। এতাবৎ করতার যে কি, তা বলা কত সহজ ছিল। কার্ডটা বার করে দিলেই হত, যে বিচার করবার সে ফোটোর দিকে চেয়ে তার মুখটা দেখে স্বীকার করে নিত। এখন, কতবার নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশকরত বুঝাবার চেষ্টা করেছে, শতবার আড়ষ্টকণ্ঠে ক্রমে ক্রমে বলেছে 'আমি অত্যন্ত ভাল লোক' আর জলের মত করে বুঝাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ আবার সে টর্চ্চটা ডান হাতের উপর ফেলল, সেখানে তার হাতে কিছু নেই, বাঁ হাতে উল্কিকরা ফুল। অসংখ্য রোমরাজির মধ্যে একটা গোলাপের বিকার, তবু তা ফুল। করতার ফুঁ দিয়ে, বারবার ফুঁ দিয়ে ফুলটিকে দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এমত সময়ে তার চোখ দীপ্ত হয়। এবং সে বলেছিল, 'দেখ আমি ভাল লোক আমার হাতে অন্য কোন উল্কি নেই। বলেই অন্যমনস্ক হয়, কারণ বহুদিন পুর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি ছিন্ন হাত দেখেছিল, যাতে উল্কি ছিল God is good। মানোহর অসহায়ভাবে কেঁদেছিল, তাকে তার অর্থ বলেছিল একবার তার মনে হতে পারত যে এই দাবীটা একটু বেশী বেশী, কিন্তু কিছুই মনে হল না। অন্যপক্ষে তার মনে হল যে, যেন মেয়েটি তার দিকে অন্য চোখে চেয়ে আছে। উল্কি থেকে মাথা তুলবার কালে একথা তার মনে হয় সুতরাং সে তড়িঘড়ি করতেই পায়ের ঠাসে বন্দুকটা ঢলে পড়তেই সে শশব্যস্তে বন্দুকটিকে কব্জা করে যখন প্রস্তুত হয়েছিল, তখন অবাক হয়ে দেখল, পাথরের সেই দৃষ্টি ফাঁকা স্বচ্ছ সার্সির কাঁচের মত, কিছু যেখানে লেখা নেই। টর্চ্চ নিভেছিল।

নিমেষেই তাই, তার চোয়াল নড়ে উঠল বুটের আঘাতে মনকে যেন খাড়া করে তুললে যে, নাঃ! এ-রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাধারণ ফৌজের মত ব্যবহার করাই ঠিক। একটা মেয়েছেলেকে শেষ করতে যাদের নুন লাগে না চিবিয়েই শেষ করে। কিন্তু মনে হতেই তার বাক্‌রোধ হল, অনন্তর ছোট ছোট কয়েকটি নিশ্বাস নিয়ে সে স্থির হয়। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারেও সে ওই দিকে মুখ ফেরাতে পারল

না। মনে হল তার বিরাট দেহ মেয়েটিকে আরও অন্ধকার করে রেখেছে। করতার ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবল, না এ-কক্ষ পরিত্যাগ করে সে নীচে চলে যাবে তাহলেই নিশ্চয়ই মেয়েটি বুঝবে যে সে ভাল।

কিন্তু দরজাটা করতার খুঁজে পেলে না, কেননা তার মনে হয়েছিল যে, যে তার এইটুকুতেই কি মনে হবে, অর্থাৎ যে, সে ভালো। সে কথাই বুঝাবার উদ্দেশ্যই শুধু কি ছিল? এ ছাড়াও আরও যে, তার একটি কথা ছিল, যে কথা বেচারী ফৌজ খানিক অন্ধকারে, কিছুটা ক্ষোভে, হারিয়ে ফেলেছিল। কপালে করাঘাতেও তা মনে পড়েনি— কি যে ভেবেছিল। কী যেন ভেবেছিল? মাঝে মাঝে লড়াইয়ের তীব্র শব্দ মন যেন চটকে দিয়েছে। মনের পিছনেও গুলির আওয়াজ, গাছপাতা নড়লেও গুলির আওয়াজের মত শোনায়, ফলে সে কিছুতেই নিজেকে পুঞ্জীভূত করেও মনে করতে সক্ষম হল না। এবং ইতঃপূর্ব্বে, 'যে সে ভদ্রলোক' একথা প্রমাণ করবার জন্য নীচেও সে যেতে পারল না ; কারণ বারম্বার তার মনে হচ্ছিল, যে, মেয়েটি নিশ্চয়ই ভেবেছে যে সে দুশমন। অতএব ভয়ে সে, মেয়েটি, পাথর।

এই অপমানচিন্তা তাকে বাঘের থাবার মত করে তুলেছিল, চকিতে সে নিজের রিভলবারটা নিয়ে খরপায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়েই, অল্প হাতড়ে, মেয়েটির হাতে আপনার খোলা রিভলবার গুঁজে দিল। ঠাণ্ডা সুন্দর হাতের মধ্যে অস্ত্রটি এক পলকের জন্যই ছিল, পরক্ষণেই খসে বিছানায় পড়ল, এবং সেই সঙ্গে প্রস্তর-প্রতিমাও স্পন্দিত হয়েছিল।

করতার সে কথা বুঝতে পারেনি কেননা অন্ধকার। সে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে, 'অগর আমায় যদি দুশমন বলে বোধ হয়, আমার উর্দ্দির রঙ ফিরিয়ে দাও, আমার রাত দিন এক হোক মাটিতে মিলিয়ে যাক...' ঈদৃশ কথার পর সে কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত, তার কণ্ঠস্বরে গুরুদোয়ারে শ্রুত গম্ভীর শব্দস্রোতের ন্যায়, তার কণ্ঠস্বরে একথাই প্রমাণিত হয় যে সে সত্যই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তে উল্লিখিত উল্কি দেখেছে যাতে লেখা 'ভগবানই সৎ', কেননা হর্ষ ও বিষাদে তার উক্তি মুহ্যমান ধূপের ধোঁয়ার মতই অতি শান্ত হবে, টৌড়ির রেখাব থেকে গান্ধারে উঠে। রমণী এখনও নিশ্চল।

করতার নিজের মুঠো দিয়ে গালে চাপ দিল, এখনও নিশ্চয়ই তার অজস্র কথা আছে, যা এইরূপ চাপে বাহির হয়ে আসবে। 'রাত দিন এক হোক' বাক্যের মধ্যে সে যেমন আকাশে মাথা ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিল, অন্ততপক্ষে তদ্রূপ তার

জামা কাপড় ভেদ করে ধূলা লেগেছিল, তীক্ষ্ণ অপমান এবং তৎসহ দুঃসহ ঘৃণায় তার রক্তমাংস উচ্ছিষ্ট। সে রাগে টলে গিয়েছিল, বিল-স্থিত রুষ্ট ভুজগের ন্যায় ক্রোধে আপনার চোয়ালের ঘর্ষণে নিজেকেই পিষে ফেলে, 'এ কি, এ কি জল কখনও খায়নি ? মাটিতে পা ফেলেনি ?' বলেছিল, কথাগুলি গুলির খোল পড়ার মত পট্ পট্ করে শব্দ করে উঠল।

এমত সময় তার আবেগ-প্রপাত ভেদ করে কতগুলি চেনা আওয়াজ এল, কিছু কথাবার্ত্তা কিছু বুটের আওয়াজ। করতারের হাঁটু দুটি বাচ্চা ছাগলের মত তৎপর হয়ে উঠল, মুহূর্ত্তের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র এমনকি বোমা চিক্ চিক্ দেখেছিল, এমনকি শিরস্ত্রাণে একবার হাত দেওয়ার সময়ও পেয়েছিল। ত্বরিতে সে দরজার কাছে দণ্ডায়মান, খস্খস্ শব্দ— যেমত দামী বস্ত্রের, রেশমের বুলবুল চশমের আন্দোলনে যে আওয়াজ উত্থিত হয়। করতারের একবার মনে হল পালঙ্কোপরি রমণী প্রসুপ্ত। কিন্তু উল্লাসের পূর্ব্বেই সে মেজেতে কান পেতেছিল এবং শুনল এ অন্য লোকের পদধ্বনি। রাগে তার ইচ্ছা হল মাটি-মেজেকেই কামড়ে দেয় ; যদি তারা দু-তিনজনা হয় তাহলে ? এবং অসহায়ভাবে পিছনের অন্ধকারের দিকে চাইল। মেয়েটিকে রক্ষা সে কেমন করে করবে ? কোনও গ্রামে হঠাৎ আক্রমণে কয়েকজন একটি মেয়ে পায়, একজনা গুলি করে মেয়েটিকে লাভ করেছিল, অন্যেরা যখন স্থান ত্যাগ করত দূরে যায় তখনই ফৌজটি সেই মৃত মেয়েটিকে কাঁধে করে, শোনা যায়, অগ্রসর হয়েছিল। কাঁধ থেকে সে কিছুতেই সে-দেহটি নামাতে চায়নি। একথা তার মনেও হয়েছিল। অনেকক্ষণ বাদে তার একথাও মনে হয়েছিল যে, যা সে বুটের আওয়াজ এবং কথাবার্ত্তা বলে ধরে নিয়েছিল তা কিছুই নয়।

এইটুকু তৎপরতায় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানে করতার সহজ হতে পারল ; আপনার ভিতরে অপমান ও ঘৃণার যে চাগাড় ছিল তা তিরোহিত হয় ; এবং ধোপধোয়া অহঙ্কার তাকে আচ্ছন্ন করে নাম নম্বর চাকৃতির বাহিরে অচিরেই এনে দিল, এখানে খোলা হাওয়া।

পরীর গল্প শোনার অবসন্নতা তাকে গম্ভীর করেছিল : লোকে যেমন অতীব যত্নে ঘৃত রাখে তেমনি যে-মনকে, যে-অনুভবকে, সে অত্যধিক আদরে যত্নে রেখেছিল, সহসা তার সন্ধান সে পেলে, যে আমি দোস্তির গোলাম ; এবং এ কথাও নিশ্চিতরূপে ভাবছিল যে তার তৎপরতায় মেয়েটি বুঝেছে যে সে দুশমন নয়। নূতন গর্ব্বে বেসামাল বুটের শব্দ সঠিকভাবে পড়তে শোনা গেল আর

শোনা গেল না। তদনন্তর রুদ্ধ নিশ্বাসকে সরল করে অতি সন্তর্পণে ফেলল— খাটের বাজুর কাছে যেখানে মেয়েটি বসেছিল সেখানে এসেই দাঁড়াল। অনেকটা ইতস্ততভার সহিত যে-হাতে উল্কিকৃত ফুল আছে সেই হাতখানি মেয়েটির মুখের কাছে নিয়ে এসেই স্থির।

মেয়েটির নিশ্বাস আসে ও যায়, সকালে নদীর উপরে হাওয়া যেমন; করতার বুঝল তার হাতটি গরম, এই ভাবুক নিশ্বাসের বহমান ধারায় সে যেন বা পালকের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সে বড় আশ্চর্য্য হয়েছিল। পান্থপাদপ নামে এক গাছ আছে মরুভূমিতে, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করে শুনে যতটা আশ্চর্য্য হয়েছিল তার থেকে ঢের বেশী হয়েছিল এ কারণে। এমত সময় হঠাৎ তার হাতের চাকৃতিটা লাগল মেয়েটির চিবুকে, সঙ্গে সঙ্গে করতারের হুঁস হল। নিমেষেই হাতটা সরিয়েই, বন্দুকটা অত্যন্ত অধৈর্য্যের সহিত রেখেই, আপনার দুই গালে চাপড় মারতে মারতে বলেছিল, 'তুমি আমার মোছ উখড়ে নাও—আমি যদি দুশমন হই···আমার বাপ মা আছে, আমি লাঙ্গল করি···ক্ষেত খামার করি'— বৎসহারা গাভীর স্বর তার কণ্ঠে বিদ্যমান।

একটি ছোট্ট স্মিতহাস্যের শব্দ শোনা গেল।

করতার ঝটিতি টর্চ্চ জ্বালালে; নূতন কিছু নেই। এখন শব্দ শোনা গেল। করতার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে ইঁদুর নিশ্চয়। অন্য সময় হলে, সে নিশ্চয়ই শপথ করত আমি ইঁদুর মেরে তবে পাগড়ী পরব। এখন সে সময় নষ্ট করবার মত তার মন নেই। করতার কি যেন মনস্থ করলে, পরক্ষণেই দেখা গেল ঘরে স্তিমিত আলো হল। তার পক্ষে আর সহ্য করা অসম্ভব, সে মৃত্যুকে ডাকল।

দূরে একটি চেয়ারের তলে বাতি জ্বলছে। আপনাকে প্রতীয়মান করার জন্যই সে বাতি জ্বেলেছিল। সে এক মুহূর্ত্তের জন্য মৃত্যু এবং সম্মুখে মেয়েটিকে দেখল, একবার ইচ্ছা হল যে মেয়েটির গায়ে ঝাঁকুনি দেয়, কিন্তু তবু নিজের বন্দুক আছে, গুলি আছে, পেটে খিদে আছে তবু কখনও নিজেকে এত অসহায় বলে বোধ হয়নি। সে যেমত নাবালক, তার বিরাট কপাট বক্ষ যেন আংটির মধ্য দিয়ে গলে যায়।

মোমের আলো তাকে সত্যিই স্পষ্ট করে, তামার মুদ্রায় যেমন মানুষের ছবি থাকে ততখানি। তা সত্বেও চোখ দুখানির মধ্যে মনুষ্যোচিত দীনভাব প্রকাশিত হয়েছিল। করতার নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে কি বলবার চেষ্টা করছিল

হয়ত বলা হয়েছে যে কোন ভয় নেই, আমি আছি। সে নিশ্চয়ই খানিক জোর পেয়েছিল এ-কথা ভেবে যে কুকুরের চোখ মানুষে বুঝে আর আমার ভাব কেন বুঝতে পারবে না! একথা ভেবে ফৌজ যেন জেদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কি যে করবে ভেবে পেলে না, হঠাৎ বিছানায় বসেই তার পা দুটি ধরে ফেললে এবং যেভাবে বিড়ালছানাকে আদর করে তেমনি করতে সে, করতার, প্রবৃত্ত হয়।

সম্মুখে মৃত্যু স্তব্ধতা।

করতার নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'আংলেস আংলেস।' বলেই সে দৌড়ে গিয়ে পা দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে ছুটে নীচে নেমে গেল।

সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় নামতে গিয়ে সে থেমে প্রস্তুতির একটা নিশ্বাস নিয়েছিল, একারণে যে কাছেপিঠের অসংখ্য আওয়াজে সামনের রাস্তা বিশেষ অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও তোতলা। অবশ্য এ রাস্তায় যদিও কোন শব্দ ছিল না, করতার আর সময় না নিয়ে এক দৌড়ে রাস্তা পার, কাঁটাতারের ছায়াগুলো কি ভয়ঙ্কর রাস্তা ধরে হাঁটা-চলা করে, এতদ্দৃষ্টে তার শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গন্তব্য পথের দিকে চাইল, না কুকুরের মত শুঁকতে লাগল তা ঠিক বুঝা গেল না।

পরিত্যক্ত অনাদৃত বাঁধান দাঁতের মতই ভাঙা বিধ্বস্ত সকল কিছুর চেহারা। করতার হাতের চাকতিটাকে একটা জলদি চুম্বন করলে, এবং আর সে দাঁড়াল না। একটা ভাঙা বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছাল।

'ওয়ে! ওয়ে!' ধ্বনিতে স্থানটা মুখর হয়ে উঠল।

করতারকে কে একজন ধরে সজোরে টান মেরে বসিয়ে দিলে, মেসিনগানের শব্দ খর খর করে চলেছে এবং তৎসহ অজস্র অভিশাপ, দাপট, ইংরাজি খিস্তি; প্রায় দশ বার সেকেণ্ড পর স্তব্ধ হল।

করতার কি যে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল তা ভুলে গেল, জিহ্বা অদ্ভুত ভাবে বার করে সে একবার স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, আবার মেসিনগানের শব্দ শুরু হয়েছে, করতারের মনটা কোনরূপেই ভিতরে যেতে পারছিল না কিন্তু ইতঃমধ্যে হঠাৎ তার ঠোঁট ফাঁকে বার হল 'ভালবাসি ইংরাজি কি…?'

ষাঁড়খোর ফলে উর্দ্দু জানা ইংরাজের কানে পীরিতের একথা বড় অদ্ভুত, সে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠে গোটা গোটা খিস্তি করতে লাগল, এই খিস্তির মধ্যেই এক সময় বলেছিল 'আই ল্যভ ইউ' বলেই পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগল।

করতারের ঠোঁট কথাটা পাবামাত্রই নড়তে লাগল। এই অন্ধকারে সে যেন বা মন্ত্র বলে চলেছে। এ-স্থানে আর যারা ছিল তারাও নানা গলায় কথাটা বলে উঠেছিল। অন্যদের ঠাওর করবার সময় না দিয়ে করতার নিজেকে হাঁসিল করে নিয়ে আবার রাস্তায়।

অজস্র জখম হওয়া দেওয়ালের মধ্যে কথাটা সে যেমত বা বুকে করে নিয়ে আছে, খুস খুস করে গুলির আঘাতে বালি খসে ; ঈগলচোখে চতুর্দ্দিকে সে লক্ষ্য করে আর অনবরত নূতন পাওয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ; কারণ রাস্তার যুদ্ধে কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না, কখন যে কে কোথায় আছে তা বুঝে উঠাই যায় না। তবু করতার সাহস করে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল।

যখন সে বাড়ির দরজার প্রায় কাছে, তখন সাঁ সাঁ শব্দে গুলি উড়তে লাগল, এরূপক্ষেত্রে তাদের যেমন মনে হয়,তেমনি তারও মনে হয়েছিল যে তার দেহের কোথাও না কোথাও গুলি লেগেছে, আর, যে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। করতার রাগে ভুলও করলে, সে ত্বরিতে দরজার পাশে গিয়েই,প্রতি-উত্তর দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ-সময়ে মুখে কিন্তু সেই কথা কটি তীব্রভাবে ছিল। দু'পক্ষই চুপ, কোন সাড়াশব্দ নাই। করতার পিছন ফিরে অন্ধকারটা ভাল করে চিনে নিল, জোরে নিশ্বাস নিয়ে শবগন্ধটা আঘ্রাণ করে আশ্বস্তবোধ ও স্বচ্ছন্দ অনুভব করলে। এখন যতই গুলিবর্ষণ হোক্ কোন খেদ নেই, কেননা সে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেই।

কখন যে সে দোতলায় উঠে এসেছে তা সে জানে না। একবার সব কিছু যেন শুঁকে নিল পরক্ষণেই দরজাটা খুলে সেই দীর্ঘ সুরক্ষিত অন্ধকারের সামনে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে গভীর করে গুরুমুখী ঠোঁটে ইংরাজি বলতে লাগল, 'আই ল্যভ ইউ' এবং সে নিজের কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনেছিল। একই কথা বার বার বলতে ফৌজ করতারের শরীর পরীর গল্প শ্রবণে অবসন্নতার বদলে মনুষ্যোচিত দিব্য অহঙ্কারে ভরে গিয়েছিল। সে আর স্থির থাকতে পারল না, আবেগে দ্রুতপদে খাটে গিয়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসেই বললে, 'আই ল্যভ ইউ'। তার আশা ছিল যে, এবার বোধ হয় সমস্ত কিছু মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। সে হাতড়াতে হাতড়াতে বুটশুদ্ধ উঠিয়ে আর একটু এগিয়ে যেতেই খাটের বাজুর সঙ্গে মুখ-খানির অসম্ভব জোরে ধাক্কা লাগল। পড়ে যাওয়া শিশি থেকে যেরূপ হাওয়া ঠেলে তরল পদার্থ পড়ে তেমনি শব্দ করে 'ভালবাসি' কথাটা বীভৎসভাবে উচ্চারিত হল। করতার কয়েক মুহূর্ত্ত তেমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সুদীর্ঘ চক্ষুদ্বয়

আকর্ণবিস্তৃত হয়েছিল। আখ সকল কেটে নেওয়ার পর যেমন ক্ষেত ফাঁকা হয় তেমনি ফাঁকা—অনেকটা আকাশ দৃশ্যমান। খাটে সে রমণী নেই।

এক লাফে উঠেই নিঃসঙ্কোচে টর্চ্চটা জ্বালিয়ে খাটের তলা দেখলে, এখানে সেখানে অকারণে আলো ফেলল, এর পর রাগে টর্চ্চটাকে ধরে বিছানার উপর আছড়ে দিয়েছিল, টর্চ্চটা পড়ে দু-একবার গড়িয়ে স্থির। কী যে তার করা উচিত তা সে ভেবেই পেলে না, বোকার মত তখন সে কথা বলে চলেছে, কখন থেমেছে; সে পাশের দেরাজে মহা আক্রোশে একটা লাথি মারল, এ-সময়ও তার মুখে সেই একই বচন ছিল। তারপর অন্যান্য ভাঙা ঘর, খালি ঘর, সে রুষ্ট মহিষের মত উর্দ্ধশ্বাসে খুঁজে বেড়ালে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে এল।

বাড়ির এদিকে সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তা, সে-পথ ধরে খানিকটা এসেই সে থমকে দাঁড়াল কেননা, নীচে, ভিজে নদীর তীরভূমি। চৈতী হাওয়ার মত বড় আলো ছোঁ মেরে চলে যায়, এবং ক্রমাগত লড়াইয়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়, নদী-বক্ষে ভাসমান শবদেহ। কারতার কামানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করলে, 'আই ল্যভ ইউ'। এহেন যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ দম্ভভরে কেউই এ কথাটা আজ পর্য্যন্ত বলেনি, এবং হঠাৎ সে পা পিছলে নীচে পড়ে গেল, হাতের কাদা দেখতে দেখতে ক্ষোভে আড়ষ্টস্বরে সে ক্রমে ক্রমে বলেছিল যে 'আই ল্যভ ইউ'; হঠাৎ অপমানে সে জর্জ্জরিত হয়েছিল। কোনমতে উঠে লটপট করতে পুনর্ব্বার সে এই বাড়িতে ফিরে এল। সম্ভবত মনে হয়েছিল, ঘরগুলো ভাল করে দেখা হয় নি। মেয়েটি হয়ত সেখানেই আছে।

আর যে সে নীচে এসে দাঁড়াল, সেই শবগন্ধ গৃহই বটে। উপরে গিয়ে সন্ধ্যার আলো যেমত এখানে সেখানে, বেচারী টর্চ্চ জ্বেলে ও হাত দিয়ে ফৌজ-ই বুদ্ধিতে খুঁজলে!

এ ঘর সেই ঘর, দাঁতে দাঁতে তার রাগ শাণিত হয়ে উঠছিল। বদরাগী নাম নম্বরওয়ালা ফৌজকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। হাতের বন্দুক উঠে এল, খুট করে শব্দ হল, এবং দেওয়ালে মেয়েটির আলেখ্য ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গুলির শব্দ যেমত শোনা গিয়েছিল তেমনই এও সত্য যে 'আই ল্যভ ইউ' কথায়, দিক সকল, যুদ্ধক্ষেত্র, এই প্রথম মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

কৃত্তিবাস, ১৩৬৭ শ্রাবণ

নিম অন্নপূর্ণা

যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখীটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারীকে সর্ব্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভারী আনন্দ হয়েছে— সে খুশি, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে হাত নামায়, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেয়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে ; তখন সে, যূথী, সখেদ একটি 'আরে' বলে, পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বের সঙ্গে, ফ্রকটি আপনার কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে।

সম্মুখের টিয়া কেমন ঘাড় বাঁকায়, সম্মুখের টিয়া কেমন পক্ষবিস্তার করে— কেমনে পক্ষবিস্তার করত লাল ঠোঁটদ্বারা কি যেন বা পাখাতেই খোঁজে, এ সবই তার নজরে পড়েছিল। কখনও বা টিয়াপাখীটি তেতো বিরক্তির সঙ্গে এক পাহাড় ছোলা থেকে শুধুমাত্র একটি তুলে ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটি মাটিতে পড়ে, যূথী তা লক্ষ্য করেছিল এবং সে, তখনই, একটি ঢোক গিলে আর আর দিকে দেখে-ছিল। এবার, আবার তার সামনে, সবুজ পাখী সাদা দেওয়াল, অতি মনোহর এক দৃশ্য রচিত হয়েছে— তবুও যূথীর চক্ষুদ্বয় দুর্ব্বৃত্ত এবং সে মরিয়া হয়েই, কোনক্রমে, পাখীর বাটিতে আঘাত করে, ফলে দাঁড়টিতে দোলা লাগল, আর সেই সঙ্গেই দুচারটি ছোলাও ছিটকে পড়েছিল, সত্বর তৎপর ছোলাগুলি তুলতে গিয়ে ফ্রকটি তার খুলে যায়, ছোলাগুলি তুলে মুখে পুরেই তবে সে ফ্রকটি ঠিক করে ; এখন, সে দাঁড়ের কাছে এল, এক হাত দ্বারা অন্য হাতের কাঁধের কাছের জামার অংশটি ধরে, ডান হাতখানি জামায় মুছে মুছে আপনাকে প্রস্তুত করছিল, বোধহয় হাতে ঘাম জমেছিল, একথা প্রকাশ থাকে যে জামার একদা রঙীন অধুনা ম্লান ফুলগুলি মুচড়ে মুষড়ে গিয়েছিল। আর পাখীটি ভারী অস্থির, পাখীটি ভারী তেরছা, নিজের দেহেতেই যেন বড় বেশী করে জোট পাকিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে পাখীটি একবারও আওয়াজ করেনি।

এসময়, যূথী একটু ভাবুক হয়েছিল, অন্যমনস্ক হয়েছিল, ভেবেছিল। ভেবেছিল —সে যদি পাখী হত— কেননা সে শুনেছে কোন কোন ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে, হাতে এক চ্যাংয়ারী খাবার, তাতে জিলিপী আছেই কচুরী নিমকি আর আর কি সব আছে, ময়রা 'চিলো চিলো' বলে চীৎকার করে, এবং তার ঘটিয়াল ভুঁড়িখানি নসরপসর, আকাশ চিলে চিলময়— আকাশটা যেমত বা গাড়ীর আড্ডা— ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত চিলগুলো চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে ওঠে; তদনন্তর খাবারগুলি সে, ময়রা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'আমরা বাসি খাবার বেচি না, কাউকে দিইও না'; এখানে অনেক ভিখারীর ছেলেরা দাঁড়িয়ে, কেউ মার কোলে, সকালের সৌখীন রোদ এদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ইতস্তত, এরা যেমন বা আচারের শিশি থেকে বার হয়ে এসেছে, তারা ময়রার মহানুভবতা দেখে, হাতখানি প্রসারিত করে চিলের খাওয়া দেখে!— এই সূত্রে যূথীর, 'ভিখারী' কথাটা মনে পড়তেই, মুখখানি সিঁটিয়ে উঠেছিল, কেননা সে শুনেছে অনেক পাপ, সাতজন্ম পাপ করলেই ভিখারী হয়; ছেলেমানুষ যূথী একথা স্মরণেই ছোট একটা নমস্কারও করেছিল, অর্থ এই যে, তার অতি বড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। নমস্কার যেমন সে করেছিল, তেমন সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চিলকে দেখলে তার বড় ভয়, সে চিল হতে চায় না, কেননা চিল যদি হয়, তাহলে হয়ত চিলই তার ভয়ঙ্কর ঠোঁট দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এইটুকু ভাববার পর, সে আর বেশী সময় নেয়নি, একারণে যে বেশী দেরী করলে, এ বাড়ির লোক— নিশ্চয়ই এসে পড়বে।—

ইদানীং পাখীটি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত, তার ঠিক কিছু নীচে যূথীর জ্বলজ্বলে মুখখানি, ছেঁড়া লাল পাড় দিয়ে বেড়া-বেণী করা, চোখদুটি পিঙ্গল, এলেবেলে, হিঙ্গুল, মারাত্মক; মুখের ছোলাগুলি একান্তে ঠেলে দিয়ে, মাথাটা তার কি যেন লক্ষ্য করবার জন্য আনচান করছিল, পরক্ষণেই সে হাতটা তিন তিনবার কপালে আর বুকে ঠুকেই ধাঁ করে দাঁড়টায় যেই না ঠেলা দিতে গেল, পাখীটা তৎক্ষণাৎ তার লাল ঠোঁট দিয়ে যূথীর আঙুলে কামড়ে ধরেছে।

ছেলেমানুষ যূথীর চীৎকারে এই বাড়িখানি যেন বা 'শ্রীমধুসূদন' বলে উঠেছিল। পাখীটা এখনও যূথীর আঙুল ছাড়েনি, দাঁড় নড়ছে, এবং কয়েকটি ছোলা যূথীর মাথা এবং গা বেয়ে ঝরে পরে। কোনক্রমে, ভাগ্যক্রমে সে আপনার হাতখানি ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল।

যূথী বোকার মতই আঙুলটির দিকে চেয়েছিল, কেননা, আঙুল বেয়ে খরধার

রক্ত পড়ে, আর যে কোন কিছু করার মত দক্ষতা তার নেই। এবাড়ির বৌটি বয়সে নবীনা, সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল, ব্লাউজটি পরা, সবেমাত্র সায়াটি পরে পরনের ভিজে গামছাখানি একহাতে খানিক টেনে যখন বার করছে তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ চীৎকার তাকে বিদ্রাবিত করে, এবং পরক্ষণেই এই আতঙ্ককারী দৃশ্যে সে বক্ষোহীনা স্পন্দন-রহিত ; ফলে সায়া থেকে উঠা লাল গামছাখানি তার হাতে তেমনি সম্বদ্ধ ছিল, সুন্দর খঞ্জন নয়নযুগল— স্ফীত, স্বপ্নহীন, ভীত, শক্ত, উজ্জল, রগছোঁয়া, ভ্রূদ্বয়ে বিদ্যুৎ ইঙ্গিত, দেহ বয়সোচিত ধর্ম্মে উষ্ণ, এখন, এতদ্দর্শনে আগুনগরম সুতরাং আপনার আলুলায়িত কেশরাশি— যা সিক্ত— তার ঘাড়ে সপ্‌সপে হিম সঞ্চার করে, তাই তার রোমহর্ষ হয়। এবং এ তরুণ মুখখানি কক্ষের আঁধার থেকে সকালের তীব্র আলোয় ক্ষণেকের জন্য এসেই পুনশ্চ কক্ষে ফিরে যায়।

সুধীর পালাবার কোনই পথ ছিল না। ভয়ে, বিশেষত যন্ত্রণায় এবং কিয়ং পরিমাণে লজ্জায় তার আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয় জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্ত্তী শূন্যতায় আটকে জমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গী সহকারে তা খুলে আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় ডান হাতের আঙুলটি চেপে ধরবার উচিতবুদ্ধি তার হয়েছিল, এতে করে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য্য যে, মাত্র এক পাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চীৎকার করেছিল! এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্ত্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।

দ্বিতীয় চীৎকারে এবাড়ির বিধবা গিন্নী খেতু মিত্তিরের মা ছুটে আসবার চেষ্টা করেছিলেন, কেননা তাঁর ভিজে কাপড়— ভিজে কাপড়েই তাঁকে অনেক শুদ্ধ কাজ করতে হয়—মুখে তাঁর, এ সময়োচিত অষ্টোত্তর শত নাম—'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বর' পদে এসে থেমেই, 'কি হল কি হল' বাক্য, ভিজে কাপড়ে এখনও কিছু ব্যস্ততার শব্দ ছিল, এ কারণে যে সম্মুখবর্ত্তী এ-দৃশ্যে কিরূপ ভঙ্গী যে করা উচিত তা ভাববার মত তাঁর অবকাশ ছিল না, হয় তিনি বেশী করে আলো অথবা বেশী করে ঝাপসা কিছু দেখেছিলেন। তাঁর দেহটি কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবশে সম্মুখে এবং শুচিবায়ুতার জন্য পিছনে দুলে গিয়েছিল, আর মুখে বারম্বার একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল, 'ওমা কি সব্বনাশ গো, কি সব্বনাশ!' তাঁর স্বরের মধ্যে যথাযথ অসহায়তা ছিল। ইতঃমধ্যে নবীনা বৌটি কোনক্রমে

এখানে এসেছিল, তখনও বাঁ হাতে সায়াটি আঁট করে ধরা, এবারে ঝটিতি গিঁট বেঁধেই যখন সে যূথীকে সাহায্য করতে যাবে তৎক্ষণাৎ থমকে গেল।

কেননা, খেতুর মা আপনার গায় গতর খেলিয়ে বলেছিলেন, 'বলি হ্যাঁগা, তুমি কি পাগল নাকি! বললে বড় অন্যায় হয়, সাধে কি তোমার ভাগাড়ে কোল…বলি চান করেছ না, ওকে ছুঁলে আবার কাপড় জুটবে…?' ইত্যাকার বাক্যে বুঝা গেল খেতু মিত্তিরের মা খানিক নিশ্চিন্ত খানিক সম্ব্রে উঠতে পেরেছিলেন, এবং আপন পুত্রবধূকে নিবারণ করে এবার যূথীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'নে নে চোষ না হারামজাদী আঙুলটা, মরণ! হ্যাঁরা কাটল কি করে?'

যূথী চুপ, হয়ত তার মনে পড়েছিল যে, পাখীটা কথা বলতে পারে, ফলে আরও ভীত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল; নবীনা বৌটি রক্তদর্শনে মুখখানিকে ঠেলে বাঁধা পুঁটুলির মত করেছিল, অজস্র চুলকে ঘাড় থেকে একটু হাটাবার জন্য মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'পাখী।'

'পাখী! সাত সকালে কি অলুক্ষুণে কাণ্ডরে বাবা' বলে খেতুর মা সাক্ষী-মানা কণ্ঠে বললেন, 'পাখী, আমার পাখীর ত অমন স্বভাব নয়' এবং পাছে দোষ পড়ে —একথা নিশ্চয়ই স্মরণ করত পুনরায় বলেছিলেন, 'তুই সাত সকালে মরতে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিলি কেন?…নে চোষ না আঙুলটা পোড়ারমুখী, আবার ধ্যানাপানা…নাও বৌমা, টক্ করে একটু চুন এনে দাও…'

বৌটি সত্বর চুন আনতে গেল।— যূথী, এখনও বুদ্ধিভ্রংশ খেতুর মার কথায় খানিক হাঁ করে রক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুরবে কিনা ভাবতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ— এতাবৎ আপনার মুখে সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলি, যা সে মুখে পুরেই চিবোয় নি, একারণে যে চিবোলেই ত শেষ, তাই অতি কৃপণের মতই মুখের একান্তে রেখেছিল এবং এখন হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, না মুখটা আঙুলের কাছেই নিয়ে যাবে এই বিষম দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার হয়েছিল— হঠাৎ ঠিক এই মুহূর্ত্তে তার মুখনিঃসৃত ছোলা কটি পড়ে, গড়িয়ে, খেতুর মার জল-সাদা হাজাদষ্ট পায়ের নিকটে লেগেছিল। বেচারী যূথী! উপরন্তু বেচারী যূথীর মুখ থেকে অল্প লালা তার নিজের হাতেই পড়েছিল এবং সে কম্পমানা!

অন্যপক্ষে, ছোলা পড়তেই, খেতুর মা ঝটিতি দু-একপা সরে এসেছিলেন, মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি যূথীকে দেখে, রাগে রোষে আক্রোশে তাঁর গাত্রবস্ত্র যেমত বা শুরু হয়েছিল; কি বলে যে গঞ্জনা শুরু করবেন তা সঠিকভাবে তাঁর ঠোঁটে গুছিয়ে নিতে পারছিলেন না, সহসা আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল, 'ওমা

মেয়ের কি নোলা গো!···কোথা যাব গো···' এসময় আপনার গণ্ডস্থলে তর্জ্জনী ছিল, এর পরই দাঁতে দাঁতে ঘষে বলতে লাগলেন, 'বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, এবার নিজের রক্ত পেট ভরে খাও···'

যে যূথী এতক্ষণ কাঁদেনি, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার দরুন চীৎকার করে কেঁদে উঠল, তথাপি চোখ দুটি ভারী সজাগ ছিল, খেতুর মা আপনকার গা গতর ভিজে কাপড়ে ঘর্ষণ করত বললেন, 'একাঃ চড়ে তো···দাঁত কপাটি ভেঙে দেব, আবার কাঁদনা হচ্ছে, ছ্যাচড়া আকটে ভিকিরীর মরণ! পাখীটা তোর টুঁটি ছিঁড়লে আমি হরিনুট দিতুম···হারামজাদী, ছোলাচুরি! ফের যদি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবি ত ঝেঁটিয়ে তোর খাল খেঁচে নেব···তাই বলি আমার পাখী কেষ্ট নাম ভেন্ন যে জানে না, সে কেন কামড়াবে ···উঃ তোর বাপ মা কি কিছু গেতে দেয় না ···চোষ না রক্তটা!'

এমন সময় বৌটি একটি গোটা পানে খানিক চুন নিয়ে এসে দাঁড়াতেই, খেতুর মা সত্যিই ক্ষিপ্ত তিরিক্ষি হয়ে উঠে ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, বললেন, 'খুব যে দরদ দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলে' বলেই, পরেই, হঠাৎ চুনসমেত পানটির দিকে নজর পড়তেই গায়ে যেন বিছুটি লাগল, খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কি কোন আক্কেল নেই গা, বলি এই বাজারে একটা গোটা পান নষ্ট করলে, বলি···আকালের কথা কি তোমার অজানা···না···'

বৌটি তটস্থ, থ, জড়সড়, চকিতেই মেঝেতে পানটি রেখে দিলে, না পানটি হাত থেকে খসে মেজেতে পড়েছিল, তা বুঝা গেল না। রক্তের অজস্র ফোঁটার মধ্যে পানটি লক্ষ্য করেই খেতুর মা যূথীকে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললেন, 'তোল বলছি, হাঁ করে রইলি যে হারামজাদী!'

এবম্প্রকার বাক্যে বেচারী যূথীর প্রকৃতপক্ষে কি যে করা শোভনীয় তা সে নিজেই কিনারা করতে পারছিল না, সে একবার মেজের দিকে অন্যবার খেতুর মার দিকে আড়ে আড়ে চেয়েছিল। খেতুর মা এইটুকু বিলম্বেই অস্থির। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সকালের আলোকে বাঁকা চোখে দেখেন এবং নিমেষেই পান তাঁর নিজের হাতে তুলে, একবারমাত্র চুনসমেত পানটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই একথা ভেবেছিলেন যে তাঁকে এ কাজের পর আর একবার স্নান করতে হবে, ভেবে পরক্ষণেই যূথীর বেড়া-বেণীটা হেঁচকাটানে নামিয়ে বেশ জবর মুঠো করে ধরার পরে পানটা তার কাছে এগিয়ে দিতে— সে, যূথী, অতি সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের আঙুলের উপর চেপে ধরেছিল এবং যুগপৎ আপনার দাঁত দ্বারা

কাঁধের জামাটা কিঞ্চিৎ টান দিয়েছিল!

খেতুর মার ক্রোধ-উন্মত্ত বেণী আকর্ষণে যূথী বড় নিশ্চিন্ত হয়; ঝাঁটা লাথি—এ সবে তার যেমন বা সকল কিছু বোধগম্য পরিষ্কার লাগে, সুতরাং এই সে চেয়েছিল, যেহেতু সে কোনমতেই দুই চোখে দুইদিকে দু'ভাবে আর দেখতে পাচ্ছিল না; এ ছাড়া এত আলো থেকেও সব কিছুতেই যেমন বা সন্ধ্যা, তাই যূথী ইত্যাকার নির্ম্মম ব্যবহারেও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল; এখন খেতুর মার সঙ্গে পা মিলিয়ে অক্লেশে চলতে পারবে। খেতুর মা আর কাল বিলম্ব না করে তার চুলের মুঠি ধরে এক টান মেরেছিলেন!

খেতুর মা তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পাখীটার পাশ দিয়েই তাঁদের যেতে হয়, ফলে, এ সময়ে যূথী খেতুর মার কাছে ঘেঁষে এসেছিল, এবং চোরা গোপ্তা চাহনিতে পাখীটার প্রতি সে দেখে, পিতলের চকচকে দাঁড়ের উপরে নিশিত তীব্র সাংঘাতিক রুক্ষ পা দুটি, আর তার ঠিক উপরেই পাখীর সুডোল উদর দেখা যায়,—শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন হয়ত সবুজ কিম্বা পাণ্ডুর, কি নরম কি তুলতুলে! সুওদর সুউমার—শুকউদর সুকুমার তথা কোমলতা, এরূপ যে প্রবচন, সেইটুকু প্রত্যক্ষের, দেখার মানসে মানুষ কি টিয়াপাখী পোষে!

যূথী আপনাকে নির্ব্বিকারভাবে, খেতুর মার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নিয়ে, রাস্তায় নেমে, এই পরিপ্রেক্ষিতহীন লাল গলিতে নেমেই, দুবার চিক্‌চিক্ করে থুতু ফেলে—মাথার কাপড়ে হাত দেবার কথা তাঁর মনেই হয়নি, একারণে যে গলি সুনসান্—যূথীদের বাড়ির দরজার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। এবং দরজায় লাথি মারতেই, দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল, এটা তিনি, খেতুর মা, আশা করেন নি, ফলে দোমনা হয়ে ছেলেমানুষের মত অহেতুক সন্ধি টেনেছিলেন।

দরজা খোলার পর, ভিতরের ঝাপসা অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল, প্রীতিলতা।

প্রীতিলতা দেওয়ালে একটি পা ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান, হাতের আলগা মুঠোয় একগাদা, একথোকা চুল, যা অবহেলায় অনিয়মে মেহেদীপিঙ্গল, তবু সেখানে অন্ধকার; সে জননী, তথাপি এ খেলা তার ভাল লাগে, অজস্র চুলে চুলে পাচনতুল্য গন্ধ, এ-হেন গন্ধে আপনাকে বড় পুরাতন বলে বোধ হয়, গায়ে ত্মাপথলির আর তোরঙ্গের মরিচার গন্ধে—মিলেমিশে—দিনগুলিকে যেমন বা সুদীর্ঘ করে,

আর যে, তাকে, প্রীতিলতাকে, অযথাই, মন্দভাগ্যক্রমে, নিশ্চিহ্ন করেছে ; বস্তুত সে নিজেকে খুঁজে না পেলেও, আপনাকে বুঝে না পেলেও অদ্য সে নিশ্বাস নেয়, আজও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ভেবেছে হায় আমার থেকে আমার ছায়া সুখী। সে চোখ ছোট করে দিনমান দেখে, সে চোখ সুতীক্ষ্ণ করত অন্ধকার দেখে।

খেতু মিত্তিরের মা প্রীতিলতাকে দেখে থমকে ছিলেন, তারপর নিজের বেণী-ধৃতমুষ্টি দেখেই যেন বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ফিরে পেলেন, এবং অন্যহাতে ভিজে কাপড়ের খানিক দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় আবৃত ছিল, এখন কথা বলার সময় মুখের কাপড় কিয়ৎপরিমাণে সরানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এই নাও বামুনের মেয়ে...' এই 'নাও' বাক্যের মধ্যে সত্যনিষ্ঠার গরব ছিল।

প্রীতিলতা, অল্প আয়েসেই মুখখানি বাঁকিয়ে তাদের দেখেছিল—ভাতে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে চাষা যেমত লাফ দিয়ে উঠে—তেমন তেমন লাফ, তেমনি যেমন বা তার ভিতরে দিয়ে উঠল, কিন্তু দেহে কোন সাড় দেখা গেল না, কেবলমাত্র হস্তধৃত চুলসমূহ, এ দৃশ্য দেখেই, সে চকিতে মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, খেতুর মা যূথীর বেণীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, 'তোমার মেয়ে কি বলব বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকাল লোকে শুনলে বলবে খেতু মিত্তিরের মা কি লোক গা...ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একে-বারে ভিকিরীর অদম গা...পাখীর ছোলা চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড বাধালে ...মুখ থেকে না পড়লে কি আমিই টের পেতুম...' এইটুকু বলেই খেতুর মা চারিদিকে চেয়েছিলেন, এ কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে বারান্দায় কেউ নেই ; আর যে—তিনি একাই বকে মরছেন, খেতুর মা আশা করেছিলেন এইটুকু বলতেই যূথীর মা যূথীকে আর আস্ত রাখবে না, কিন্তু কই ? ফলে তাঁর বড় অসম্ভব রাগ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং দৃঢ় হল, বলেছিলেন, 'বলি, তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যে বলেচি...সৎশাসনে না রাখলে মেয়ে কালে...বাতাসী ছেনতাল হবে, ঝরঝরে হবে পরকালে...'

প্রীতিলতা, আশ্চর্য্য, মনোযোগসহকারে সকল কথাই শুনছিল, যেহেতু খেতুর মার গলায়, কথার টানের মধ্যে, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার ধাঁচ ছিল, মিল ছিল ; বিশেষত যেখানে আছে, 'বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে।' যেখানে, 'গৃহলক্ষ্মী-রূপে তুমি সকলের ঘরে। দীনজনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে ॥' সে, প্রীতিলতা, যেমত বা করযোড়ে যূথী-সংবাদ শুনছিল, কিন্তু তা হলেও এ কথা সত্য যে, 'ভিকিরী' কথা তাকে রক্তের প্রাচুর্য্য দিয়েছিল—চুরির কথাটা এ তুলনায়

মাটির—আচম্বিতে প্রীতিলতার স্বল্পতোয়াসদৃশ দেহখানি রুষ্ট সাপের মতই আলোড়িত হয়ে উঠে, আপনকার বরফ-দেওয়া চোখের দৃষ্টিকে, অমোঘভাবে ছোরা যেমন করে হাতে ধরে, তেমনি—সেইভাবে উদ্যত করে ধরেছিল। খেতুর মা কথা শেষ না করেই যেই তুড়ি দেওয়ার শব্দের মত তাচ্ছিল্যভরে 'হ্যা' আওয়াজ করেছেন, তদ্দণ্ডেই প্রীতিলতা 'ই:' ধ্বনি করে উঠে, আর ঠিক এ-হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গী-বিমান উড়ে গিয়েছিল। এখানকার সকলেই, এ বারান্দা প্রায়-ঢাকা-পাঁচিলের ওপরে, উপরে যে আকাশ, সেদিকে চাইল। তথাপি, প্রীতিলতা নিজেকে এখন, ইতঃমধ্যেই শাণ দেবার অবকাশ পেয়েছিল, সে মুখখানিতে ঈদৃশ ভঙ্গী করে যে যেমন মনে হয় সে কিছু খাচ্ছে অথবা তার জিহ্বা আঠায় জড়িয়ে গিয়েছে, এরপরই সে বিড়ালের মত ফ্যাস্ করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না-না?' একবার নিজস্ব ভাষাটা অনুধাবন করেই পুনর্ব্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না…' এই সঙ্গে অঢেল শোনা ইংরাজী বলার জন্য—অবশ্য এ সকল শব্দ বাক্য নয়, গ্যাট ম্যাট হুট ফাট জাতীয় ইংরাজিআত্মক—তার জিহ্বা যারপর-নাই কড়কে উঠল।

প্রীতিলতার ঘোর বাক্যস্রোতে খেতুর মার মুখাবৃত কাপড়ের অংশ ঝরে পড়ল, কোন দিকে যে অজস্র আলো তথা কোন দিকে যে দরজা তা বেচারী খেতুর মা, বুড়োমানুষ, ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না, অবশ্য অবশেষে তিনি অদৃশ্য হন। প্রীতিলতার কাছে খেতুর মার এই চিত্তভ্রমবশত হাঁকপাঁক বড় মজার মনে হয়েছিল এবং বেচারী এই প্রসঙ্গে হাসতে গিয়ে আপনকার বিবর্ণ, আর্ত্ত বেদনাময় মুখখানিকে যন্ত্রণা দিয়েছিল! তবু সে কাতর নয়, সে হেসেছিল; তার শতচ্ছিন্ন কাপড়ের আঁচল তুলতে গিয়ে মাকড়সার পায়ের দক্ষতায় তার আঙুলগুলি পুনরায় চুলগুলিকে সংগ্রহ করে, এবং সে, প্রীতিলতা আপনকার অজস্র চুলের অঞ্জলিবদ্ধ অন্ধকারে মুখমণ্ডল ন্যস্ত করত বর-দেখা হাসি হাসল!

যূথী নিজের ব্যথাটাকে বড় করবার চেষ্টা করে তার মাকে হাতখানি দেখাচ্ছিল, তবু চুলের আঁধার এবং তার উপর ঘোরদর্শন রাত্রে বিদ্যুৎরেখাতুল্য হাসি, তাকে, যূথীকে, অনেকের কথা স্মরণ করিয়েছিল, যথা বাবা কোথায়, যথা লতি কই? নিশ্চয়ই সে তাদের আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, কেননা সে এক আপৎকালের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সহসা, পলকেই তার মাথায় যেমত ব

বাত্যাপ্রবাহ খেলে গেল, আর যে, সে কেবলমাত্র এক পা পিছনে সরে, ভীত-ত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল, 'তোমার পায়ে পড়ি আর করব না আ… করব না' এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে যার, প্রীতিলতার, দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা—সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল—অজস্র ছেঁড়া-মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল—মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড় !

যূথীর গলায় আর কোন স্বর ছিল না, মুখমণ্ডল ভয়ে কালসিটে, তবু এটুকু ব্যবধান মধ্যে সে একটিমাত্র চোরা ঢোক গিলেছিল, যেহেতু প্রীতিলতা আর বেশী এগিয়ে আসতে পারেনি, যেহেতু গায়ে গতরে, তার নিজেরই, কোনই ক্ষমতা ছিল না, যেহেতু সে, প্রীতিলতা, যে যূথীর মুখে না-পাওয়ার দুর্দ্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মত ময়লা—এই 'না-মাজা' কথাটা তার আপনার ইজ্জতে লেগেছিল, যেহেতু 'না-মাজা' কথাটায় এই সংসার, এখনকার দিনের পরিচ্ছন্ন দৈন্য উপহত চেহারাটা ছিল, যেরূপে বীজমধ্যে বৃক্ষের ছায়া পর্য্যন্ত নিহিত থাকে ; এবং দীনা প্রীতিলতার মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল ; এখন সে থমকে দাঁড়াল !

প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল ; এখানে সেখানে সাতবাসটে অন্ধকার—বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আর কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই ; প্রায়-ঢাকা বারান্দার উপর দিয়ে এক লুপ্ত আকাশ দেখা যায়, যাতে করে মনে হয়—তারা যেখানে আছে, সেটা পৃথিবী। অবশ্য, মেঘমন্দ্র প্লেনের শব্দ, কচিৎ মোটরের হর্ন, অথবা কখনও সাইরেন আছেই ; এতদ্ব্যতীত, রাত্রে, হরিধ্বনি থেকেও বীভৎস হয়ে উঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের নামে উত্তাল উদ্দাম পোড়ার আওয়াজ, মনে হয় এক আপনাকেই কামড়ায়—ধনীরা সুখী কেননা এ-হেন মর্ম্মন্তুদ আওয়াজে তারা পাশবিক অত্যাচারীর সদর্প-মাভৈ ধ্বনি শুনে আপনার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে ; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমায়। অন্যপক্ষে, সামান্যা রমণী প্রীতিলতা তাদৃশ চর্ম্ম-লোল-কারী টঙ্কার শ্রবণে অল্পকাল নিমিত্ত নিশ্বাস স্থগিত রাখে, আপনার গৃহস্থালীর কতিপয় ফাঁকা বাসনপত্রে হাঁড়িতে, এ আওয়াজ নির্দ্দয়ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সে আত্মরক্ষাহেতু আপনার বক্ষদ্বয়ে হস্তস্থাপন করে, তবু বেচারীর শীর্ণ একটি হাত কপালে করাঘাত করতে

ছুটে যেতে চায়, এবং সে কোনরূপে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে কোনক্রমে হাতের তালু দেয়ালের গায়ে এঁটে ধরে, হাঁকায়, মনে হয় সে যেন বা পালাচ্ছে; রুগ্ন শুষ্ক শক্ত হিম ওষ্ঠপুট জিহ্বা দ্বারা অল্প অল্প বুলাবার চেষ্টা করে এবং পাগল চোখে এদিক সেদিক তাকায়, মনে হয় এ রৌদ্রকর্ম্মা, সে-আওয়াজ তাকে যেন টানছে, ডাকছে। সে 'না, না' বলে উঠেছে তবু ঘাম হয় এবং ঝটিতে 'লতি-যূথী' বলে ডাক দিয়ে আপন কন্যাদ্বয়ের সাড়া নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করে ঝুল ঝেড়ে ফেলবে, পয়সা পেলেই পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত করতে হবে তাহলে এ-দুঃসহ আওয়াজ তাকে—তাদের আর চিনতে পারবে না! কিন্তু অনেক শূন্যতা, অনেক পাগলা সেলাই তাকে, প্রীতিলতাকে অতিমাত্রায় ছোট করে।

এখন, প্রীতিলতা আপন গর্ভজাত কন্যা যূথীর দুঃখময় মুখের দিকে চাইল, ফলে হঠাৎ-নিভে-যাওয়া মনটা দুর্দ্ধর্ষ লাল হয়ে উঠল, রক্তস্রোত স্ফীত তাতাথৈ, যদিও সে নিজে ভেবে পায়নি, এমনধারা এক বিচ্ছু খেউড়ে নিষ্ঠাবতী বিধবা খেতুর মাকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করতে পারে, যার ফলে তার পেটটা যেন বা ভরে গিয়েছিল, পরিধেয় বস্ত্রসকল নিরবচ্ছিন্ন, তা ছাড়া শুভ্র; মুহূর্ত্তের জন্য সে রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজের ফাঁদ থেকে অনায়াসে অব্যাহতি পেয়েছিল—প্রীতিলতার দেহটা যেমত বা দেহ থেকে ছুটে বার হয়ে চলে গেছে, নিমেষের জন্য লজ্জাও তার হয়েছিল যেহেতু যূথী তার কথাটা, খেতুর মার প্রতি, নিশ্চয়ই শুনেছিল। তাদের মত ঘরে এমন কুৎসিত কথা শুনলেও পাপ হয়! এ-কারণেই রক্ত তার দিঙ্‌মণ্ডলকে প্লাবিত করে, উক্ত কথার স্মৃতি মেয়ের মন থেকে মুছে দেবার নিমিত্তই সে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়েছিল, এবং এই আশাতীত দুর্ব্বিভাবা গতিবেগে যূথীকে পার হয়ে, ক্ষণেক থেমে, আশ্চর্য্য, পলকেই নিশ্চয় করে, অসম্ভব ঢঙে পুনশ্চ কন্যাকে প্রদক্ষিণ করে—বাজিকর যেমন মড়ার খুলিকে কেন্দ্র করে, সাপুড়ে যেমন সাপকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে—এসময় নাবালিকা যূথী আপনার রক্তাক্ত হাতখানি অন্য কোন উপায় না দেখে তুলে ধরেছিল।

এখানকার, বারান্দার, ধূম্রসদৃশ আলোয় রক্তাক্ত হাতখানি দেখতে দেখতে প্রীতিলতার চিত্তবিভ্রম ঘটে; সহসা, তাই, সে নতজানু হয়ে বসেই যূথীকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সেঁকো কদর্য্য অভাবের মধ্যেও—যে গভীরতা গীতের শুদ্ধ পর্দায় থাকে, যে গভীরতা জলে প্রতিফলিত তারায়, যে গভীরতা শিশুর

হাস্যের রহস্যের মাধুর্য্যের প্রাণধর্ম্ম—এ-গভীরতা সহজেই সে খুঁজে পেলে ঘুম-জড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল, 'খুব কেটেছে।'

যূথী এখন মার বাহুবন্ধনে, ঈষৎ সলজ্জ আপন হাতের প্রতি নজর রেখে, অতীব ধীরে মাথা নাড়িয়েছিল।

এখন তারা ঘরে। যূথীর আঙুলটি বাঁধা হয়েছিল, সে মার কোলে ঠেস দিয়ে আর লতি আর এক পাশে, তারা দুই বোন একটি কথাও বলেনি, এক তক্কে বুঝেছিল যে আমরা বড় নিঃসহায়! এবং মার দিকে বড় বেশী করে ঘেঁষে এসেছিল, প্রীতিলতা এইটুকু উষ্ণতার মধ্যে, এমন হতে পারে যে, সচেতন হয়ে উঠেছিল, কেননা সে যূথীর মাথার উপরে আপন গণ্ডস্থল স্থাপন করে, পরক্ষণেই তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, যেহেতু গন্ধকের মত ঘৃতকুমারীর মত এক ধরনের গন্ধ তাকে বিপর্য্যস্ত করে, সুতরাং প্রীতিলতা, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে বসে, আড়ে চাইল, সে এখন কঠিন! এ সময়ে তার মনে হয়, মনে পড়ে, কি অদ্ভুতভাবে দুইজনে পিঁপড়েকে অনুসরণ করেছিল, একজন হামাগুড়ি দিয়ে, আর একজন বেঁকে হাঁটুতে হাত দুটি রেখে, অল্পকাল পরে পরেই তাদের দ্রুত-গতি দেখা যায়, মাটি থেকে মুখ সরিয়ে ঝটিতি যূথী লতিকে বলেছিল, 'এই, মা দেখছে কি না দেখ,' এতে লতি যখন এদিকে চায়, তখন তার মাথাটা বই পড়ার মত করে নেড়েছিল, আর যূথী লতিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে পিঁপড়েটিকে হারিয়েছিল! সারাটা মেজেতে চোখ বুলিয়ে যূথী সখেদে বলল, 'হ্যা।' লতি হঠাৎ চাপা গলায় বললে, 'দিদি এই যে!' আঃ সুন্দর, রুক্ষ, দিবালোক, লাল আনুগত্য, সবুজ যেমন বৃষ্টির অনুগত, বৃষ্টি যেমন মেঘের, মেঘ যেমন বাষ্পের, বাষ্প যেমন নীলাব্ধিবসনার। এরপর দুই বোন 'লাইন লাইন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এ লাইন বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে চলে যায়; দুইবোনই দেখেছিল, মধ্যে পগার তারপর যে বিরাট বাড়ি তারই খানিকটা, যে বাড়ি থেকে কালো-য়াতি গান আসে, ফোড়নের গন্ধ আসে, বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ আসে। বেচারী লতি বলেছিল, 'দিদি আমরা যদি পিঁপড়ে হতাম'—প্রীতিলতা জননী হয়েও এ দৃশ্য কোন এক অন্তরাল থেকে দেখেছিল, কোন এক মন দিয়ে শুনেছিল! এ কথা স্মরণে তার গায়ে যেন বা কাঁটা দিয়ে উঠল! প্রীতিলতা ভীতা।

ঠিক এমত সময়ে একটি কাশির আওয়াজ, সে আওয়াজে বটগাছের শিকড় পর্য্যন্ত অস্থায়ী হয়ে যায়, প্রীতিলতার প্রাণপুরুষ কেঁপে উঠল। প্রীতিলতা

আপনার দৃষ্টিকে রূঢ় করে কব্জা করে রেখেছিল সম্মুখের অনেকটা সিমেণ্ট করা ড্যাম্প সিক্ত দেওয়ালের দিকে, অথচ বিস্ময়কর একথা যে, কে যেন বা তার দৃষ্টি দেহ মন সব কিছুকে—জানলার দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে, যে জানলায় দু-একটা গরাদ নেই, সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রীতিলতা অত্যন্ত শক্ত করে নিজেকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কেননা এসময় কাশির এবং লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক্রমে নিকটস্থ হয়, স্বল্পালোকে অদ্ভুত একটু ছায়া পড়বে, এরপর গলির মাঝের নর্দ্দমার ঝাঁঝরিতে লাঠির আঘাতে ঠং করে একটা পাজি আওয়াজ সংঘটিত হবে, আর যে, তার পরক্ষণেই পৌছবে, তাদের সূক্ষ্ম গলিতে এবং তাদের রকে—ঐ জানলার পিছনে—ধপ করে গাঁঠরি রাখার শব্দ হবে, আর যে তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত কিছু মিলে সঘন অধীরতার শব্দ মিলে একটি পাতাহীন পৃথিবীর রুক্ষতার উদয় হবে। এই ভয়ঙ্কর নিশ্বাস সকলের শব্দ প্রীতিলতার ঘাড়ের অতীব নিকটে অনুভূত হয়, সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কেননা ঘাড়ের এইটুকু গোপন-অতীব অল্পপরিসর স্থানেই কেবলমাত্র কাম, অভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয় করেছিল, কেননা দেহের মধ্যে অন্য কোথাও দেহ ছিল না, ফলে প্রীতিলতা বিমর্দ্দিত, ত্রাসিত; শঙ্কার, জড়তার, ক্লৈব্যের, শৈত্যের, জাড্যের, হিমবাহ স্বেদবিন্দুর সঞ্চার হল; সে আপনাকে আর কোন-ক্রমে আর দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারল না, ঝটিতি জানলার দিকে সে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়েছিল।

জানালার পিছনেই রক, সেখানে, ইদানীং পথশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত—দ্রুত নিশ্বাসে ব্যস্ত হাড়ের খেলা, এ খেলার আশপাশ দিয়ে অন্ধকার সহস্র ছেঁড়া চুলের মত ভেসে ভেসে যায়। এবার ছোট ছোট স্বস্তির কাশির আওয়াজ, এবং অশীতিপর বৃদ্ধের সমস্ত মুখমণ্ডলে যেমত বা ছানিপড়া-মুখখানি, দুঃখময়, গ্রহ-কবলিত, মুমূর্ষু ঘাড়ের উপর নড়ছিল। অনেকটা কাঁচা সর্দ্দি গড়িয়ে পড়ে স্থির, বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে এদিক ওদিক চাইল, তারপরেই ভগ্নস্বরে গান আরম্ভ করল। গানটা টহলদারী, রেখাবের নিজস্ব বেদনা এ গানের সুরে বর্ত্তমান ছিল।

প্রীতিলতা কখন যে এ গানে আপনকার বোধ হারিয়েছিল, তা সে জানত না, গানটি শুনে শুনে, এই কয়দিনেই, তার ভাল লেগেছে এবং সে আপন মনে, অনেক সময়, গায়। এখন, সহসা সে বুঝতে পারল যে, সে অতিধীরে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি গাইছে, আর যে, ত্বরিতে লজ্জায়, কাঁধের পিছন থেকে কাপড় তুলে মাথায় দেবার কারণে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলে হাতে

কাপড়ের পাড় মাত্র উঠে এসেছে, এবং আর কোন উপায় নেই বলে মেনে নিয়ে সেটাকেই যথাযথভাবে রাখল। কিছু পরে, যূথী-লতিকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে আপন দেহ থেকে মুক্ত করত প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, কারণ এখন, সে ধীরে ধীরে জানলার এক পাশে এসে, জানলার পাট বন্ধ করে দিয়ে, আপাতত শায়িত বৃদ্ধকে এ কয়েক দিনের অভ্যাসবশত উঁকি মেরে দেখবে। এইভাবে দেখার সময়ে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, অভুক্ত দেহ কি এক উত্তেজনায় রিমঝিম করে উঠেছিল। পলকেই স্থান পরিত্যাগ করে যে দেওয়ালে বহুকাল পূর্ব্বে একটি আয়না ছিল, সেখানে এসেই থমকে দাঁড়াল, এখানে একমাত্র জায়গা যেখানে সে আপনাকে আবছায়া দেখতে পায়! হায়! সত্যিই যদি আয়না থাকত!

খানিক সেখানে কালক্ষয় করে, উন্মত্ত যেমত, চঞ্চল পদবিক্ষেপে মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, এরা তিনজন কোন কিচ্ছু ভাববার পূর্ব্বেই প্রগল্ভ ভয়ঙ্কর কাশির আওয়াজ শুনতে পেলে। প্রীতিলতার কর্ত্তব্যবুদ্ধিভ্রংশ হয়নি; সে অসম্ভব উল্টোপাল্টা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'ওঠ না তোরা, বুড়ো কি মরবে?'

দুই বোন বিশেষ সপ্রতিভ হয়ে উঠল, কর্ত্তব্যপালনে এদের অল্পক্ষণ দিক্‌ভ্রম ঘটেছিল, তারা খানিক সন্তর্পণে বারান্দায় এল, অন্ধকারে খুঁজল। এরপর একজন দরজা খুলে দিলে, ইতিমধ্যে মার গলা এল, 'দেখিস ছুঁসনি যেন।' অন্যজন জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ এখন উঠে বসে কাশছিল, ওদের দেখে আপনার টিনটা এগিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে দুইহাতে টিনটা মুখের কাছে আনতেই, এ লোল-দেহে যেমত বা বিদ্যুত খেলে গেল, দ্রুত একটি হাত সরিয়ে পার্শ্বস্থিত জগদ্দল বালিশের উপর রাখতে যেই গেল, সে-মুহূর্ত্তে খানিক জল তার দেহের এখানে সেখানে পড়ে সাধারণ মনুষ্যদেহের হিম কল্পনা হয়ে দেখা দিল। বৃদ্ধ দু-একটা কাশি সহযোগে জল খায়…।

যূথী লতিকে খুব অল্প-স্বরে বলেছিল, 'কি বোকা, জল গিলে গিলে খাচ্ছে।'

লতি গ্যাসের অন্তিম আলোর কিছুটা মুখে তুলে নিয়ে বললে, 'চিবিয়ে খাবে বুঝি!'

যূথী পাখীর মত মুখখানিকে উঠানামা করে বলেছিল, 'আমি ত করি,' এবং পরে ইস্কুল মাস্টারনীর মত করে স্পষ্ট বলেছিল, 'ওতে পেট ভরে যায়।'

লতি এ তত্ত্ব বুঝবার পূর্ব্বেই হঠাৎ ভৌতিক আওয়াজ শুনল, 'ঘরকে যাওনা, ঘরকে যাওনা।' তারা দুই বোন দেখল বৃদ্ধ আপনার বোঁচকাটি দুই হাতে আগলে তাদের ও কথা বলছে। এতে করে দুই বোন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের রকম-সকম দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বোঝা গেল বৃদ্ধ এবার বেশ রাগ করেছে, যেহেতু বলেছিল, 'খামখা দাইড়ে আছ কেন, ঘরকে…ভাল জ্বালা,' একথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লতি যূথী…'

প্রীতিলতা জানত, বৃদ্ধ কাউকে কাছে আসতে দেয় না কেন, প্রথম যেদিন সে তাদের এ গলিতে এসে আশ্রয় নেয় সেদিনই। তাদের বাড়িতে ঠিক দুদিন পর যৎকিঞ্চিৎ চোকর সিদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলেই শুয়েছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রজ ঘুমের জন্য তখন হাঁকপাঁক করছে, কেননা সে কোনক্রমেই অবশ্যম্ভাবী তথা ভবিতব্যের দিকে আর চাইতে পারছিল না, কেননা আগামী কালের সূর্য্য শুধুমাত্র যে সে জড়ভরত, তা প্রমাণ করার জন্য পুনর্ব্বার দেখা দেবে। কিন্তু এমত সময় প্রীতিলতার ধোঁয়াটে কণ্ঠস্বর তাকে, ব্রজকে, ইহকালের স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর মধ্যে এনে দিয়েছিল। প্রীতিলতা বললে, 'বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী-লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে…বোধ হয় জানো, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।'

'দূর'

'শুনেছি ভিখারীদের অনেক টাকা থাকে…'

'দূর, লড়াইয়ের বাজারে…টাকা করতেই লোকে…বলে…পয়সা দেবে কে…'

ব্রজর উত্তরের মধ্যে উর্দ্ধের সিলিঙের সমস্ত নগ্নতা ব্যক্ত হয়েছিল। ফলে প্রীতিলতা আপনার কব্জির একমাত্র লোহাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'মজা দেখেছ, বুড়ো রোজ দাড়ি কামায়…'

ব্রজ এ-হেন এজাহারে চোখ দুটি খুলেছিল, সম্মুখের অন্ধকার দেখে নিয়ে পুনরায় চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে আপনার দাড়ি দিয়ে হাতের বাজুর কাছে ঘষলে এবং কথার মোড় ফিরোবার জন্য বললে, 'বস্তায় মানে বোঁচকায় চাল আছে…'

প্রীতিলতা ব্রজর কথা শুনে প্রথমে বলেছিল, 'তাই নাকি,' তারপর বলেছিল 'ও'– ছোট কথা অর্থাৎ উত্তর দুটি তার নিজের কাছে কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকেছিল। ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যা আত্মনিগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা বৃদ্ধের গান, যা এখন সদ্য সদ্য শুনলেও মনে হয় বহুদিন পূর্ব্বে

শুনেছি— কেননা এই গানটির মধ্যে আধিদৈবিক পূর্ণতা ছিল, বর্ষার নিশ্চিন্ত ঘুমের মোহ অথবা সুন্দর প্রভাতের সোহাগ এ গীতির ধমনী, এ জগতের মধ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, বাপ মা ভাইবোন আকাশ বাতাস, পুষ্করিণীতে হাঁসের সন্তরণ, সব কিছুই ছিল।

সকালবেলা, প্রীতিলতা একটু গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া নিয়ে এসে, গতকালের যূথী-লতি সংগৃহীত কাঠ-কুটো দিয়ে উনোন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছিল। অদূরে ব্রজ উবু হয়ে বসে, দুটি হাত তার নিজেরই পায়ের তলায় চাপা, কেননা এ সময়ে তার দাড়ি বড় চুলকাচ্ছিল। চুলকালে পাছে প্রীতিলতার নজরে পড়ে, এবং তারই দুরদৃষ্ট অথবা হয়ত অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টতঃ ওতপ্রোত হয়ে উঠে। বেশী-ক্ষণ ব্রজকে এভাবে থাকতে হয়নি, যেহেতু তারা দুই বোন খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল।

তারা দুইবোন, যূথী এবং লতি, খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল, এ খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষ-তার কারণে মা-বাবাকে গর্ব্বিত করা। প্রীতিলতা অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া থেকে চোখ ফেরাবার অথবা সকালের আলোকে পড়ে নেবার জন্য কপালে একটি হাত রেখে এদিকে চেয়েছিল। যূথী-লতির ন্যাকা, কদর্য্য, অস্বাভাবিক, পৈশাচিক চর্ব্বণের চাকুম চাকুম শব্দ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড় বিশ্রী লাগছিল; প্রীতিলতার দেহে এ কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল, সে আর যেন স্থির থাকতে পারল না। ত্বরিতে উঠে ওদের দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে গিয়েই আপনাকে স্মরণ করার অর্থে আপনকার কেশদাম দুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করেই একবার ভেবে নিয়েছিল যে, পিছনের দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে, কেন সে বাইরের দিকে যেতে চাইছিল—থমকে দাঁড়াল! তার পরক্ষণেই, ঘুরে সেইভাবে দাঁড়িয়ে, কর্কশ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক আওয়াজ করে বলল, 'বসে আছ, মারতে পারছ না?'

ব্রজর পৌরুষ এতাবৎ একগলা জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, আপনার কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা তার সকল কিছুকে অপহরণ করে, তথাপি নিজে থেকে কোন বিহিত করার মত মানসিক ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে ছিল, কেননা ভয় ছিল যে যদি করে তাহলে প্রীতিলতা তার প্রতি হয়ত অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারে। এখন প্রীতিলতার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠল, এসময় তার ছেঁড়া কাপড়টা প্রায় খসে যাচ্ছিল, সেটা নিমেষেই ধরে, প্রচণ্ডভাবে অফুরন্ত কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। প্রীতিলতা নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারে-

নি সেও লতিকে নিয়ে পড়েছিল। দুজনেই, কন্যাদ্বয় যখন ধরাশায়ী, তখন প্রীতিলতা তার নগ্ন বক্ষদ্বয় দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করতে করতে ব্রজর দিকে চাইল, এবং যে ব্রজ তার প্রতি চেয়েছিল। এরপর স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, ভূমিলুণ্ঠিত ব্যাকুল ক্রন্দনরত মেয়ে দুটির প্রতি পিছন ফিরে দেখেছিল যূথী উদম ল্যাংট একারণে যে সমস্ত ফ্রকটা খুলে গুটিয়ে তার একান্তে, পাশে লতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহটি আভরণহীন, দুজনে মিলে মনে হয় এক মহতী কল্পনার সৃষ্টি করেছে, মনে হয় এরা দুজনেই মধ্যযুগীয় কোন স্থাপত্যের আহ্লাদিত ফ্রিজের (fri?ze) অংশ, বাপ মা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কালে দুজনে মুখো-মুখি হয়েছিল, দুজনেই অপূর্ব্বভাবে হেসেছিল, হয়ত আপন আপন চোখের জল রোধ করবার জন্যই হেসেছিল।

এদিকে উনুনের জল তখন ফুটন্ত। প্রীতিলতা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া খুলে জলের উপর ফেলল এবং একটি ছোট চামচ দিয়ে গুলতে গুলতে ব্রজর দিকে চাইল। ব্রজর কাছে এ চাহনীর অর্থ অতীব সুস্পষ্ট সে অনন্য উপায়ে আপন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, এসময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্ম্মভেদী শব্দে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলেমানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গীমাত্র ছিল! ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কি অ-ছবিলা!

'আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই···খাই ···কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন···' প্রীতিলতা বলেছিল।

এ কথায় ব্রজ ভেবেছিল পুনরায় মারবার হুকুম আছে, তাই তার দেহটা ঈষৎ উঠতে গিয়ে থেমে গেল, একারণ যে, এখন সে আর এক কথা ভাবছিল—ভাবছিল নয়, পাচ্ছিল—ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য্য গন্ধ, অনেক মৃতদেহের গন্ধ— মানুষেরা কি আদতে মাছ— অভুক্ত তথা বুভুক্ষু জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ফলে এ কথায়, নিজের জন্য অবশ্যই ব্রজর যথেষ্ট লজ্জা হয়েছিল।

এখন প্রীতিলতা অনেক কথা বলে চলেছে, 'এই ধাড়িটাই ছোটটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করলে— কথা সব শুনলে গা জ্বলে যায়, সেদিন বলছে, ঘরে বসে শুনছি,' বলে অসম্ভবভাবে যূথীর কণ্ঠস্বর নকল করে তথা ভেঙিয়ে বলেছিল, 'লতি মেঘ কি করে হয় জানিস— হাজার হাজার বাড়ির রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয়, ওটা না রুই মাছের ঝোলের মেঘ— ওটা না সোনা মুগের ডালের মেঘ···' একথা

শেষ করেই অদ্ভুত করে ভেঙাতে গিয়েই, প্রীতিলতা ভয়ঙ্কর ত্রাসে কম্পিত, সে বড় অবাক হয়, কেননা নিমেষেই তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল যে বহিরাগত ত্রাস তার দেহে সঞ্চারিত এবং রক্তকে যা হেতুহীন করেছে। এইপ্রকার জ্ঞানোদয়ে সে বুঝেছিল তার সুন্দর আয়ত নয়নযুগলের একটি ছোট যুগপৎ অন্যটি বড়, এবং বিশেষ পরিমাণে উষ্ণ। প্রীতিলতা, এমন মনে হয়, তার ইদানীং স্বভাব-সিদ্ধ যন্ত্রণায় চীৎকার— কি আর্ত্তনাদ— করে উঠতে চেয়েছিল, এ কারণে যে তার মুখ চীৎকারকারীর ন্যায় ভাঙাচোরা অথচ কোন আওয়াজ নেই। পর-ক্ষণেই যেহেতু সে স্ত্রীলোক সেইহেতু আপনাকে সংযত করতে পেরেছিল। একথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে প্রীতিলতা সেই ত্রাসকে প্রতি-আক্রমণ করতে অথবা ত্রাসের ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। গরম চায়ের খানিকটা চুমুক দিতেই সে বুঝতে পারলে, দেহে অজস্র শিরা উপশিরা বর্ত্তমান, এবং সে আপনকার হাঁটুদ্বয় প্রজাপতির পাখার ন্যায় ধীরে বিভক্ত করল, ঝটিতি বন্ধ করে এবং পুনরায় এ কার্য্যে সে ব্যাপৃত হয়— কারণ তার গাত্র উত্তপ্ত, চোখে লজ্জা অথচ দেহ-প্রজ্বলন-হেতু বৃশ্চিক নিশ্বাস প্রবাহিত হয়নি অথচ তৃপ্তির পূর্ব্বেই অথ খণ্ডিতা লক্ষণনিচয় ওতঃপ্রোত; মনে হয়, নিশ্চয় দেহগত ত্রাসকে দুষ্পূরণীয় কাম দ্বারা জর্জ্জরিত করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'ওই বুড়ো-টাকে আজ বলে দিও, বড় ভয় ভয় করে…কার মনে যে কি আছে…বলা যায় না' বলেই শায়িত উলঙ্গ মেয়ে দুটিকে বলেছিল, 'মরণ— ওঠ্ না বুড়োধাড়ি নির্লজ্জ বেহায়া,' বলেই গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলে…'

ব্রজ বুঝল, যদিও এ-হেন আপৎকালে দীন-ভিখারী-জনিত প্রীতিলতার ইঙ্গি-তের পিছনে কোন সুস্পষ্ট ছবি সে দেখতে পায়নি অথবা আদৌ ছিল না। কেননা মন নির্জ্জনতা-অন্বেষী নয়, কেননা মন দ্বীপ-সন্ধানী নয়, তথাপি বলেছিল, 'পাগল!' ইস্! ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ-মিথ্যা ভয়ের, ত্বরিতেই, সুযোগ নিতে পারত।

'না না বড় ভয় করে'— এ কথায়, অন্য কিছু নয়, প্রীতিলতার আপন ত্রাসের উল্লেখ ছিল। আয়না থাকলে, দেখতে পেত যে সে, যারা এখন সমস্ত শহর-কলকাতায় ভূগর্ভের অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে— তাদেরই মধ্যে একজন। কিন্তু সে হার মানবার মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা তার কাছে একটা পাড়ই যথেষ্ট— যূথী কাদের বাড়ি থেকে মনোরম নয়ন-অভিরাম জরীর পাড় নিয়ে এসেছিল, সেটি প্রীতিলতা আপনার গায়ে জড়িয়ে দুই মেয়েকে

দেখিয়েছিল, তারা মাকে এরূপ সজ্জায় দেখে চকিতে শিল্পী হয়ে যায়, তারা রহস্য যে কি তা বুঝেছিল, যে রহস্যে বলাকা-চিহ্নিত শ্যাম আকাশের বৈচিত্র্য, নীল সাগরের বারিরাশির মধ্যে সন্তরণবিলাসী আলোক, তারই পূর্ণ হেমকান্তি ধরেছিল। যূথী-লতি আর স্থির থাকতে পারেনি, এরই মধ্যে যূথী বুদ্ধি করে জানলাটা আরো ভাল করে খুলে দিয়েছিল যাতে মায়ের দেহ জুড়ে যে আলো, তা দূর শতাব্দীর স্মৃতির মধ্যে, তাকে কোলে নেওয়া যায়— এরপর দুজনেই মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল, মনে হয় তারা যেমত বা অতিশয় ভীত, শঙ্কিত। (ভগবান ! তুমি অন্তরে থাকতেও মানুষের এত ভয় কেন !) প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।

প্রীতিলতা মুখ ঘুরিয়ে বসে, একদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরক্ষণেই সে সেইদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। পুনরায় সেদিক থেকে অন্যদিকে। কিন্তু এই মেয়ে দুটি ! মনে হয় এরা বীভৎস, এরা ক্রমশঃ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্রজর প্রতি রাগ করার কিছু নেই, এ কারণে যে ব্রজর প্লুরিসিই তার কাল, উপরন্তু তার অক্ষমতা—দুই মিলে তার সমস্ত স্বপ্ন শুধু নয়, জীবনকে বানচাল করেছে। এখন এ সময় একটা টিউশানি পর্য্যন্ত নেই, শহরে অনেকে নেই, যারা আছে বোরখা-পরিহিত আলোয় ভৌতিক। তারা সকলেই পরমায়ুকে সব কিছু বলে ধরে নিয়েছে। প্রীতিলতাদের কণ্ঠস্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়, এতে করে আর কারও না হোক প্রীতিলতার গা ছম্‌ছম্‌ করে। তখন এ ভয়কে ঠেকাবার জন্য বুদ্ধের গীতটি প্রথমে গুনগুন করে গেয়ে যেন আরোগ্য-স্নান করে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য এ গীত ! পলকেই প্রীতিলতার দৃষ্টিপথে উদয় হয় এখানে সেখানে জমে থাকা আবর্জ্জনা যেমত অযত্নের গৃহের মাকড়সার জালের মত শঙ্কাপ্রদ অন্ধকার ! এ-অন্ধকার ফাংগাস-শীল। প্রীতিলতা মনকে ফেরাবার জন্য তৈজসপত্রের কিছুটা সংস্কার করতে মনস্থ করেছে কিন্তু বাড়িতে এক ফোঁটা ছাই নেই। ছাই নেই তাতে কি, যূথী-লতি ত আছে। যূথী-লতি ছাই নিয়ে এসে খবর দিল, 'মা আমরা মোড়ের পাঁশগাদায় গিয়ে ছাই তুলব, এমন সময় গিয়ে দেখি বুড়োটা...'

'বুড়োটা' শুনেই প্রীতিলতার গায়ে হিমপ্রবাহ খেলে গেল, আপনার শৃঙ্খলিত অস্থিসমূহের বিশৃঙ্খলতার শব্দ শোনা গেল, তবু আপনাকে সংযত করতে সে বলেছিল, 'ছিঃ, বুড়োটা বলতে নেই...আমাদের অমন করে কথা বলতে নেই...'

যূথী এতে, এখন, থেমেছিল ; ফলে লতি দিদির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'জানো মা, বুড়ো···মানে বুড়োমানুষ' বলে মার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসবার চেষ্টা করেছিল, 'বুড়োমানুষ রাস্তায় বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে···'

শুনে যেটুকু মন সাড়া দিয়েছিল সেইটুকু দিয়ে এদের মা বলেছিল, 'বলিস কি !' বলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এরূপ সমাচার তার মধ্যে ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-সম্ভূত রোশনাইয়ের সৃষ্টি করে, এমন কি দুটি হাত ছেলে-মানুষের মত হাততালি দেবার জন্য খানিক অগ্রসর হয়েছিল ; সে সেইভাবে হাত দুটি রেখে কিম্ভূত এক প্রশ্ন করে ফেলল, 'আঃ কোথায় সে মর···' কথাটা 'মর'-এ এসেই থেমে গেল, 'বে' অক্ষর যোগে সম্পূর্ণ হয়নি। যূথী-লতি মার এহেন পদ রচনাটা যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি, তারা অবাক হবে কিনা এ কারণে দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল, ইতিমধ্যে শুনল তার মা পুনর্ব্বার সংশোধন করে বলেছিল, 'বেচারাকে কোথায় দেখলি ?'

'মোড়ে—কাশছে আর রক্ত পড়ছে···' এরপর তিনজনেই স্তব্ধ, তিনজনে তিন জনকে অদ্ভুত বিশেষরূপে নিপট গম্ভীর দেখেছিল। প্রীতিলতা, একথা ঠিক যে, এই মুহূর্ত্তের জন্য অন্তত ছেলেমানুষ ভাবেনি। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে, কচি কচি মুলো দিয়ে আধা সর্ষে বাটা দিয়ে ডেংও ডাঁটার চচ্চড়ি বেশ খানিকটা গুড় দেওয়া— স্বাদ পেল। এতে করে একটি ঢোঁক গিলেই, গলিত শবদর্শনজনিত ভীতি তাকে, প্রীতিলতাকে, অতিমাত্রায় কুক্ষিগত করল। কখন যে আপনকার ছিন্নভিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত খসে পড়েছিল তা তার খেয়াল হয়নি এ কারণে যে এখন সে সেই প্রথম ভোরের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুনগুন করছিল, কেননা এই গীতে অন্য সকালের একটি দৃশ্যকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

প্রীতিলতা, তখন, ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে একটু চোকর সিদ্ধ করছিল ; যূথী আর লতি নিকটে বসে আনন্দে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারছে না, তারা বাবু হয়ে বসে আপন আপন হাত কোঁচড়ে ঠেসে রেখেছিল, মাঝে মাঝে কাঁধ উঠছিল। এমত সময়ে লতি জানলার বসানের দিকে দেখে বললে, 'মা দুটো আমলকী ফেলে দাও না— বেশ টকটক হবে।' জানলার বসানে বহুদিন পূর্ব্বে আনা ত্রিফলা পড়েছিল। লতির কথায় প্রীতিলতা গোটাকয়েক আমলকী বেছে নিয়ে ফুটন্ত চোকরে ফেলে দিল।

লতি আহ্লাদে সমস্ত দেহকে কেমন একভাবে মুড়ে ফেলতে চাইল, অত্যন্ত

কৃতজ্ঞ হয়েছে সে, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অর্থাৎ মাকে খুসী করবার মানসে বলেছিল, 'ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভাল লাগে।'

যূথী আপনার নীরবতার বোকামী থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্ত যোগ দিল, 'ভাতের চেয়ে চোকর একশগুণে ভাল, হাই ক্লাস···' মুখখানা এ সময় এমন বিসদৃশ করেছিল যে তার কানটা মলে দিতে ইচ্ছা করে।

প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, 'থাক থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না···লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই।' এই শেষ উক্তিতে প্রীতিলতা আপনাদের ঘরগত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরেই সে চোকর পরিবেষণ শুরু করে।

লতি আপনার পাশতলা থেকে একটি চামচ বার করে বললে, 'আমি সাহেব-দের মত খাই' একথা শেষ না হতেই যূথী স্বকৌশলে চামচটা কেড়ে নিল, ফলে তুজনে মারপিট বেধে গেল। এ কারণে থালা উল্টে পড়েছিল, যূথী পা দিয়ে লতির থালাও উল্টে দিল। প্রীতিলতা খুব সহজেই তুজনকে প্রচণ্ড তুই চড়ে শান্ত করে পড়ে যাওয়া চোকরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক দেহভঙ্গী করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে যেতে যেতে বললে, 'তুলে খেয়ে ফেল'; এই কথাটা বার হতেই এক ঝলক ত্রাস এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের জানলার দিকে চেয়েছিল, খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান সেখানে বর্ত্তমান, খানিকটা অব্যক্ততা সেখানে ওতঃপ্রোত। এইটুকু দর্শনে প্রীতিলতা বলেছিল, 'বেচারা' আর যে, সে অন্তমনস্ক ভাবে কোন আপনজনের সঙ্গে প্রত্যহের আগন্তুক হাড়ের খেলাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল, 'বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, এমনই হতেন।' এসব কথার কারণ এই যে, আপনজন হলে মানুষ অনায়াসেই নিগূঢ় বেদনা অনুভব করতে পারে।

ব্রজ আজ তুদিন কোন কিছু আনতে পারেনি, গতকাল সে বলেছিল, 'আজ এক অদ্ভুত জিনিস দেখলুম জানো– এক ভদ্রলোক লোঙ্গরখানায়···' আর কথা বার হয়নি, অনুক্ত কথার স্বর তার বিশ্রী দাড়িতে ঘোরাফেরা করতে লাগল, শায়িত প্রীতিলতা একটা চোখ খুলে ভয়ঙ্করভাবে চেয়ে থেকেই ঝটিতি উপুড় হয়ে শুয়েছিল, ব্রজ স্ত্রীর ব্যবহারে সত্যিই অস্থিহীন হয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অন্তপক্ষে, প্রীতিলতা, খানিক সামলে উঠে বসে হঠাৎ ব্রজর হাত ধরে, 'আমার বুকে হাত দিয়ে বল, কখনও এসব গল্প···আমার বড় ভয় করে,' বলে আস্তে হাত সরিয়ে পুনরায় তড়িৎগতি স্বামীর হাতে হাত রেখেই

ভীতভাবে বলে উঠল, 'আবার জ্বর— তাহলে…'

'একটু গা গরম…'

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে ম্লান সন্ধ্যার মমত্ব ছিল, যে মমত্ব দীর্ঘশ্বাসের পরমার্থ, যে মমত্ব কিশোরীর লজ্জার লাল; আপনকার ধমনীসমূহকে ত্বক বিদীর্ণ করত বাইরে আনতে ব্রজর ইচ্ছা হল কেননা প্রীতিলতার প্রশ্নে নয় আগ্রহে, আগ্রহ নয় অনুভূতির মধ্যে সময়ের বিবেচনা ছিল, পূর্ণতা ছিল, যে পূর্ণতা দ্বারা রমণীরা চিরকাল ভালবেসেছে। অতএব এরূপ প্রশ্নে ব্রজ কিছুটা ঘর্মাক্ত হল।

অন্যপক্ষে প্রীতিলতা আপনার আঁচল দ্বারা স্থানটি সংস্কার করে, যূথীকে বলতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে, লতির মুখে বুড়ো আঙুলটি, সে বলতে গিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ব্রজ মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু প্রীতিলতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওকি মাথা খারাপ নাকি— আশ্চর্য্য আজ মাসখানেকও হয়নি ভুগে…' বলে মাদুরটা মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে দিয়ে, একান্ত তখনও তার হস্তগত, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম ছোট একটি হাঁ করে ব্রজর প্রতি চোখ তুলে ধরেছিল বলেছিল, 'জানো বুড়ো মিনষের নাকি মুখ দিয়ে…'

ব্রজ নিজের অসুস্থতার কারণে অর্থাৎ সে নিজে ভুগছে, স্ত্রীর কথায় ভীত হবার পূর্ব্বেই বলেছিল, 'দূর…'

'আমারও তাই মনে হয়…দাঁত ফাঁত দিয়ে হয়ত পড়ে থাকবে…' এই বলতে বলতে মাদুর পেতে দিয়ে বললে, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব ওকে এখান থেকে চলে যেতে, তোমার শরীর…'

'আঃ দূর'

'তা পরে ভাবলুম কিছু ত দিতে পারি না, অন্তত একটু জায়গা, কি বল… গরীবকে দিলে ভগবান মুখ তুলে…'

পুনরায় অভুক্ত স্তব্ধতা। ব্রজ জ্বর-উত্তপ্ত চোখেই ভাবছিল, খুব আশ্চর্য্য নয়, প্রীতিলতা গান গাইত, প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে লালিত্য ছিল। এখন, বিশেষত আজ তার— একদা মায়াবিনী প্রীতিলতার—কণ্ঠস্বরে ক্রমাগত বালি ঝরার ভয়াবহতা। কে মনে নেই, একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জ্বলল আঁধার নিভল আলো' এর মানে কি, ব্রজ নির্ব্বোধের মত এই হেঁয়ালির দিকে চেয়েছিল। তেমনি এই কণ্ঠস্বরের দিকে চেয়েছিল, অর্থ করতে পারেনি, হেঁয়ালির অর্থ যে পেট তা ব্রজর বুদ্ধিতে আসেনি— উদর যখন জ্বলে তখন সকলই অন্ধকার, উদর প্রজ্বলন হেতু আলোক, হায় কি অন্ধকারময়ী! তারাই ধন্য, যারা খাবার

দেখলে সত্যি সত্যি যারপরনাই ভীত হয়।

অনেকক্ষণ পর অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ভূষিতা প্রীতিলতা, আপনকার হাঁটুতে মাথা রেখে নির্লজ্জভাবে ঘুমিয়ে; অদূরে কন্যাদ্বয় দেওয়ালে— ভিজে ভিজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কান্নার বীভৎসতা প্রকাশ করছে; একারণে ব্রজ রোজগারি বাপের মত বিরক্ত, সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় মারার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করতেই, দেখল যে তার দুর্ব্বল দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খেলে; ইচ্ছা দেহটা যুত করতে পারেনি। খানিক দেওয়ালের কাছে সেইভাবে সে দণ্ডায়মান ছিল।

যূথী-লতি কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে, প্রীতিলতা চোখ খুলে তাকিয়ে ছিল—প্রীতিলতা কিন্তু মাথা তোলেনি, ফলে যে দুঃখময় রেখা তার দেহ ভর করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি, কি দুগ্ধহীন-স্তনক্ষুব্ধ সে রেখা!

প্রীতিলতা বুঝেছিল, ব্রজ বার হচ্ছে, কেননা এখন সে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার প্যান্টুলুনের ভাঁজ ঠিক করছিল। প্রীতিলতা প্রশ্ন করল, 'কোথায়?'

'বালিগঞ্জ।'

প্রীতিলতা দক্ষিণ দিকে চাইল, কেননা বালিগঞ্জ দক্ষিণে, মনে হল সেখানে কি মৃত্যু নেই···আর্ত্তনাদ নেই! যে আর্ত্তনাদ আরও প্রবলতর হয়ে তাদের দরজায় ফিরিঙ্গি কায়দায় আঘাত করছে। প্রীতিলতা ভয়ে আপন মুখমণ্ডলে বস্ত্রপ্রদান করেছিল। সে ত্রস্ত শঙ্কিত। সমগ্র পৃথিবীটা যেন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার নিমাই জগমণির মত, অনেকটা ধুকুড়িয়া বাগানের আথমাড়া ম'ম' করা রাত্তি যেন, যার হাস্যে সদ্য কাঁচা সর্দ্দির আতুরে আওয়াজ, পাটের রকমারি রঙে উদ্-ব্যস্ত রুমালে বটবৃক্ষ শরীরটা ঢেকে বসে। আর যাই হোক এ দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

প্রীতিলতা মুখমণ্ডলের বস্ত্র সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ফিরতে ত···'

'হ্যাঁ সাতটা আটটা···' ব্রজ এই উত্তর দিতে দিতে চলে গেল। প্রীতিলতার মনে হল কোথায় যেমন বা ব্রজ অদৃশ্য হয়ে গেল। কি দুর্দ্ধর্ষ রহস্য! মানুষ যে দোমড়ান অনন্ত বৈ অন্য নয়, সে সত্য বুঝবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রীতিলতা প্রীতিলতার মধ্যেই থেমেছে এবং গুনগুন করে সেই গীতধ্বনি করেছিল।

এখন সে শুয়ে, সে যখন ভাবছিল, ব্রজ দুটি ভাত না পেলে আর উঠতে পারবে না, ঠিক এমত সময়ে, যূথী প্রায় মার ঘাড়ের উপর পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে বলেছিল, 'মা দেখ লতি কি কুড়িয়ে খাচ্ছে···'

অচিরাৎ জ্যা-মুক্ত ছিলার মতন প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, সত্বর বারান্দায় গিয়ে

লতির সম্মুখে দাঁড়াল। ক্ষণেকের জন্য মার মনে হয়েছিল, আমার কি যুথীর মত হিংসে হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে একটি চড়ের আওয়াজ শোনা গেল— এ চড় লতির গালে প্রীতিলতাই মেরেছিল— সঙ্গে সঙ্গে লতির মুখ থেকে কি যেন ছিটকে পড়ল। পলকেই প্রীতিলতা এবং যুথী ছুটে গিয়ে দেখে, জলসিক্ত হরীতকী…। ছোট একটা নিরেট নিপট আর্ত্তনাদ— আর্ত্তনাদের সঙ্গেই ধ্বনিত হয়েছিল বহু পূর্ব্বে সেনেটে উক্ত লাটিন ডায়লগ: 'এবং তুমিও!' এ দৃশ্যে পরক্ষণেই প্রীতিলতা জলদগম্ভীর রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজ শুনেছিল।

প্রীতিলতা সমাগত পবিত্র সন্ধ্যাকে কশ্চিৎ জলপ্রপাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেরূপ সদাই বিষণ্ণভাবে শেষ হয়, তেমনি তার দক্ষিণ হস্ত থেকে ধ্যানপ্রসূত কতিপয় নকসা অদৃশ্য হল। সে সেই গীতটি ক্লান্তকণ্ঠে, ছোট ঘরের মধ্যে মন্থর গতিতে ঘুরে ঘুরে, গাইছিল। ঘরে আর অন্য কারও নিশ্বাস ছিল না। এ কারণে যে যুথী-লতিকে বাপের জন্য অপেক্ষা করতে এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন অন্ধকারে কোথায় যে সে, একথা ভুলে গেল, সে সত্যই দেওয়ালে হস্ত-দ্বারা অনুভব করত 'এই যে বোধ হয় আমি' এরূপ মনে করবার চেষ্টা করেছিল, এবং তৎসহ সমস্ত স্থাপত্যের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধা এসেছিল, সমস্ত আকাশের কিছুটা নিদ্রার বাস্তবতা এখানে যে, সে তা জানত না অথবা কেউ তাকে জানায় নি— অনেকবারই সে সেখানে, দেওয়ালে, মাথা খুঁড়েছিল। কিন্তু তবু প্রীতিলতা খুব আশ্চর্য্য সহকারে দেখেছিল যে এরূপ সংঘাতপ্রসূত বেদনা উক্তির 'উঃ'-কারের মধ্যে বুদ্ধের প্রভাতী গীতের রেশ বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে, ইদানীং প্রত্যহের সময়মাফিক নর্দ্দমার লোহা আর লাঠির আওয়াজ, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, সমস্ত দিককে বিমর্দ্দিত করেছিল; এবং অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকিনী প্রীতিলতা চকিত ভীতা, আপনকার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কাকে যে সে রক্ষা করতে চাইল তা সঠিক বুঝা গেল না— যেহেতু এখানে অন্ধকার— সম্মুখের শূন্যতাকে অথবা নিজেকেই। (হায় প্রীতিলতা যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে সে দেখতে পেত, এই শূন্যতা ভেদ করে সে কখনও যায়নি!)

প্রীতিলতা ভীত হয়ে অদ্ভুতভাবে আপন আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে, সে সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে। এবং এতে করে সে আর একটি অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত হল।

আদতে আপনাকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা অতীব সাধু

কৌশল। ইত্যাকারে খানিক অসময় পার সত্যি হয়েছিল, কিন্তু আর পারা গেল না, কখন যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খোঁজ ছিল না।

তির্য্যক গ্যাসের আলোয় বসে বৃদ্ধ খানিক শ্রান্তি দূর করে শূন্যতার সংঘাত হেতু কম্পিত হাতখানি দ্বারা আপন কপাল মুছছিল, এরপর অসম্ভব মায়াজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, 'হরি বল'—অনন্তর এখন, যখন সে কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করেছিল তখন সে গীতটির সুর ধরেছিল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে ইদানীং অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত একটি দেহে সে গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এ কারণে যে প্রীতিলতা এখনও তেমনিভাবে দণ্ডায়মানা।

বৃদ্ধ গীতটি গাইতে গাইতে, খানিক স্খলিত পদে স্বভাব মত বাইরে যাবার নিমিত্ত এখান থেকে চলে গেল, শুধুমাত্র বস্তাটা সেখানে। প্রীতিলতা আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করেনি। খানিক বিবস্ত্রতা সত্ত্বেও ছুটে, থমকে, কাপড় সংগ্রহ করত কোনক্রমে জড়িয়ে, সদর দরজার নিকটে এসে স্থির, এমত সময় সে আপনার নিশ্বাসের সময় পেয়েছিল, শব্দও নিশ্চয়। কত রকমারি নিশ্বাস প্রীতিলতা ফেলেছে— উষ্ণ, দীর্ঘ, হারমানা!

এখন সে, সদর দরজার এপাশে, অল্প গ্যাসের আলোয় সেই ঘুমন্ত ভাল্লুকের মত বস্তাটা এবং সম্মুখেই অদ্ভুত এক ভঙ্গীসহকারে প্রীতিলতা, গৃহিণী, দণ্ডায়মান : মনে হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, এমন হতে পারে সে ছায়া দেখতে চেয়েছিল। আঃ পরোক্ষ অনুভূতি!

ঝটিতি প্রীতিলতা রাস্তায় নেমে, বস্তাটায় হাত দিতেই, হস্তদ্বয় তড়িৎবেগে ফিরে, কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আকাশহীন শূন্যতায় কম্পিত হতে থাকল। পরক্ষণেই যখন সে বস্তাটা ধরে কায়দা করার চেষ্টা করে, তখন দেখে— বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে, একটু এসেই বৃদ্ধ কেমন যেন বা নেচে উঠল— বোধ হয় খোয়ার জন্য, তারপরই পাশের দেয়ালে হেলে পড়ে, দেওয়াল ঘষটে একটু এসেই সমগ্র জোর দিয়ে প্রীতিলতার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। পুরুষের স্পর্শে গৃহিণী প্রীতিলতা অচিরাৎ এক নৈসর্গিক বয়স ফিরে পেলে, সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল; কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বারা কোনক্রমে রকের কিনারটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে ওঠে, গ্যাসের আলো পেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল; হঠাৎ বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয় তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল। এ দৃশ্যে, প্রীতিলতা মজ্জাগত মনুষ্যত্বের

বশে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে, থমকে, আপনকার উদ্যত হস্তদ্বয় দেখেই সেই হাতে বস্তাটা তুলতে গিয়ে পুনরায় দেখল যে, রকের কিনার থেকে জর্জ্জরিত হাত দুটি ধীরে নেমে গেল, ফলে সমস্ত শরীরটা তারই দিকে ঢলে পড়তেই একটু সরে গিয়ে—রকে বসে পড়েছিল। শুধু মনে হল, এখনও কি মানুষেরা মৃদুস্বরে কথা কয়, ছোট করে হাসে!

প্রধূমিত কক্ষের মধ্যে প্রীতিলতা যেমত সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল, বহুবার সে জানলায় দাঁড়িয়েছে, গরাদ মুঠো করে পুনর্ব্বার ফিরে গেছে। এমত সময় শুনল, দুটি কচি পদধ্বনি, এখানে এসেই যেন নিভে গেল। জানলা থেকে প্রীতিলতা বললে, 'রক থেকে দেখ ত কি হল বুড়োর'—এ কণ্ঠস্বর আজও প্রতিধ্বনিত হয়-নি। যূথী-লতি দেখার পূর্ব্বে—প্রীতিলতা বলেছিল, 'ঝট করে ক্লাবে খবর দে।'

কিছু পরে ক্লাবের ছেলেরা এল, এসে দেখে বললে, 'হ্যাঁ শাল্‌লা—চ বে ওঠা শালাকে…'

যূথী-লতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার বুড়োর বস্তার বা লাঠির বা মগের কথা তাদের মনে হল না। ইতিমধ্যে মার কণ্ঠস্বর শুনেই তারা ভিতরে চলে গেল।

হঠাৎ হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন, এসব দেখে তারা যেন এক পরীর রাজ্যে চলে গেল। তারা হাসল, তারা স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে সর্পগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

যদিও যূথী প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ, তারা দুই বোন বাবু হয়ে বসে, বাপের জন্তেও একটা জায়গা করেছে; এমন সময় খানিক সুস্থ আওয়াজ। মেয়ে দুটি 'বাবা! বাবা!' বলে উঠে গিয়েছিল।

'আজ খুব বরাত ভাল—চাল পেয়েছি,' বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। 'একি চাল কোথায়…'

'বলছি—তোমার শরীর…'

'জ্বর নেই—পাঁচটা টাকাও পেয়েছি…'

'বেশ বেশ…আর দেরী কর না, বসে পড়।'

গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মত মনে হল, এবং প্রীতিলতাকে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ কোথায় পেলে…'

এ কথার উত্তর প্রীতিলতা প্রস্তুত করবার জন্ত ডালভাতের স্যাকড়াটার গিঁট

খুলবার জন্য একটু ঘুরে বসতেই···ব্রজ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলে, 'ওমা তোমার পাছার কাছে রক্ত···'

এ কথায় সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ঘুরে বসেই শুনলে, লতি বলছে, 'জানো বাবা বুড়োটা মরে গেছে···'

প্রীতিলতা যুগপৎ বলেছিল, 'কি যে অসভ্যতা কর এদের সামনে, জান না কিসের রক্ত—নোংরা' বলেই থেমে গিয়ে জিব কাটল।

ব্রজ দু'বার 'ও ও' বলেই কেমন যেন থ হয়েছিল।

'নে খানা তোরা,' প্রীতিলতা দমকা আওয়াজ করে বলেছিল। অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ-খোরাকী গলায় বলেছিল, 'বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে···খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না···'

বক্তব্য, ১৩৬৭ বৈশাখ-আষাঢ়

ক য়ে দ খা না

প্রায়ই উবোল স্থাড়া টিলাদার জমি, কোথাও নিভে গেছে। খালি পেটের মত অসম্ভব ফাঁকি-পড়া প্রকৃতি ; অতিদূরে ভূমিষ্ঠ রুগ্ন আকাশ। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে-উঠা চড়াই এবং পলাতক উৎরাইয়ের উপর তালবৃক্ষের ছোট ছোট ঝিলমিল। এ চরাচরে ওইটুকুতেই মাত্র কাপড়ে নক্সার বাতিক ছিল। সেই ঘোড়াটি এখন এখানেই।

ঘোড়াটির ঘাড় যেমন বা মাছ-পড়া ছিপ্, অতি সহজেই চকিতেই বাঁক হয়ে গেল ; অথবা ধনুকের মত দৃপ্ত তীক্ষ্ণ রমণীয় রেখা। এটি হয় একটি সুন্দর পিঙ্গল বলীয়ান আরবী-বংশজ ঘোড়া। ভুটে নয়। চড়াইয়ের নিম্নে উৎরাইয়ের নিঃসঙ্গতা যেখানে যেখানে ; যেখানেই কিছু ঘাসের ঝালা আখর, বর্ত্তমানে সেখানেই ঘোড়াটি ঘুরেফিরে ; খুরের ঠোকানিতে কিছু ধূলিকণা ইতস্তত বিথার। নীচে, কখন বা, যেখানে ছোট গোল রুপালী জলাশয়—যার কিনারে হলদেটে-সবুজ ক্রমাগত খাড়া খাড়া জলজ-ঘাস, সেখানেই, জলের উপর দিয়ে তার পিঙ্গল ছায়াটা জোর করে চলে যায়। এ জলাশয়ে কেবলমাত্র ট্যাবা শাঁখ মেঘের বিম্ব থাকার দস্তর। ঘোড়ার পিছনে, উত্তরে, বহুদূরে অনেক পাহাড়, এবং তালগাছের জোটের মধ্য দিয়ে দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ের রেখা উদ্ধৃত। কোথাও সহসা খিঁচিয়ে-উঠা রুক্ষ পলাশ, ডালে ডালে শুকনো পাতা এবং ফুল। এই মুহূর্ত্তে যারা যৌবন হারাল তাদের আর্ত্তনাদ এখানে ; আদপোড়া হাওয়া বইছিল। ঘোড়াটি ভিজে ভিজে সবুজ ঘাস থেকে আপনকার ঘাড় খেলিয়ে তুলিয়ে কখনও বা নামিয়ে নিলে। এখন নাক স্ফীত করে থররর আওয়াজ করে, ফলে কচিৎ ঘাসফড়িং এবং ঝিঁঝিঁ লাফিয়ে সরে যায়।

যেহেতু সন্ধ্যা হয় ; আকাশ অনন্ত হয়েছে, টিলাগুলি সোনা হলুদ ; উর্দ্ধে বাদুড়ের টানা স্রোত, এখন পথভোলা পাখীর ডানা লাট খায় ; এবং গঙ্গাচিল বিন্দু হতে বিশাল প্রতীয়মান। ঘোড়াটি এখনও নির্লিপ্ত হয়েই ঘুরেফিরে, জলে তার নিপট কালছায়া। এমতকালে, দূরে ডুকরে-উঠা টিলার সোনা হলুদ ভেদ করে ক্রমে কে একজনা বেঁকে উঠে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরিদৃশ্যমান

চরাচর ঋজু কলেবরের গুণে ইদানীং ভরাট। লোকটি মুখের পাশে একটি হাত খাড়া রেখে হাঁকল, 'ও হো হালম রে।'

জলাশয়ে মুক্তকেশী অন্ধকার।

সুন্দর ভাট গাছ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া ডাল, সেখানে ঘোড়াটি—মাটির আধো সবুজ, ঘোড়ার পিঙ্গলবর্ণ ভাটফুলের কমলালেবু রঙ অটুট হয়ে উঠল। ঘোড়াটি মুখ তুলে, সুলক্ষণ কানদুটি খাড়া করে। ল্যাজটি নড়ল। কেশর স্থানচ্যুত হয়।

টিলার লোকটি তাকে দেখলে। লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবী তীরেলা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেট্টি, তার গায়ে নক্সা করা ভারী কাঁথা হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা; কড়া হাঁটু—তার পাশেই আঁটলি মাংসপেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত, কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে। হাতে হাত মিলান, লোকটি অবাক হয়ে ঘোড়াটিকে দেখল, সম্পূর্ণ ছবি। নিশ্চয়ই সে খুশি হয়েছিল। খানিক ধূলা ভেঙে টাল খেয়ে খেতে খেতে সে নেমে এল। দীর্ঘ চেহারাটি ঘোড়ার কাছে আরও দীর্ঘ হয়ে উঠল।

হাঃ করে একটি নাতিদীর্ঘ হাঁফ ছেড়ে সে বলেছিল, 'হা হি! ঈ ডহরেকে ঘাস খাইছিস রে বটে, একা একা স্যাঙাবিনু হে হালম বাঃ জান'—বলে আদর করলে। লোকটির পাঁচটা আঙুল পিঙ্গল বর্ণনার উপর দিয়ে চলে গেল। এবং এই সময়েই আরও কিছু কিছু বলেছিলই; ফলে ঘোড়াটির গায়ে শিহরন খেলে গেল। এই ঘোড়াটি তার, তার নাম শাজাদ।

শাজাদের গায়ে এখনও জ্বর। তবু রাত থাকতে খড়গ্রাম থানার শেরপুর থেকে, নিকটেই দাদাপীরের থানে মাথা ঠেকিয়ে, বাদশাহী সড়ক ধরে এখানে এসে পড়ছে। একুনে তিরিশ-বত্রিশ মাইল পার হতে হয়েছে। এদের কাছে এরূপ পদব্রজ খুব একটা গর্ব্বকথা নয়, এরা লোধাদের মত হাঁটে। তার জ্বর এই হেতু যা কষ্ট। তথাপি এমত অবস্থায় তাকে আসতেই হয়েছে পায়ের গুলে পর্য্যন্ত ধূলা।

কিছুদূরে ডাঁই করা উঁচু পাকা সড়ক উত্তরে পারোই ইষ্টিশান, দক্ষিণে তড়খা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সড়কের ঠিক পশ্চিমে এক-দৌড় ধান ক্ষেত, তারপরই সেঁজুতি ব্রত আলপনার মত রুমুখগাঁ। পাঠানসদৃশ শাজাদ এসে উঠল সড়কে, ঘোড়াটি তার পিছনে। সে একবার সড়কটার উত্তর-দক্ষিণ নজর নিল—সুড়ঙ্গ যেমত, দুই ধারে অশ্বথ বট মহুয়া এবং আর আর গাছ। সড়ক পার হয়েই,

ঢাল বেয়ে নামবার কালে চোখে পড়ল একটি চলমান শাড়ী, একটি মেয়ে। মেয়েটির কোমরে ঠেস দেওয়া একটি ঠেকা (ঝুড়ি)। এখান থেকে তাকে বেঁটে দেখায়, হাওয়ায় তার কাপড় উড়ে; আর তারই ঠিক পিছনে বখরাকরা খরকাটা উদোম কোরা ধানক্ষেত। মেয়েটি হাতে তাল দিয়ে বুঝি বা কিছু গীত গায়। শাজাদ চোখ ছোট করে বড় করে ঠাওর করে নিয়ে হাঁকল, 'হে হি গো অমলি হে, অমলি কোতি ?'

সড়ক তথা রাস্তার ঢালের নিম্নে নালা, জলে টৈটম্বুর। তার উপর দিয়ে তালের গুঁড়ির সাঁকো, অমলি এখন সেখানে। শাজাদের ডাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'রাঘবপুর ঠেন ঘরকে যাবু অ।'

'খাড়াও হে খাড়াও রে ধনি'।

এখন, যখন শাজাদ সাঁকোর কাছ বরাবর, তখন অমলি দাঁড়িয়ে আছে। তার বসন উড়ছে, বাঁ পায়ের উরুতখানি দেখতে ইচ্ছাসুখ হলে দেখা যায়। সুঠাম কালো হিমশিম নিটোল উরুতখানি। শাজাদ ক্লান্ত, ঘোড়ার ঘাড়ের শেষে কনুইটি রেখে, হাতের উপর মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজের ঠোঁট শুকনো জিব দিয়ে ভিজাবার চেষ্টা করেছিল। অমলির মুখে বেফাঁস এলো-চুলের ছেনতাই, সে যেমন বা উন্মাদিনী ভূতুড়ে।

'এ হি ডোমের ঘরনী, শুধাই রাঘবপুরের খাস বাড়িতে দিনমানে নাকি ভূত দেখায় ?'

'ভূত দেখায়—ইহি করে হেসেই অমলি থমকে থেমে গেল। অমলি ডোম শাজাদের কথা বুঝবার চেষ্টা করলে সহজেই বুঝতে পারত। হাসি জন্য সে ত্রস্ত। এরপর এমনভাব করলে যে সে বুঝেনি, নাসাপুটে আঙুল ঘষলে, তার-পর কানের বেলকুঁড়ি টিপতে টিপতে মাথা দুলিয়ে বললে, 'ভূত কুথাকে ! সে ঠেন কাজকে লাগলাম বটে, টাকা দরে মাহিনা হে, তোমার কথা সুজিনা গো, খড়ির আঁচড় বুঝি না গো।'

শাজাদ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে হাতদুটি রেখে বললে, 'কাজকে লাগলি তাইতো শুধাইরে।' এরপরই তার গলা যেন কার টুঁটি চেপে ধরেছে, বললে, 'ডগর বখনা, ভরা ভাদুরে যৈবন তোর লো, তিন তিন স্যাঙা করলি বটে, আর সাদা কথা আন জবাব দিস লো···আহে, মানুষের কথা বুঝিস না কেনে ? কানে কি বাঁশী শুনিস্ বটে,' আরও শক্ত করে বলেছিল, 'ভূত ভূত জীন ! শুনি বুনবিহারী নায়েব নাকি বহাল হইছে।'

অমলি এইবার পরিষ্কার বুঝলে, কিঞ্চিৎ ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূ কপালে তুলে ঠোঁট উল্টে বললে, 'হোঃ ইঃ ইকথা।' এরপর মাথা নীচু করে ঠেকার কানা খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'সায়বটো আইছে ডিহি জমিন জানপরচানি করাইতে গো, ছিট বুঝায়।' একটু যেন সরল নিশ্বাসের শব্দ পেয়ে, ঈষৎ দুলে দুলে বলতে লাগল, 'সায়েবের একটা পাশ-দেওয়া চেংড়া ভাগনাই কাজ লিবেক বটে।' তার কথার শেষে ক্রন্দনের থরতাইয়ের খুঁ-খুঁক শোনা গেল।

'বটেক' বলেই শাজাদ চোখ ছোট করে ঘোড়ার কেশরে আঙুল চালাতে চালাতে তার দিকে আড় চোখে চেয়ে বললে, 'কেমন মানুষ বটে ভূতটা রে?'

অমলি তার নিজের মত করেই বুঝেছিল যে এ প্রশ্নের মধ্যে ধমকের আওয়াজ ছিল না। এ কারণে তাঁর ঠোঁট চঞ্চল হল, তবু থেমে সম্মুখের লোকটির দিকে আলগোচে চেয়ে নিয়ে, একটু হেসে দুলে দুলে বলতে লাগল, 'দেখলে মন নাচবে গো, ঘোর আমুদকে বটে, দশ-বিশ রাত ইয়ার ঝুমুরনাচ পচুই পারবন,' হঠাৎ কি যেন ভেবে বললে, 'বড্ড লোক কাজ পাবে গো, হাটে হাটে খ্যাড়া দিইছে, মাড়ভাত পাব গো কাঙাল মানুষ মোরা হে—কচুপাতার অধম গো, পাইক বরকন্দাজ কতক লাগবে, তুমার কাজ মিলবিক'—মিলবেক স্থানে আড়ষ্টতায় 'বিক' হয়ে গিয়েছিল।

শাজাদ ছিলার মত টান হয়ে গেল, ঘোড়ার কেশর থেকে চোখ তুলে অমলির দিকে চেয়েছিল। চোয়াল দুটি নিষ্ঠুর হয়েছে, কেশরে একটি স্থিতিবান হাত ক্ষিপ্রগতিতে কেশর মুঠো করে ধরলে, গায়ের কাঁথা নড়ে উঠল। ঘোড়াটি ঘাড় আন্দোলিত করত হ্রেষাধ্বনি করেছিল। নালার কাল জলে অমলির ছায়া কেঁপে উঠেছিল, সে সহজ হবার চেষ্টা করে এক পা দিয়ে অন্য পা চুলকোল। শাজাদ লাফ দিল না কথা বললে, 'হে শালী শালায় ঢুকিয়ে দুবো ওর...'

ভয়ে স্পষ্টতই অমলির চোখদুটি অদলবদল হয়ে গেল। সে নষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং ত্বরিতে মুখে কাপড় দিয়ে ঘাড় কাত করে, শঙ্কিত হয়েছে এমতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা কাপড়ের উপরে ভীত দুটি চোখ আর মাঝে মাঝে চুলের ছেলেখেলা। শাজাদ আপনকার মাথার ফেট্টিতে ঠিক দিতে দিতে বললে, 'ঈহি ডরে মরলি, বল ডুমনী মানুষ কেমন? উমর কি বা?'

গলাটা পরিষ্কার করে, মুখলগ্ন বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে থেকেই, সে যেন চোখ দিয়ে কথা কইল, 'দু কুড়ি মন নয়, গোরা গাট্টা ঢ্যাঙা, ঠাকুর ঠাকুর আদল।' আবার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিল, 'বড্ড মানুষ গো, সব কোলে যায় সব কোলে আসে

মন বুলে গঙ্গাজল…'

শোনার পরক্ষণেই শাজাদ গরুতাড়ানো শব্দ করে বলল, 'ই হি গঙ্গাজল। আঁচল বিছানী মাগী ক'বার…যা শালী ট্যারা সিঁথি কেটে হাঁসকল পাতগে যা সদরে' এই ঝাপটায় অমলি থরহরি, সে রোগ হয়ে গেল। এখন দু-জনাই চুপ। কুসুমগাঁয়ের ছেলেমেয়েদের গোলমাল আসছে না। শুধুমাত্র ঝট্ ঝট্ কচিৎ ডানার শব্দ মধ্যে মধ্যে শেয়াল অথবা বোধ হয় খরগোসের অন্তর্দ্ধান। শাজাদের ঠোঁট নিঃশব্দে কাঁপছিল। স্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'আমাদের গা লিয়ে কোন কথা শুনছিস? আসছিল তারা…'

'শুনি নাই…আসে নাই'

'মিছাই বলছিস'

'কেনে? মিছাই বললে রক্ত উঠে…'

'দো দো হারামজাদী…যা ঘরকে যা।' তারপর অন্যমনা হয়ে বললে 'ঘরকে বলিস জলপস্ত (পোস্ত) করতে, প্যাজ পুড়াতে, একটু খোল (সরিষার) চমকাতে বলিস বটে।'

এবার কাল জলের উপর থেকে অমলির আতুর ছায়া সরে গিয়েছে। শাজাদ মুখ তুললে, জমে উঠা নিশ্বাস ছাড়ল, নিশ্বাস গরম—হাতে সে উষ্ণতা পরখ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। অমলিকে হারামজাদী গালপাড়া সূত্রে বললেও, শুধু-মাত্র তার আওয়াজই হয়েছিল, এবং এ কথাই সত্য যে, তার বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছিল। যে বিরক্তি, গত পরশ ঠিক এমত সময়, তখন একটি তারার সন্ধ্যা—তখন থেকেই মনে চমকাচ্ছিল। অনেকবারই সে মুঠো শক্ত করে নিজের ক্ষমতার হিসেব নিয়েছে।

পরশুদিন এমতকালে, ঘোতাই মাণ্ডী বহু ডিহি ডহর পাঁচ-ছটা চুটাতে পার হয়ে খড়গ্রাম গিয়ে শাজাদকে খবর দিয়েছে যে, রাঘবপুরের খাস বাড়িতে পুন-র্ব্বার হুজুর দেখা দিয়েছে। রাঘবপুর যে আবার পত্তন করেছিল সে খবর সবাই জানত। নূতন হুজুর! হুজুর কথাটা শুনে শাজাদের হৃদয় হাইয়ে উঠল। সে জরে কাঁপছিল, কাঁথার নক্সায় চোখ বড় বড় জনমানুষ পাখীগুলো হাস্যকর, তারা নড়ছিল। থপ্ করে মাথার ঢাকাটা খুলে সরিয়ে ঘোতাইয়ের দিকে তাকালে। ঘোতাই মাণ্ডী তখনও বসেনি, দাওয়ার উপর একটা পা রেখে এবং হাঁটুর উপর একটি হাত রেখে নাক খুঁটতে খুঁটতে আবার যেই বলেছে 'নুতুন হুজুর।'

শাজাদ বেয়াড়া-তাড়ানো গলায় হে হে করে বলে উঠল, 'ধাম শালা পাথুরে হারামী শালা "হুজুর হুজুর" বলি হুজুরের বুকজোড়া ব্যাঙমী-রাঢ় ! হুজুর বলতে পরাণ তুয়ার লগবগাইছে রে···দাখিলা পরচা চিনলাম না···হুজুর কেনে ?'

শ্রান্ত ঘোতাই একটু টাল খেয়েছিল। শাজাদ আরবার কাঁথা মুড়ি দিলে, ঘোতাই কথা বলতে শুরু করেছে ! কাঁথা মুড়ি দেওয়া পদদ্বয়, যা চেটাই ছাড়িয়ে বার হয়েছিল, তা নড়ছিল, কাঁপছিল, থামছিল।

ঘোতাইয়ের বক্তব্য এই যে তখন সকাল বেলা। বনবিহারী নায়েব কোমরে ময়াল কুণ্ডলী করে চাদর বাঁধা। এক হাঁটু ভেঙে অন্য হাঁটু উঁচু করে বসে, দূরে দূরে আঙুল দিয়ে নিশানা পয়চানি করায়। নায়েবের সম্মুখেই, মাটিতে নুড়ি চাপা দেওয়া ছিট (ম্যাপ) ; ঠিক তার পাশেই এক গাদা গুটান পাকান ছিটের বাণ্ডিল। এবং সেখানেই বিরাট একটি ছাতার শান্ত ছায়া। অনেক দূরে চড়াই আর উৎরাই, তালগাছের এলেক, অতীব দূরে অনেকটা আকাশ, লম্বা হাতে-গড়া মেঘরাশি। রোদে নায়েবের চোখ ছোট, বলছিল, 'হাই দূরে পুবে কুসুম গাছ উয়ার পাশেই বটে পতিত জমি—উ যো উপরে শিরীষ উটা কেন্দ বটে তা'পর হল ড্যাঙ্গা ডিহি—ইধারে পশ্চিমে' বলেই চোখ ফেরাতেই নায়েবের চোখ পড়েছিল ঘোতাইয়ের দিকে। গায়ে কাদা মাখা হলে যেমত অস্বস্তি হয়, ঘোতাইয়ের শরীরময় নায়েবের নজর বাবদ তেমন তেমন অস্বস্তি। নায়েব তার কুলোঝাড়া আওয়াজ-ওয়ালা গলায়, 'ঘোতাই লয়, ঘোতাই কেতি ! কত জনম দেখি লাইরে আয়,' তারপর আর একটু সাহস করে বলেছিল, 'আয় আয়, লে লে সোনার মানুষ দেশকে এল রে' বলে নিকটে কে যেন ছিল তার দিকে মহাসম্ভ্রমে মহাগর্ব্বভরে তাকাল, এবং বলেছিল, 'আর ফিকির লাইরে ঘুতাই, আকাশ ভাঙ্গি জল বরখাবে গো এমন মানুষ আঁজলা ভরি জল পাবি, ডবল মিঠাই আখ' বলে একগাল হেসে বললে, 'লে লে ঝপ করে লে' বলেই পুনর্ব্বার নালঝরা চোখে বাবুর দিকে চাইল।

সম্মুখেই বাবুহুজুর। তাঁর মাথায় লাল পশমের বিরাট একটি ছাতা তার রূপার দণ্ডে ফিনফিনে নকাসীর কারুকার্য্য। দণ্ডটি ধরে দাঁড়িয়ে কয়েক দিনের তাজা একটি অভুক্ত মুখ, এর পাশেই আর একটি লাল চাপকান পরিহিত মুখমণ্ডল, তার নাকের ডগায় শাদা কাঁটা কাঁটা, এর হাতে টাব্দির মত মনোরম একটি পাখা, সে ঘুরায়। পাখার হাওয়ায় ছাতার রূপালী ঝালরে থাড়া স্রোত গোলাম হয়ে আছে। অথচ বাবুহুজুরের হাতে কোঁচার তোড়া চুনট করার ফলে ফুলঝাড়ি

হয়ে ছিল, সেটাকেই নাড়িয়ে হয়ত বাবু হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নায়েব এমত দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না, এ কারণে তার আটাত্তর বছর বয়সের বঁড়শির মত রুচিৎ ভ্রূগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, মনে মনে ভাবলে 'কোথাকার বুনো বে-আক্কেলে বাবু গো।' এবং দুম করে ধমক, পাঙ্খাবরদারকে, 'হেই বেটা আকাঁড়া মাকড়া ঢপ গাইছিস না হাওয়া—।' নায়েবের ধমকে বাবুহুজুর যৎপরোনাস্তি বেয়াকুফ হয়ে কোঁচা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাখা নিশ্চিত জোরে চলতে থাকল।

নায়েব আহ্লাদ করে, ঘোতাইকে দেখিয়ে বললে, 'হুজুর আপনার প্রজাখাতক, লে লে তোকে আর ঠেঁটি টানতে হবে না।' নায়েব যদি একথা না বলত তাহলে ঘোতাইয়ের কোমর থেকে ঠেঁটি খসেই যেত, 'লে বড্ড কাঙাল মনিব গো, উয়ারা সাঁওতাল, হঁা হঁা কথার মানুষ বটে বিষ-তঞ্চকতা নাই, ওই মৌজা রুনুথগাঁয়ে বাস, আপনি হুজুর এসেছেন শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছে। লিকটে আয় ঘোতাই আয় লিকটে আয় হা লে লে গড় কর তোর জন্মজন্মান্তরের দোষঘাট মকুব হবে—লে।'

ঘোতাই কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না; যদিচ একথা সত্য যে, সে কথার ফটকে পড়ে গিয়েছিল। কাঙাল চাষা তারা জন্মজন্মান্তর, তত্রাচ বাবুকে প্রণাম করতে আসেনি, একথা জজে মানবে, আকাশে যিনি আছেন তিনি সাক্ষী। ঘোতাই মাঙীরা উত্তরে সাঁওতাল, বহু পুরুষ দেকোদের সঙ্গে বাস, তুড়ক শাজাদের সহচর তবু সেও ফেরে পড়ল।

নায়েব দুধ-তোলা গলায়, 'তোদের কত ভাগ্যি তোর বাপ জানত বুড়ো রাজাকে, পুণ্যাত্মা লোক লাট কৌন্সলের মেম্বার দরবার লিষ্টিতে নাম তারই লাতি রে' বলে নিজেই হাতজোড় করে বললে 'কত পাপ করেছিলুম তাকে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।'

ঘোতাই তখনও মাটিতে গড়-করা অবস্থায়। নায়েব বলেছিল, 'লে লে উঠ বেটা।' সে উঠতে উঠতে শুনেছিল, 'সব্বাইকে খপর দিবি হে, চাল কটা বেশী খাবি।' নায়েব থামল সম্ভবত। ঘোতাই উঠে দাঁড়াল। তার নাকে এবং কপালে এবং হাঁটুতে লাল মাটির দাগ, কিছু অতি ক্ষুদ্রকায় কাঁকর, সে একটু চুলকাতেই খসে ঝরে পড়ল। হাঁটু আর কনুই ঝাড়তে তার কেমন বাধ বাধ ঠেকল। সভয়ে এক ফাঁকে সে হুজুরের দিকে তাকিয়ে ফেললে। মাথায় ছত্র, দু-এক স্থানের জরির ঝালর ছিঁড়ে ঝুলছে। পায়ের দিকে নজর পড়ল, পায়ে ভেলভেটের উপর

রেশমের কাজ-করা পাম্প। সিল্কের মোজা, গোলাপী গার্টার, ঢাকাই কাপড়ের কোঁচায় রোক, ষ্টিফবুক শার্ট, পাকানো উড়ানীর মধ্যে হীরের বোতাম জলছে। তার ঠিক উপরে পরম রমণীয় সুন্দর বিহ্বল মুখমণ্ডল। আকর্ণবিস্তৃত দুটি লাল চোখ, কালো চুলে সিঁথি করে চুমকিছুঁড়ি পাতাকাটা। ঘোতাই বিস্ময়ে হতবাক্ এ যেন কোন ঠাকুরদেবতা। একবার মাত্র তার নিজের ঠেঁটির কথা মনে হয়েছিল। ঘোতাই হঠাৎ চোখ ফিরাল।

অদূরে পাল্কি তার গায়ে নূতন রঙ। বারওয়ান থানার ছুতোরের করা নক্সা, সিধি আদিলপুরের পটুয়ার হাতে লেখা নিখুঁত লতাপাতার কেয়ারি এবং পরী চিত্তির করা। ঘোতাই এই পাল্কিটা চেনে, রাঘবপুরের আস্তাবলে পড়ে থাকত, বহুদিন পূর্ব্বে ওখানে ছাগল চরাতে গিয়েছিল সে আর শাজাদ। শাজাদ মস্করা করে ওই পরী-পাল্কির চটা-উঠা পরীর মুখে গোঁফ এঁকে দিয়েছিল। এখন, এই পিছনে, এখন বেশ কিছু দূরে দু-একটি ঘোড়া অনেক গরু চরছে, আরও দেখা যায় নেংটিপরা রাখাল বাঁশের লাঠি বগলে ঠেকো দিয়ে আড়বাঁশী বাজাচ্ছে, তার হাতের বালাটি এখান থেকে সুস্পষ্ট। ঘোতাই এখান থেকে ওখানে পালাতে মরিয়া হয়ে উঠল।

হুজুর এক রকম কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির বাংলায় বলেছিলেন, 'নায়েব মশাই ওদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিন।'

কথাটা শোনা মাত্রই নায়েবমশাই হো হো করে উঠল, ক্ষণিকে, ত্বরিতে উঠেই তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'হুজুর এ সকল কথা উয়াদের সামনে বলবেন না, আদবকায়দা তা লয়, আড়ালে আমাকে হুকুম তলব করবেন উয়ারা লীচ কাঙাল আদপেটা আপনার জুতাচাটা প্রজা-খাতক উয়াদের সঙ্গে কথায় লেগে আমরা আছি বটে।'

হুজুরের মুখটা পাক দিয়ে উঠল, অবশ্য শরমে নয় যেহেতু নায়েবের মুখে বেয়াড়া গন্ধ সেইহেতু। এবং লজ্জার জন্য বড় বড় চোখ দুটি অন্য কোন কিছুতে আশ্রয় করতে চেয়েছিল; সুতরাং হুজুরের লাল ছাতার মধ্যে আপনার মুখখানি আড়াল করতে বাসনা হয়। আপনার অভিজাত গৌরবটা ভুলে যাওয়ার জন্য হাত ঘেমেছিল। বনবিহারী নায়েব হাঁটুর ধুলা ঝেড়ে পানক্লিষ্ট দাঁত বার করে বললে, 'যা রে ঘোতাই আমরা তোদের গাঁয়ে খবর দিলে যাস, সকলকে বলবি।'

ঘোতাই, এরপর ল্যাকপ্যাক করতে করতে তারপর জোরে পা চালিয়ে দিলে। ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠে, সাহস করে এদিকে বরাবর চেয়ে দেখেছিল। ছোট

গোষ্ঠী, লাল ছত্র, পাল্কি, লোকলস্কর সব কিছু—আর দূরে গরু, ঘোড়া, কাঁড়া, তাদের গলার ঘন্টি টুংটাং করে বাজছে। আর মেলা রোদ। তার মনে হয় এ দৃশ্য যাত্রার দৃশ্য যেমত। তার মনে হতে পারত এ সকল পোশাক জিলা আদালতের পিয়ন-আর্দ্দালীর মত। যে, যা সে দেখেছে।

ঘোতাইকে কেউ যেমন তাড়া করেছে, যেহেতু সে দ্রুতপায় আলডহর পার হয়ে রুহুখগাঁয়ে এসে পৌছল। কোনদিকে যায়? যে সে, কি সে করে? একবার এদিক অন্যবার আর-দিক সে করেছিল। তার মতিচ্ছন্নতায় মুরগী ভীত হয়ে তার বাচ্চাটিকে নিয়ে অন্যত্র সরে পড়ল। ছোড়া মোরগগুলো কোঁ কোঁ করে পালাল। ছাগল একটা, ঝটিতি সরে দাঁড়াল মাটির দেওয়ালের গা ঘেঁষে, তার মাথাটা চীনে তুলির ঝটকা টানে পরিবর্ত্তিত হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

ঘোতাই ডুমুর গাছে মাথা গুঁতিয়ে, আতা গাছটায় দোলানি দিয়ে এক টানে এসে দাঁড়াল নিমাই হেলের বাড়ি।

'আহ আহ ঘুতাই ললদিনী পরাণ, সামাল দাও বুকের কাপড়ে হে খসি কোমরে গেল এমন ছুটলেক…।' বসন্তের দাগওয়ালা রসিক মুখখানি তুলে ইয়াসিন বলেছিল। এখানে আর অনেকে উপস্থিত।

অন্য সময় ঘোতাই ননদ কথাটা নিয়ে বাতবচসা করে, যখন করে, তখন অনেকে ঝুমুর গাইতে গাইতে লেটো ধরে অবশেষে ভিহি খেমটা ধরত। যেমন এখন শোনা গেল, 'ধনি মোর গঞ্জনায় গোঁয়ার, ও সে মানবে না কার কথা'।

অবশ্য ঘোতাই বাতবচসা না করে একটু গম্ভীর হতে চেয়েছিল। এত অল্প ছোট তার চোখ যে, সে গম্ভীর একথা কখনই মনে হয় না। সে শাজাদের অনুকরণ করলে, এবং রববানির মত করে যাত্রার দৃশ্যটির কথা বলেছিল। এই প্রথম নিজেকে কেউকেটা বলে ধারণা হয়েছে—অত্যন্ত। অসভ্যভাবে নাক ঝেড়ে ঠেঁটিতে আঙুল মুছে আরম্ভ করলে—ফলে সে যথাযথ করে ঘটনা গোছ করে বলতে পারেনি। দোষঘাট মকুব কথাটা মনে করবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারেনি। সবকিছু বেগোড় করেছিল।

নিমাই হেলে এ যাবৎ চুপ করেই শুনছিল। ঘোতাই এক হাত্তায় কথা বলে নিয়ে, এখন থেমে থেমে ভেবে কিছু বলছে। নিমাই হাঁটু নাচিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'শা-আ গোলামের এঁড়ে পাথুরে, শালা আঁচল পেতে দিলি না কেনে? গড় করলি রে! হায় হায় পোয়াসত্ত ভোগ না কি…হে হে একি একে বলত বটে…।'

'আমি বলি ললদের কোন দোষ নাই, উয়াকে একা বেগ্যাণ্ডা পাইছে। ব্যাস!' ইয়াসিন গম্ভীরভাবে আরও বললে যে, 'লায়েবটাই "মীরাহা টিছুবি" (উল্টে নিলে বিছুটি-হারামী হয়) এক লম্বরের, উয়ার বাপ ওঃ!'

নিমাই হেলে ঘোতাইয়ের ঘাড় নাড়া দেখে ক্ষেপে উঠেছিল। বোধ হয় সে ভীত সে একা। সে চেঁচিয়ে উঠল 'সে ঠেন থিকে চলে আসতে পারতিস হে।... যাঃ শালা সাঁপিটো ভিজাই আন।'

নিমাইয়ের এহেন কথায় ঘোতাই বটে ছোট হয়। এখানকার রোদ তার গায়ে বড় কড়া হয়েই লাগল, যেহেতু অপমানে মন দেহগত হয়েছিল। তার রাগ প্রকাশ পেয়েছিল, সে নিমাই হেলের হাত থেকে সাঁপিটা নিয়ে চলে গেল। এই ফাঁকে নিমাই বলেছিল, 'তুমি বলছ বটে উয়ার দোষ লাই আমি বলি ও হঁদো মাগীর হধম কোম্পানী শুনলে বুলবে কি?'

কেউই এই তুরুপের জন্য খাড়া ছিল না। ইদানীং সকলেই ভীত হয়েছিল, কে একজনা অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, 'ভারী শলো মায়ের দয়া হইছে, নিমঝোল খাব।'

ইতিমধ্যে ঘোতাই ভিজে সাঁপি বুড়ো আঙুলের চাপে নিঙড়োতে নিঙড়োতে ফিরে আসতেই নিমাই অতীব ঘেন্নায় বললে, 'যা শালা ছানা পেটে ধর গা... লীহে শুগা'।

ঘোতাই নিজেকে সহজ করবার মানসে ক্রমাগত কফ টানছিল। গড় করার অপমানের থেকে সকলেই বেশী ভীত হয়েছিল। মনে মনে ভারী ভয় পেয়েছিল। ইয়াসিন সাত ছেলের বাপ, আকাশের প্রতি তার বড় মায়া, প্রতি জুম্মাবারে (শুক্রবারে) সে এগারো মাইল পথ ভেঙে কোরান শুনতে যায়। মাথা তার হিসাব জানে, খুব ঠাণ্ডা। কল্কে ধরে দু-একটি ফোকাই টান মেরে, এবার ঠোঁটিতে তালু ঘষে কল্কে ধরে দিলতোড় টান দিয়েছিল। মুখখানি তার লহরী তোলা জলে প্রতিফলিত যেন বা, গাঁজার ধ্বকে কুঁচকে কুঁকড়ে স্থির হল। তারপর শুরু করলে, 'শ শ বছর বিতাল হে, এ মৌজা পতিত লিখা।' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'কত জখমারি কষাকষি হল, বুড়া...রাজা গো তার পাইকের হাত থেকেন শাজাদের বাপ বন্দুক কেড়ে নিলে, গুলির ঘায়ে আছাড়-পিছুড়ি খেলে ঠিন্‌কি গহিরার সোঁতায়, শুনি মরণকালেও সে ঘা ছিল। তখন মানুষগুলো মরদ ছিল। সায়েব ম্যাজিষ্টর রুসুখগাঁয়ের সব্বাইকে ডাকি খাজনা দিতে হুকুম দিলে সে—খাজনা লিতে কেউ এল না' বলে হাসল এবং বললে, 'এ

লাটের মালিক ওই ঠেন আকাশে থাকে'।

এরপর বহুদিন গত হয়েছে। ছাগলের মুখের গাছ আজ ছায়া দেয়। কুসুম-গাঁয়ের কথার আওয়াজ বহুদূর থেকেই কানে আসে। লোক বেড়েছে জমি একই আছে। কেমন যেন কমজোরই হয়েছে সকলে। তবু শাজাদ খুব জবরদস্ত, ফলে এ গাঁয়ের কোম্পানী বলতে তাকেই বুঝায়, তাই সকলে মতলব ঠাওর করলে শাজাদকে একটা খবর দেওয়া হোক। এ কারণে ঘোতাই খড়গ্রাম যায়।

শাজাদ রাস্তার ঢালে এখনও দণ্ডায়মান, গত পরশু সন্ধ্যার কথা ভাবছিল। ঘোড়ার ম্যাজটা গায়ে পড়তেই সে যেন চমকে উঠল, ঘোড়াটাকে একটা যতন-চাঁটি মেরেছিল।

অমলিকে দেখা যায়, খরপায়ে আল ধরে সে যাচ্ছিল। একটি বিজোড় যখন, ছাগল যেমত লাফ দিয়ে পার হয়—তেমনি সেও পার, তখন শাজাদের গলার স্বর তার কানে এল : 'হো অমলি দৌড়ি যা রে হে ঘরকে বল্লিস গো আলমের সাজ পাঠাইতে বল্লিস হে হে'। অমলি শাজাদের দিকে ঘাড় না ফিরিয়েই শুনে-ছিল। এবার সে ঘাড় ফিরালে, বেশ দূরে আবছায়া আবছায়া, একটি শাজাদ আর একটি তার ঘোড়া। অমলি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষমাণা। এখন আর কোনই হুকুম এল না, সে আবার পথ ধরলে।

শাজাদ কিছুকাল সেইদিকে চেয়ে থাকার পর রাস্তার বটগাছ থেকে নেমে-আসা ডাল ধরে ঢাল বেয়ে, রাস্তায় খাড়া উঠে গেল। রাস্তায় উঠে সে বসে-ছিল, পিছনেই ঘোড়াটিও ছিল। শাজাদের আর দম ছিল না সত্য, কিন্তু তার এ বোধ ছিল যে তার আপনার মনের ভিতরে কি যেন আনচান করছে। অনেকক্ষণ পরে আলপথে খাড়া অন্ধকার দেখা গেল, তারপর তাদের কথার ভাঙা ভাঙা আওয়াজ, এরপর স্পষ্ট হল নিমাই হেলে আর শিবাই বামুন।

নিমাই ঘোড়ার সাজ রাখতে রাখতে বললে, 'শুনি তোমার নাকি জর বটে' বলেই শাজাদের গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলে। শাজাদ ক্লান্ত না গম্ভীর বুঝা গেল না। দু-একটি পাতা খসে পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য বৈচিত্র্য ছিল না। সুতরাং কেবল ঘর্ম্মাক্ত শুব্ধতা ছিল।

শিবাই শাজাদের সমীপে বসে, গাঁজা টিপতে টিপতে কয়েকটা শীত-শীত কথা বলেছিল, শাজাদ হাঁটুর ওপর কনুই ঠেকো দিয়ে মুখখানি হাতে ঢেকে রেখে-ছিল। সহসা পাতা খসে পড়ল, এবং তৎক্ষণাৎ শোনা গেল ঘোড়ার খররর শব্দ, ওরা দুইজন যেন নিঙড়ে উঠল, এবং অকারণে যে ভীত হয়েছে একথা

স্মরণ করে দু'জনে হাসির ঝিঁক দিল, শাজাদের পিঠটা চমকে উঠেছিল, ধীরভাবে পাশ ফিরে সে কিছু নজর করবার চেষ্টা করেছিল।

নিমাই বললে, 'নৌতুন মালিক খাস কুঠিতে আসছে, ডাগর দুটো ঘোড়া আনছে, বলে হোয়লর ঘোড়া শুনি পচুই খায়...' বলে ঘোড়ার গায়ে পাশাপাশি হাত চরাতে লাগল তাঁতির মতন।

'বটে,' বলে শাজাদ আরও বলেছিল, 'আর সমাচার ?' একথায় মনে হয়, এই প্রশ্নটি করবার জন্য সে মন বাঁধছিল। গর্ত্ত ছেড়ে যেন একটি ভীত ইঁদুর পালাল।

প্রশ্নের মধ্যে তবু বুঝি শ্লেষ ছিল। শিবাই নিমাইয়ের হয়ে উত্তর করলে, 'কোন খবর নাই ওই যা শুনছ,' বলবার কালে সে নিজের জটা খামচে ছিল, অবশেষে বললে, 'ই ঠেন আসে নাই'।

'জমি নাকি শুনি মাপ জরিপ হয়,' শাজাদ হাতের তালু দুটি ফাঁক করেছিল মুখের উপর থেকে।

'তিন মৌজায় হয়,' এরপর ভীত সাহসী গলায় বলেছিল, 'সিহো-হে, হি সে গোঁফতা আছেন, ই ঠাঁই আসবে ··' তারপর রাল-রগড় করে বললে, 'লাও আর চুলকায় কোথাকার রাজা মরেছে গো' নিমাই হেলে যেন অন্ধকারে মিশে গেল।

গম্ভীরভাবে শিবাই বললে, 'ঘুতাইকে বলেছে ই আপনার প্রজা-খাতক' বলেই সে খস্ করে দেশলাই জ্বালল। দড়ি ধরে উঠল। বামুনের জটাজুট আর দাড়ির মধ্যে রুগ্ন মুখটা প্রতীয়মান হয়েছিল। শাজাদ শক্ত করে আগুনের দিকে চেয়েছিল, এবার ঘোড়ার পিঠের উপর মাথা হেলিয়ে দিল। বৃক্ষের পত্রসমূহের মধ্যে মধ্যে আকাশ, শাজাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তার মন যেন বিন্দুবৎ হতে চাইছে। অথচ স্মরণে এমন কিছু নেই যাকে আঁকড়ে ডাক-ছেড়ে কাঁদতে পারে। যা আছে, তা নিঃসঙ্গতা মাত্র। তথাপি সে গলাটা কেমন যেন আড়ষ্ট করে বলেছিল, 'শিবাই মনে পড়ে আমরা সেই দাদাপীরের ঠেন গেছিলাম, মনে পড়ে ? পৌষমাস শিং-কাঁপান ঠাণ্ডা। আমি, তুমি, কালিয়া চকের নিকের—সে বেটা বললে, আমরা আগা জালি গোল হয়ে বসে সে বললে, লোকে বলে মাছের মত এমন হালাল জীব আর এই দুনিয়ায়ে নাই কিন্তুক আমার মন বলে, আমাদের মত মানুষের মত এমন হালাল জীব আর কেউ লয়' নিকেরের উক্তিটি বলে শাজাদ ক্রমে ক্রমে একটি ধূসর নিশ্বাস ছাড়ল, এবং বলেছিল 'আমার তাই মনে লয়।'

শিবাই কল্কেতে ফোকাই টান মারতে মারতে শাজাদের এহেন উল্লেখ করার হেতু কি তা বুঝবার চেষ্টা সম্ভবত করেছিল। নিমাই হেলে ঈষৎ হেসে, তারপর ছেছুড়ি দিয়ে একটু সরে এল। পুনর্ব্বার শাজাদের গলা শোনা গেল, 'শিবাই ভগবান কি সত্যই আছে?'

এ কথার উত্তরে একটি সাঁ সাঁ করে শব্দ হল, এবং পরক্ষণেই সক্ করে একটি শব্দ হওয়ার পরই শোনা গেল 'আছেঃ!' শিবাই কল্কেটি এগিয়ে দেবার সময় আপনার বাঁ হাতটি দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করেছিল।

কল্কেটি বেশ করে ধরবার সময়, শাজাদ রয়ে রয়ে বললে, 'বামুন মনে কি লয় তোমার? আমার গতর তেমন তেমন লায়েক আর লয় না হে।'

এ কটি কথায় হিম ছিল, শিবাই কি যেন ঠাওর করবার কারণে চারিদিক চাইল, তারপর বললে, 'ই কথা কেনে?'

'লয় কেনে বল? ভারী হাঙ্গামার কথা মনে…'

কথাটা শেষ না হতেই নিমাই ঝলকে বলে গেল, 'আমারও তাই মনে লয়, ভারী হাঙ্গামা অর্শাবে' বলে থেমে লজ্জিত হল, ভীত হল।

একটু শান্ত। তারপর শোনা গেল, 'তাই বলি গতরের কথা।'

'ষাট! কোন মরদ বুলবে? তোমার গায়েকে দশ বন্দুকের বল হে। হিঃ দারগা ম্যাজিষ্টরের বল তুমার গায়! মন করলে পাহাড় চষি আঁখ ফলাইতে পার—এক আখে আদ্ মন গুড়!' শিবাই মাটিতে চাঁটি মেরেছিল।

দু-একটা টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ যেন বা আমলকী পাতার মত; সে, শাজাদ, কল্কেটি হস্তান্তরিত করার পর বললে, এখন কি জান ঠাকুর, তুমি আমি বড় কাঙাল হইছি; হাতমুখ ভাসুর ভাদ্দরবৌ, দু-একটা মেরে ধরি খাই…তাও জুটে না, দেখ না তড়খা পারোই এ হেন সড়ক দিনমানে লোক হাঁটে না? লুটব কাকে? তাছাড়া মাড়ভাত জুটা ভার তেজ তাকত নাই— তাই বড়…শালা ধর যতি হাঙ্গামা করে…?' শাজাদের মত মারাটঠা লোক এমন অসহায়ভাবে এ সকল কথা বলেছিল।

শিবাই তার জটা খাম্চাতে খাম্চাতে চটকা-ভাঙা শব্দে বললে, 'কেনে শালা, আমরা কি মরিছি নাকি?' নিমাই হেলে কল্কের ঠিক্রে ফেল্তে গিয়ে থমকে চমকে গিয়েছিল, শিবাইয়ের শেষ কথাটি সে নিঃশব্দে উচ্চারণও করেছিল।

এ প্রকার হলপে শাজাদ নিশ্চিত ভারী খুশি হয়েছিল। এ সন্দেহ তার মনে ছিল যে, এরা সকলেই তার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে,

সেকথা অযথা ! এরা আজও তেমনি তারই পাশে আছে।

শাজাদ আরও জানতে চেয়েছিল যে, এই রাস্তার ঢালের নিম্নে যে ধানক্ষেত, তারপর রুহুখগাঁ— এখন যেখানে মিটমিটে আলো এবং ওপাশে ঠিনকি গহিরার সোঁতা আর সেপাশে মহুয়া গাছ অবধি যে সিঁড়ি-ভাঙা স্থাবর জমি, এখন অন্ধকারে যা ভয়ঙ্কর— মেলাখেলার লে-তরাবট তরমুজী রাঢ়ের মত, আঁট নেই আঁঠা নেই ; দেহে ঝুরি নামবে তত্রাচ পিরীত পাবে না। সেই জমিকে আপনার বলে, নিজের শির বলে মনে করে কি না !...এ কথার জবাব সে পেয়েছিল, ফলে তার শরীর দশ-মরদ হয়ে উঠল। একটি পা দিয়ে সে সজোরে লাথি মেরে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'লে রে নিমাই সাজ দে।'

শিবাই মুখখানি উঁচু করে বললে, 'কোতি যাবে হে ?'

'দেখিব সখি সে কেমন জনা, কেমনে বাঁশী বাজায়' কলিটি গীত করে গেয়ে সাদা গলায় বললে, 'ভূত দেখে আসি হে...চক্ষে দেখি তাকত কেমন কাঁটি কাঁটি'।

ক্রমে ঘোড়ার সাজ পরানো হল, শাজাদ ঘোড়াটির উপর উঠে বসে বললে, 'তুমরা ঘরকে যাও আমি এলাম বলে,' থেমে আবার বললে, 'এবার যতি জিতি ঠাকুর পীরের দরগায় আমার ছাগলটা—'

নিমাই হেলে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'আমারও মানসিক আছে হে, টিলাতে আমি চিনি দিব গো'। তার গলার স্বরে ভীতি প্রকাশ হয়েছিল।

শাজাদ চকিতে যেন ক্ষেপে উঠল, বললে 'ভয়ে শালা' এবং থড় করে ভারী চপেটাঘাতের শব্দ প্রকাশিত হয়ে উঠল, 'ভয়ে সুক্‌সুক্ করছ'।

নিমাই চড় খেয়ে টালটা কোনমতে সামলে, ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল। শিবাই তাকে নিয়ে মাঠে নেমে গেল। কান্নার আওয়াজ, ছেলেমানুষের স্তন খোঁজার কান্নার আওয়াজ যেমত !

একমনে দূরাগত ক্রন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে সহসা শাজাদ কেঁপে উঠল। লাগাম কষে ধরে, বললে, 'শালা হারামী কেঁদে খর মাঠ নোনা যতি করবি ত আবার...' তার কথা আপনাআপনি উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে একথা ভাবতে ভাবতে কখন যে থেমে গিয়েছিল তা সে জানতে পারেনি।

কান্নার শব্দ, এক্ষণে, আর নেই। কেবলমাত্র মাঠালি-হাওয়া সোঁ সোঁ করে উঠে নামে, বিরাট গাছের মাথাগুলি দুলে। রাস্তা আবছায়া মাঝে মাঝে জোনাকির ঝাঁক ! পুতুল যেমত— শাজাদ নড়ে নড়ে চলে। এখানে তার

ছায়া নেই এ কারণে যে সমগ্র দিকই অন্ধকার। খানিক পথ অতিক্রম করে, সে একটা ঝুমুর ধরলে, সুর ছিল না, গলায় ছোঁড়া মোরগের মত স্বর। সে নিজের গীত খানিক কান খাড়া করে শুনলে, ঠিক স্বর লাগানোর চেষ্টাও সে করেছিল, মধ্যরাতে ভীত পথিকের গানের মত উত্থিত হল, ‘কাজল পরা চুক তোমার আঁচল পেতে লুব’।

অনেকটা পথ সে পার হয়ে এসেছে। সোজাই যদি যায়, তাহলে পারোই ইষ্টিশান। ডাইনে নটা-গোবিন্দপুর, বাঁয়ে রাঘবপুর। ক্রমে চাঁদ সুস্পষ্ট, শাজাদ রাঘবপুরের রাস্তায়। আর কিছু দূরে অনেক ভাঙা-ভাঙা ইমারত—প্রাচীন কোন বাড়ির, এখানে কখনও নীলের আড়ং ছিল। ঠিক এরপরই আড়ং-এর কুঠিবাড়ির প্রকাণ্ড ভাঙা লম্বা দালান। পর পর খিলান। খিলানের মধ্য দিয়ে রূঢ় চাঁদের আলো রাস্তায় পড়েছে। পড়ে এক অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করেছে। শাজাদ একটির পর একটি চন্দ্রালোক পার হয়ে এসে দাঁড়াল, সম্মুখেই বিস্তীর্ণ মাঠ। এইখান থেকেই স্পষ্টতই দেখা যায়, দূরে জলের তলার স্বচ্ছতার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য!

কাঁচকড়ার তৈরী বিরাট একটি বাড়ি,গ্রীক মন্দির যেমত। এর সঙ্গেই জোড় দেওয়া আর পদ্ধতির দালান, এই দালানের উঁচু দেওয়ালের মাঝে মাঝে ছোট ছোট জানলা, অবশেষে খোলা ছাদ— ছাদের একান্তে দেওয়াল—মনে হয় ঘর তুলবার বাসনা ছিল। অন্য পাশে নবরত্নের চূড়া দেখা যায়। এতকাল হাওয়া বাজত, নিঝুম ছিল। মন্দিরে ঠাকুর আছেন ৺লক্ষ্মী-জনার্দ্দন ফলে শূর্য্য চাটুজ্জে, বেশকার নীলাম্বর আর পচা মালাকার তিন বিঘে ভোগ করে সে, এবং টগর ঝাড়ুদারনী ৷৷০ আনা মাহিনায় বহাল ছিল—সে, তা ব্যতীত রামছবিলা দুবে দরওয়ান এ বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করত—সে, এ ছাড়া আর কেউ ছিল না। আজ যেন বেশী লোক। শাজাদ খানিক নিরীক্ষণ করে আপনকার দেহটিকে খেলিয়ে সোজা হয়ে বসল।

এটা যেন বাড়ি নয়। বাণবিদ্ধ রাজহংস, অনড় প্রস্তর যেমত; তার অঢেল সৌখীন উড্ডীয়মান জীবনের পরমার্থ একভাবে এইখানে দেওয়ালেই খুঁজে পেয়েছে। ঘুরন্ত সিঁড়ির শেষ ধাপের অলৌকিকতা এখানে। তবু তথাপি কেন যেন মনে হয়, যেন বা কোথায় সমস্ত কিছুতে হাড়ের জঘন্যতা রুক্ষ হয়ে আছে। শুভ্রতার অন্তরীক্ষে সম্যকভাবে যা নেই; যা এখানে স্মৃতি—ভৌতিক, নিপীড়িত, গোঙানিতে পূর্ণ। এ কথার ভাব শাজাদ পেয়েছিল, তার মনে অবশ্য হয়নি!

শবদেহ যেন পুনর্ব্বার উঠে বসেছে, এবং এই সত্য তার মধ্যে হিম হয়ে দেখা দিল। সে কেঁপেছিল, তার মনে হল পাশে ত কেউ নেই, মনে হল কারা যেন আছে বা।

তার মত লোক কতটুকু ভাবতে পারে ? খুব জোর আলুর কল, আখের টিকলি, ধান যদি হয়। শাজাদ এখনও এখানে, তার পিছনে পাশে আলুলায়িত গজ-পিপুল লতা, আরও পিছনে ছককাটা আলো অন্ধকার তথা তেরচা চন্দ্রালোক এবং রহস্যময় পরিপ্রেক্ষিত। সহসা এই পরিপ্রেক্ষিত তার মধ্যে দুস্তর অভ্যন্তর সৃষ্টি করেছিল—সেখানে ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ। এ শব্দে তার রোমহর্ষ হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে, সে উপর দিকে তাকাল, গাছে গাছে অন্ধকার, এবং বাদুড় দেখে সে হুস করতে গিয়ে থেমে, আবার পিছন দিকে চাইল, কোন উত্তর নেই—শুধু চাঁদের আলো। একবার তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, 'হা খুদা, আমায় ভূত করলে না কেনে' অতীব ভীত দারিদ্র্যের উক্তি।

সে দেখেছিল, অনেক লণ্ঠনের তৎপর যাওয়া-আসা, তাদের কথার আওয়াজ এখানে হাওয়ায় হাওয়ায়ে আসে পট্‌পট্ করে উঠে। কুয়ার লাট্‌ঠা উঠে নামে, বড় কুয়ার ঘিরনির শব্দ, জলে বালতি পড়ার দম করে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। এই আবহাওয়া শাজাদকে সত্যই নাড়া দিয়েছিল, সে আলমের ঘাড়ে মাথা রেখে বিশ্রাম চাইল। তার যেন হার হয়েছে।

কখন যে সে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়েছে, আর যে কখন সে আলমের ঘাড়ে চাপড় মেরেছিল, এবং বাবুই দড়ির লাগাম টেনেছিল তা তার চোখ দেখেনি। সম্মুখে আরবার খিলানের রহস্য, ঘোড়া মন্থর গতি যায়, খিলান-ভেদী চাঁদের আলোয় তাদের ছায়া ত্যাওড় বেঁটে বেঁটে। শাজাদের মনে এখন আর ঝুমুর নেই, নিদেন একটা অশুদ্ধ খেমটাও নেই। আড়ং সে পার হয়েছে, ভারী কাঁথাটা দুই কাঁধে তুলে দেওয়া, জর বহুক্ষণ ছিল না। এখন শুধু তার মনে হল, পেটে খিদে নাল ঠুকছে, ফলে শরীরটা তার পাক দিয়ে উঠেছিল। পেট নিঙ্-ড়ান খিদে। এমন খিদে তার কেনে ? ঘোড়াকে 'খাড়াও খাড়াও' বলে রেকাব থেকে পা বার করে ঝুলিয়ে দিলে, স্থির হয়ে ভাবল একি জলতৃষ্ণা না খিদে, দেখতে চাইল কোথা জল। এই দুস্তর ফাঁকা মাঠের মধ্যে সে জলচিহ্ন কোথাও নেই। বেশ কিছুকাল এইভাবে তাকাতে তাকাতে তার কি একটা কথা মনে হল! মনে হল যে মাঠে মাঠে সে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। কোনমতে নিজেকে পাঁজাকোলা করে ফিরিয়ে আনতে পারছে না, অনাথ অসহায় বালকের মত সে

অপলক নয়নে সেই দিকে ঠায় চেয়ে আছে। তার মধ্য হতে একটি ছোট ক্ষণস্থায়ী শব্দ উত্থিত হল : ভারী স্থাকা অাঁ-অাঁর মত। কিন্তু এ শব্দ সে নিজেই সম্ভবত শোনেনি।

এ ক্ষুধা বৈধব্যের অনেক শোকের পরের ক্ষুধা। এই সঙ্গে উর্দ্ধে উড়ার প্রথম ডানা ঝাপটানর তীব্রতা নিয়ে তার মনে উদয় হয়েছিল আর এক ছবি। সেই সাদা বাড়ি, মনে হল তাকে যেন বা তাড়া করে আসছে। ভয়ে সে জগদ্দল। তাহলে এটা খিদে নয়, এটা ভয়। তৎক্ষণাৎ শাজাদ কোন এক কাল্পনিক আক্রমণ থেকে, সত্যসত্যই নিজেকে সরিয়ে নিল। কে একজনা তাকে আঘাত করতে এসেছিল, সে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে। ভয়ে, হাত দুটি দেহের সঙ্গে আঠা হয়ে গিয়েছে। কুয়োতলের শীত মাকড়সা যেমত, গায়ে চলাফেরা করে। শাজাদ কাঁধে জড়ো-করা কাঁথা নামাতে গিয়ে, দৃঢ় হয়ে আবার উঠিয়ে রাখলে। তার চোয়াল যদি, অভ্যাসমত শক্ত না হত তাহলে সে মরতই নিশ্চয়। দাঁতে এখনও তার ঠোঁট কামড়ান, ট্যাঁক থেকে একটি দেশলাই এবং কানের পাশ থেকে আদপোড়া চুটা বার করে এখন দাঁতে চেপে ধরলে। দাঁত তার অযথা বেশী খেলছিল। চুটার ধোঁয়া গলায় যেতেই সে খুক করে কেশে উঠল। আদ-পোড়া চুটার ধ্বক ভারী বদরাগী, তথাপি তার বেশ আরাম লাগছিল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে সাহস ভরে চতুর্দ্দিকে চাইল। ইদানীং যে পৃথিবী আলমের —তার ঘোড়ার পায়ের তলায় ঝটিতি তা সাবালক হয়ে বিরাট বেইমান খাড়া ; পৃথিবীর থৈ নেই। সে ত্বরিতে চৌকিদারী গলায় 'হো-হো-হোই' দিলে ; জলজ্ পানার যেমত ভয় আবার ভেসে উঠেছিল।

আর ভয় হয়েছিল শাজাদের নটা-গোবিন্দপুরের চাঁদের আলোয় ড্যাঙ্গা দেখে, দিনে যা নিত্য-সবুজ। অজস্র তচনচ হয়ে থাকা হাড়পাঁজরা, হাওয়া এখানে লাট খায়, সোঁ-খিপ-খিক্ করে উঠে। এটি আধা ভাগাড়। শাজাদ এদিকে আর তাকাতে পারল না, ঘোড়ার উপর নিজেই দুলতে লাগল এমনভাবে যেন ঘোড়া ছুটছে খুব কদমে। অবশ্য অনেক পরে ঘোড়া ছুটল। আবার সেই সুড়ঙ্গ মলিন পথ।

ঘোড়সওয়ার জীবনে এই প্রথম ভাবতে চেষ্টা করলে, ভাবা তার কোনদিনই হয়নি। কত বিস্তর আকাল গেছে। ভাবনা তার কখনই হয়নি—মায়ের দয়া অথবা কূট গরম হলেও হয়নি। যা এ সকল ক্ষেত্রে করণীয় শাজাদ তাই নির্লিপ্তভাবে করেছে, গাছের মাথায় হলুদ ছোপান স্থাকড়ার নিশেন টানিয়ে

দিয়েছে। আর আর ভাবনা তা আকাশে যিনি আছেন তাকে অনায়াসে বকলমা দিয়েছে।

ঘোড়া মচকে মচকে চলেছে, শাজাদ দূর শতচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে চেয়ে, সে মনস্থ করে এই যে, আর পঞ্চাশ কদম পরে যদি পাকুড় অথবা শিমুল গাছ হয়, তাহলে 'ভূতে'র সঙ্গে কোন হুজ্জতহাঙ্গামা হবে না আর যদি আম বা মহুয়া হয় তাহলে ভারী খুনখারাবী হবে। 'খুনখারাবী' কথাটি মনে উঠতেই সে আপনার অজানিতে 'হো-হো-হোই' দিয়ে উঠে, গা তার রোমাঞ্চিত। ঘোড়ার কদম গোনা বারবার ভুল হয়। কতবার গাছ চেনা মিথ্যা হল। পুনর্ব্বার সে মনস্থ করেছিল।

খানিক পথ অতিক্রম করার পরই অতর্কিতে আলমকে দাঁড় করালে সে যেন-বা কিছু দেখতে পেলে। কান খাড়া করে রইল, এবার সে-ধ্বনি স্পষ্ট হল, এ তার রক্তের ধারা-স্রোতের ধ্বনি বটে, অসম্ভব দুর্দ্ধর্ষ গতি নিষ্ঠুর লাল। আপনার গায়ে সে আদরে হাত বুলাতে লাগল, সহসা সে-স্রোত চোখের সামনে, কে যেন ছোট ডোঙ্গা বেয়ে আসে। যাকে দেখতে পেলে, তাকে দেখে সে থমকে স্থির। এ যে তার বাপজান! এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা হয়ে ছিটকে গেছে, একারণে সে কম্পিত ত্রস্ত। শুধু মুখে আল্লা নাম। অপরিচিত সাদা আর কালোয় ব্যক্ত রুগ্ন মানুষের চোখ যেমত অথচ বীভৎস! ইতিমধ্যে ডোঙ্গা আরও কাছে এল, সত্যই তার বাপজান, সুন্দর দৃপ্ত মুখখানি তাঁর নড়ছে, কবরের ধূলা খসে খসে পড়ছে।

শাজাদ আর্ত্ত ভীত, চেঁচিয়ে উঠল 'বাজান বাজান'।

বাপজান চুপ, শুধু কবরের ধূলা ঝরার শব্দ। এবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শাজাদ তুই মাইয়ের দুধ খাস নাই'।

শাজাদ মুখখানি উঁচু করে গাছের মাথার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে।

'শাজাদ,' সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁপে উঠে শুনতে লাগল, 'তুই ডরাস, হেঃ তোর রক্তে আজ্ জিও আমি নাও বাইরে।'

এ কথার পর শাজাদ আরও ভাল করে তাঁকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখল পাতা পাতা আর চন্দ্রালোক। সে তারস্বরে হো হো করে বললে 'বাজান বাজান' তারপর মুখখানি নীচু করে শুধু বলেছিল 'আল্লা' এবং আপনার আঙুল ঘোড়ার কেশর মধ্যে চালাতে লাগল, মুখ তুলে অনেক অনেকবার সে চেয়ে দেখেছিল, কোথাও কিছু নেই। শুধু পাখীর অস্বস্তি, আর প্যাঁচার তিরিক্ষি ডাক। তার

দেহ নিশ্চয়ই কাঁপছিল, কেননা একদা তার মনে হয়েছিল কোথাও পালাই। নিজে এলোমেলোভাবে সে চেঁচিয়েও উঠেছিল। ঘোড়াকে ঠোক্কর দিয়ে সে বেসামাল হয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনমতে সে নিজেকে ঠিক দিলে।

ঘোড়া অল্প কদমে ছুটছে, মুখে তার শুধু 'বাজান' আর 'বাজান'। এক্ষণে আর এক দৃশ্যের সঞ্চার হল, অনেকক্ষণ পূর্ব্বের সন্ধ্যার কালো জলে, অমলি ডোমের সরবতি উরুৎ এখন হি হি করে উঠছে। তার সরম হল, ইচ্ছা হল এক দৌড়ে বাড়ি যাই, ফুলসন ফুলসন। এখন শাজাদ ঘোড়ার ঘাড়ে মাথাটি এলিয়ে দিয়েছে, চোখগুলি থেকে থেকে বড় হয়ে উঠে, মুখ কখন বা স্পষ্ট কখন আঁধার। কিসের আতিশয্যে সে বিদঘুটে হয়েছিল তা তার জানা ছিল, সহসা মধুর জলতরঙ্গের শব্দে তার কান তার ঘোড়ার কান এককালেই খাড়া হয়ে উঠল।

অনেক দূরে দুটি লালচে আলো, মধুর ঠুং ঠাং শব্দ, অদ্ভুত লয়ে পড়ছে, এই সঙ্গে খট্‌ খড়রর মৃদু আওয়াজ, ক্রমান্বয় অক্ষর হয়ে উঠছে। তার নিজের ঘোড়ার শ্লথ পায়ের শব্দ সেই মাধুর্য্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এখন উদ্ভাসিত হল, গাড়ীর আলোতে কালো উথলে-উঠা ঢেউ। জোনাকিগুলি ছিটকে আরও উঁচুতে, তৎ-সহ সেই বাজনা টহলদারের মন্দিরা যেমত ; ভেরোই চোখ এনে দেয়। শাজাদ এ সঙ্গীতে ক্ষণকাল কিছু ভুলেছিল। বালকের মত সে হাসল। পরক্ষণেই সে গম্ভীর হয়েছিল।

সম্মুখের অশ্বদ্বয় যেন কষ্টিপাথরে তৈয়ারী, তাদের কেশর ফেঁপে ফুলে উঠে গাড়ীর আলোকে ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে। চাকাগুলি ফিনফিনে। গাড়ী রুখে দাঁড়াল এ কারণে যে, এই রাস্তার একপাশে, চাঁদের আলোতে স্পষ্টই প্রতীয়মান, যে ধ্বসে গিয়ে গড্‌ঢায় পরিণত হয়েছে আর সেখানে অন্ধকার বোঝাই। গাড়ীর আলোতে তা ভয়ঙ্কর। গাড়ী রুখে দাঁড়াতেই, লাজুক গানের কলি ভেসে এল, ঘোড়াদুটি এখন টগবগ। কচুয়ান হাঁকল 'এই ঘোড়াওয়ালা নীচুসে উৎরো, নীচুমে'।

শাজাদ এতাবৎ চমৎকার চোখে ঘোড়াদুটিকে দেখছিল। লোকটির কথায় ত্রস্ত এবং পরক্ষণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, ভীষণ জোরে বাবুই দড়ির লাগাম কষে ধরল, হাত তার জ্বলে গেল তবু হাত তার দড়িতে কামড় দিয়েছিল। সকল চোয়ালে খেলতে লাগল। এবং মুখ তুলে তাকাল, গাড়ীর উপরে, আলোতে দেখা যায় তাসের ছবির মত পোশাকপরা একটি লোক, পাশে আর একজন। শাজাদ তাদের দিকে একটি চোখ ইচ্ছে করেই ছোট করে বললে, 'আঃ হো

তুমার মর্জ্জি হয় তুমি লাম্ না কেনে ?' গলার স্বরে নিজেই কেঁপে উঠেছিল।

ঘোড়াদুটি এখন টগবগে, তাদের খুরের আওয়াজ ভেদ করে ক্রহামে আসীন সকলকেই, শাজাদের কণ্ঠস্বর, চাপকে চঞ্চল করে তুলেছিল। গাড়ীতে এক টুকরো শুবনাম মসলিন পড়ে ছিল, তিনি নাতিহুজুর। তিনি সান্ধ্যভ্রমণে বার হয়েছিলেন, সঙ্গে দুইজন সঙ্গিনী, একটি তার ইহুদী মেয়েমানুষ, অন্যটি বাইজী —যার গান শোনা যাচ্ছিল। এছাড়া বাবুর সামনের আসনে, তাঁর পেয়ারের মোসায়েব ভব, তার পাশে সারেঙ্গীবাদক, এবং ঠিক তার পাশে নায়েব বনবিহারী মাথায় কম্ফর্টার জড়ান (এখন ফাল্গুন মাস) এ গাড়ীর পিছনে আর একটি ট্রটিং তাতে খান্ত মন্ত পাইক বেহারা ঠাসা।

হুজুর মোহনগোপাল এমত কণ্ঠস্বরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁর ঘোর একটু ফরসা হয়েছিল। জিব নেড়ে কিছু বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসে আবার চেষ্টা করে বললেন 'ভব টর্চ্চ'।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ভব নায়েবের শরীরের উপর দিয়ে নিজের দেহ আঁকাবাঁকা করে টর্চ্চটা ফেললে। আলো লম্বা হয়ে পড়ল, পড়েছিল কঠিন একগুঁয়ে একটি মুখের উপর, এবং তা ব্যতীত আরও দূরে। হুজুর কোনরকমে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটা কে ?'

নায়েব বুঝেছিল এ হুকুম তাকে করা হয়েছে, ফলে তৎক্ষণাৎ দুই হাতে গাড়ীর মলম ধরে মুখটা বার করে ঠাওর করবার চেষ্টা করলে, নায়েবের দেহে টর্চ্চ আড়াল পড়েছিল সুতরাং ভব আরও হাতটি বাড়িয়ে টর্চ্চ ঘুরিয়ে ধরেছিল। নায়েব দেখল, গামছার ফেট্টির তলায় জলজ্বলে দুটি চোখ, এইমাত্র মুখখানি টর্চ্চের আলো থেকে চোখ সরিয়ে নিল। এবার আর একবার সে বিরক্তিত মুখখানি আলোর দিকে ফিরাল, তার কপিশ চোখদুটি নায়েবের মুখে গিয়ে লাগল।

শাজাদ আর সময়ক্ষেপ করলে না। কেবলমাত্র একবার বিরাট কালো জানোয়ার দুটির দিকে তাকাল, তারপর আস্তে ক্রমে ঘোড়াগুলির পাশ কাটিয়ে যতই এগিয়ে আসে নায়েবের মুখ সেই অনুপাতে গাড়ীর মধ্যে সরে সরে যায়। নায়েব এখন একেবারে নিজের আসনে স্থির। শাজাদ গাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় অতি ভদ্রভাবেই টর্চ্চটা সরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে। ভবতারণের হাতও ঘুরেছিল এবং এতে করে দেখা গেল অত্যন্ত সুন্দর একটি মুখমণ্ডল, পার্শ্ববর্ত্তিনী ইহুদী মহিলার থেকেও রঙ অনেক গৌর। মাথায় সেই পাতাকাটা তেড়ি,

অবশেষে আর একটি স্ত্রীলোক যার নাকের নথ অতি সূক্ষ্ম চুড়ির মতন। মন-জুড়ানো ফরাসী আতরের (?) গন্ধে স্থানটি উদ্বেলিত অথচ কেমন যেন তা জংলী পাশবিক! শাজাদ পার হয়ে গেল। এখন সে বেশ দূরে গেছে।

হুজুর হঠাৎ রেগে বললেন, 'এই ইস্টুপিড টর্চ্চ হাটা'। টর্চ্চ সরে গেল তিনি আবার প্রশ্ন করলেন 'কে ও?'

নায়েবমশাই যে কিভাবে শুরু করবে তার ধাঁচ ঠিক করতে পারেনি, কম্ফর্টারে একটু ঠিক দিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হুজুর ও বেটা রুনুখগাঁয়ের শাজাদ।'

'রুনুখগাঁ আগে বলেন নি কেন?'

'জ্ঞে...' কি বলা উচিত ঠিক ভেবে না পেয়ে বললে, 'বেটা ভারী বদমাস্ খুনে ডাকাত...'

'খুনে ডাকাত...তা আগে...এই গাড়ী ঘুমাও,' হুজুরের কথা যদিও জড়ান তথাপি তিনি যে রয়ে রয়ে জোর দিয়ে বলেছিলেন একথা সকলেই বুঝেছিল। নায়েব তটস্থ, সকলেই বিব্রত।

'ঘুমাও গাড়ী...'

'এই ঘুমাও গাড়ী' বলেই ভব বললে, 'কিন্তু ও ত ধানক্ষেতে নেমে গেল।'

'গাঁ জ্বালিয়ে দেব'

'বাবু হুজুর, ও যদি জানত যে খোদ মালিক হুজুর গাড়ীতে আছেন তাহলে ই হে হে...'

'হা তা বটে, খোদ মালিক যদি...ওর তো আর পাঁচটা বাপ নয়...'

ইতিমধ্যে ইহুদী মেয়েমানুষটি বাবুহুজুরকে ছোট একটি গেলাসে পানীয় দিলে। মোহনগোপাল গেলাসটি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলেছিলেন। একথা ঠিক যে তাঁর, এহেন ব্যাপারটা গায়ে লেগেছিল, আর যে তিনি জখম হয়েছিলেন। মদের ঝোঁকে এক একবার তাঁর স্মরণে আসছিল, কিন্তু এখন কোন কিছুই করবার নেই। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ও বুঝতে পারেনি আমি আছি?'

নায়েব আর ভব সমস্বরে বলেছিল '...আজ্ঞে না না, জানলে, কখনও...হ্যাঁ' —এরপর নায়েব একই কথা একাই বললে। এবং আর একটু দম্ভ প্রকাশ—'হি আর কিছু বেগোড় করলে আমি জুতিয়ে...হেঁ,' বলেই ভীত হল, কম্ফর্টার ঠিক করলে।

'কালই ওদের ডেকে পাঠান।'

'হ্যা হুজুর, কালই' বলে নায়েবের ভারী অস্বস্তি হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল রুহুখগাঁ অতি কোড়, তারা আসবে কি ?

গাড়ী চলেছে মোহনগোপাল তাঁর হাতের হীরে-আংটির দিকে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। মনে রাগ নয় ক্ষোভ নয় অন্য কোন কিছু ছটফট করছিল ; এক চুমুকে ব্রাণ্ডি শেষ করার জন্য কপালে চোখের আশেপাশে সর্ব্বত্র ঘাম, কোঁচার খুঁপি দিয়ে মুখ থুবলেন। এবং বললে, 'ভবাই, মদ।'

হুজুর মোহনগোপাল, যথাযথ হুজুর আজ কয়েকদিন। সুতরাং প্রজাসাধারণের যে হঠকারিতায় পাগল হবার মত মন এখন তৈরী হয়নি,— অবশ্য একথা বলা প্রয়োজন যে, কিছু একটা বেগোড়, চুন খসলেই যে ঝটিতি ক্ষেপে উঠবে এমন অবস্থা হয়নি। এ কারণে যে মাত্র দু-দিন অথবা তিন দিন হয়, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নিজে অতীব প্রাচীন। বড় প্রাচীন। খুব আশ্চর্য্যও হয়েছিলেন, যেক্ষণে তিনি জানতে পারলেন, নিরবধি কাল তিনি জীবিত। আপনার অভ্যন্তরে কে একজনা ভারী চোখ তুলে বারবার চাইতে চেষ্টা করছিল। আর সামনেই রতি পাইক কত কথা বলছিল।

তখন সম্মুখে লতাপাতার বাট করা আয়নায় আপনার চেহারা দেখবার চেষ্টা করলেন, দুটি চোখ জলজল করে উঠেছিল। খাঁড়ার খোদাই করা চোখের থেকে এ চোখ দুটি অতীব অঘোরচারী। শরীর এ মুহূর্ত্তে ছিল না, মোরগের মত মুখটা এপাশ করলেন। একটির পর একটি দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে সংঘাত হল। ওপাশে মেহেগনির উপর, চালাসীর (চেলজি) পুতুল নৃত্যরত ; কখন বা ফরাসী ঘড়ি সোনায়,— দারুণ ষাঁড়ের উপর আলুলায়িত বসনে মেয়েটি সময় ধরে বসে। তালদার বাতিদানের রূপার দণ্ডে ফুলকারী করা। কভু বা ভিনিসীয় কাচের পাত্রের আয়তলোচনা মাতৃমূর্ত্তিতে। অথবা এবার ঊর্দ্ধে।

উলঙ্গ সুন্দর বারোক সৌখীনতা, মোহনগোপাল এখানেই স্থির ছিল, এখন ছিল। ভাল করে লোকটির দিকে একবার চাইলেন। এবং একবার প্রশ্ন করে ছিলেন 'তোরা কি জাত ?'

'বাউরী'

হাতের ছোট পুতুলটির দিকে চেয়েছিলেন, পুতুলের মুখের কাব্যধর্ম্মী সরলতা তাঁকে বেশীক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখতে পারেনি। সহসা তাঁর, এক ফাঁকে, মনে

হয়েছিল এই পুতুলটি কেনার কথা। কোন এক ধনী বেনেবাড়ির ছেলে, তখন প্রায় খড়ি-কাপ্তেন, আধো গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে পুতুল দেখাল, মোহনগোপাল তাঁকে শ-পাঁচেক টাকা দিতেই সে চলে গেল। মোহনগোপাল আস্তে আস্তে পুতুলটি দেখেছিলেন, এক তিলের মধ্যে এত সৌন্দর্য্য জগতে অনেক আছে, এটি আরখানি। তিনি গভীরভাবে পুতুলের ঠোঁটে চুম্বন করেছিলেন। তাঁর ঠোঁট পুতুলের ঠোঁট ছাড়িয়ে শূন্যতায় স্তব্ধ হয়েছিল। তিনি সূক্ষ্ম হতে পারেন নি। এখন আবার হেসে সম্মুখের লোকটির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'মুচি নোস তো ?'

'মুচি কেনে'···হুজুরের সরলতায় সে হেসেছিল।

হুজুর মোহনগোপালের মুচি মনে হওয়ার কারণ এই যে, লোকটি এতাবৎ যে কথা বা গল্প বলেছিল সেগুলিতে পচা গলিত দেহের গন্ধ। সে অনর্গল বলে গিয়েছিল, আবার শুরু করলে, 'আমায় দশ ঘা জুতা মারুন হুজুর, যদি মিছাই কিছু বলি, দেখন হুজুর আপনার নুন খাই— গা আমার জরা, ফাটা ফাটা দশ গাঁ ফেলে এলাম, এ কেমন কথা আপনার নাম কেউ জানল না, পাঁছুরী মৌজার কুয়োতলা বসি কাঁদলাম, আমার মনিবের লাতি গো তাকে চিনল না, তারপর ভাবলাম না চেনা দিলে হে চিনবে কেমনে···?' তার বলার ভঙ্গীতে কেমন নাচের ভঙ্গিমা ছিল। মাঝে মাঝে হাঁটু ভাঙে, কভু শূন্যে হাত আছড়ায়। এই লোকটি রতে পাইক। চোখে তার মনসাপাতার কাজল।

মোহনগোপাল শুধু এইটুকু ভেবেছিলেন, তা কি করা যাবে। এবং বুড়ো রতিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'কি করে চিনবে'।

'চিনবে মানে, উয়াদের কাঁকের মাইধরা ছানা পর্য্যন্তকে টুঁটি ধরি আনব তোমায় আপনাকে চিনাতে গো···রাজা চিনবি না রাস্তা চিনবি না···'

'হুঃ'

'হুঃ কি বাবু···বহুত দিন নুন খাইলাম, তাদের তাদের অখণ্ড পরমায়ু, আজও যিনি আপনার মধ্যে ভোগ দখল করে গো' বলে লাঠিশুদ্ধ কান ধরে কুর্নিশ মত করলে। এবং বললে 'তাদের কি প্রেতাপ ছিল, ভয়ে তারসে লোকে কাপড়ে-চোপড়ে হত, প্রজাখাতক কি কথা এক সায়েব লালমুখো সদরঅলা, রাজার সঙ্গে বখেড়া করলে, সাহেব হাঁসিল হল, তার লালমুখোর অখণ্ড দোষ বল্লেক, তুমার রাজাকে আমি চিনি না, ব্যস খতম' বলেই বেসাট দাঁতগুলো বার করে হাসল। 'লাস তলাসী হল না কাক-শেয়ালে বহুত রক্ত খেলে, ওতলো

চৌকিদার খানিক রক্তমাখা মাটি নিয়ে দেখালে…'

'আঃ থাম থাম'

'আমি মিছাই বলি না হুজুর, হাঁ, দোরতণ্ড ছিলেন গো, বুনেদী কত বড় ঘর… কি হাঁকডাক!'

হুজুর মোহনগোপাল বুড়োর কাছ থেকে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন, সনাতন যেখানে বসে বন্দুক সাফ করছিল, দ্রুতপদে হল ছেড়ে সেখানে, এটা ডাক-বারান্দা; একপাশে পাথরের টেবিলে, লম্বা বাক্সর ডালা খোলা, লাল বালতি হা হা করে আছে। দামী সুন্দর বন্দুকটি এক্ষন ঘাট পরান হয়েছে, হঠাৎ বাবু-হুজুর বন্দুকটাকে তুলে নিলেন। নল কাঁপে বসতেই খাক্ করে শব্দ হল। তিনি বললেন 'ভব, গেলাস দিতে বল,' বলে গলার চেনহারটি একটি আঙুল দিয়ে কেবলমাত্র আলগা দিলেন।

অভিজাত গৌরবের প্রতি একথা সত্য তার লোভ ছিল। আকর্ষণ ছিল। কেননা যেহেতু আবাল্য তিনি সাহসের নামে অনেক নীচ গল্প শুনেছেন। ছেলেবেলায়, এইরূপ একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী লোককে সর্ব্বসময়ে খাটে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। অভিজাত গৌরবের মধ্যে একটি রূপার গেলাস, আর একমাত্র প্রজা হিসাবে একটি বিড়াল। তারপর তাঁর পিতা অল্প বয়সে বেশ্যালয়ে ভবলীলা সম্বরণ করেন। এবং তাঁরা দুই-তিনটি প্রাণী আশা পোষণ করেছিলেন, পুনর্ব্বার জমিদারী ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এবং মোহনগোপাল অবশেষে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কোন নীচ কাজ নেই যে তাকে করতে হয়নি, আর পাঁচটা প্রভূত ধনশালী যে পথে টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনিও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এখন তিনি এখানে, রাঘবপুরে, সমস্ত প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্ত নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর। সুতরাং রতে পাইকের কথা কেমন কেমন লাগলেও এ তার মনের কথা। কেননা এখানে এসেই প্রথম দিনেই তিনি কয়েদখানাটি পরিদর্শন করেছিলেন।

ব্রাণ্ডি গ্লাসটি হাতে নিয়ে মোহনগোপাল বারান্দা ছেড়ে, হলে এসে চারদিকে কি যেন তাঁর চোখ খুঁজেছিল। পরে, একটি ললিতসুন্দর চেয়ারের হাতলে বসে পিঠদানে হাতের উপর হাত রেখে মাথাটি ন্যস্ত করে বেশ কিছুকাল তাঁর কেটেছে, কখন তাঁর চোরা চাহনি এ সকল সৌন্দর্য্যের দিকে মানুষ যখন মানুষকে ভালবেসেছিল তার নিদর্শনের দিকে ঘুরেফিরে। কিন্তু দরজার আলো আটকে রতে পাইক এখন হাঁটু ভেঙে মহা উল্লাসে কি যেন বলছিল।

ক্রমে গোলাপের স্বাদ এ সকল কিছুর মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হল। রতে পাইককে হুজুর আর ছাড়লেন না। কেননা যেহেতু প্রজাশাসনের রীতি, চৌধুরীদের দর্পের কথা সে অনেক, অনেক জানে। নাতিহুজুর মোহনগোপালকে অতিসহজেই তার বংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার যত কিছু পথ আছে তার নিশানা সে দিতে পারে। রাত্রে মদ যখন মেয়েমানুষ হয়ে যায় সেইকালে তাঁকে জাগিয়ে রাখবে ইত্যাকার বিষধর গল্প কথা।

সেইদিন রাত্রেই তাঁর রূপান্তর ঘটল; শুধু মনে হল, আমি অতীব অতীতের মাংসপিণ্ডের আর একজন। ক্রমে হৃদয়ের স্থানে পেট এসে দেখা দিলে, দাঁত তাঁর ভাবপ্রবণতা, নখে ক্ষুরধার হয়েছিল ভালবাসা। রতে পাইকের মুখে আলো ঠিকরে পড়েছে, আলোর অস্থিরতা রতির মুখখানাকে নিড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বার-বার। 'ও ভজা লাপতে, কি কপাল লোকটার গো, জগা-তারা রুইদাস তার ফোঁড় কেটেছিল; কারণ জগার বউ লাপতের সঙ্গে নষ্ট ছিল! ব্যঁস, কাল হল রাজাহুজুর তার আঙুল কেটে দিলেক!'

এরপর হুজুরের ঘুম কোথায়? ঘুম সে তো রোমক সভ্যতার বাটালির যে অনায়াসে মাংসের উপর, মনের উপর, অনৈসর্গিক আলো খেলিয়ে দিয়ে থাকে। যাতে করে সৃষ্টি আরবার, শিশু যেমত, সেইরূপ মাই খোঁজে। ঘুম নেই, ওডি-কোলনের ঝারি আর ফলদায়িনী নয়, শুধুমাত্র তিনি ইসলামীয় টিউলিপ অঙ্কিত ভিনিসীয় ঝারির দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকেন। রূপার বাতিদান বিচ্ছুরিত আলোয় ঝারির তলায় তরলতায় আশ্চর্য্য সৃষ্টি করে, পূর্ব্বে হলে হয়ত মোহন-গোপাল ভাবত, ওখানে যেন অনেক মৎস্যকন্যা! কিন্তু এতে ইদানীং কোন বংশগৌরব নাই, মাথায় কোলনের জল, উপরে টানাপাখায় গোলাপসুন্দরী আঁকা হুসহুস করে যায় আসে। এতেক বৈভব, সুদীর্ঘ সৌন্দর্য্য ঘুড়ি ধাইয়ের গল্পের কাছে ম্লান। ঘুড়ি ধাই, দশ বিশ মৌজায় লাট খেয়ে ফিরত তাই তার নাম, ঘুড়ি কোন এক কাতরান মেয়ের নাড়ি কাটতে গিয়েছিল— তাকে ছেলে দিইয়ে লেখিয়ে···ছেলে বিয়োন করালে···হুজুরের রক্তের স্রোতে ভোদড় উঠা-নামা করেছে, অধিকন্তু একথা সত্য যে শঙ্কর মাছের রূপা বাঁধান চাবুক, জুতো বা লাথিঝাঁটার কি ঘুম হয়!

খোলা ছাদে, এ ছাদের একপাশে দেওয়াল তোলা, সেখানে অনেক কোন এক অতি সভ্যতার সাধনার মাধুর্য্য-মূর্ত্তি। চাঁদের আলোয়, এক্ষণে রসিলা হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের ছায়া চিবুকে বিস্তৃত! এতে করে মনে হয়, কাল তথা

সময় দীনতম দীনের মতই এ-বাড়ির নিচের তলায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় অপেক্ষমাণ।

আরামকেদারায় ফুলের ছায়া-করা মখমলের উপর মোহনগোপাল তাঁর মুখখানি ঘষলেন, সেখানে হিম ছিল। নিকটে কার্পেটে তাঁর মেয়েমানুষরা ছিট্‌কে পড়ে ঘুমায়, বাইজীরা ঘুমে কাতর তথা মদে অচেতন। অদূরে বেহারারা ঢুলছে, পড়ছে। তিনি একাই জাগ্রত। কোনক্রমে বেসামাল পায় মোহনগোপাল ছাদের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গেলেন, কার্নিশের উপরে একটি পা তুলে দাঁড়িয়ে, তাকালেন, কার্পেটে এক ঝলক স্মৃতি; ওপাশে স্থিতিবান শাশ্বত মূর্ত্তিনিচয়, আর পিছনে পোড়া পৃথিবী! সম্মুখে দুপুরের লাল সই দূরত্ব এখন আঁশখোয়া ধোঁয়াটে! তিনি একপাশের ঠোঁট ফাঁক করে বললেন, 'সব আমার — যা খুশি...'

অপ্রকৃত ঘুম, তথাপি জয়পুরী নাচওয়ালী, আগ্রাওয়ালী মেহেরউন্নিসার পা লেগে সোডার বোতল গড়িয়ে, ঘুঙুরের আওয়াজ আর রয়ে রয়ে সোডার বোতলের গুলি ছিপি গুলগুল করে উঠেছিল। হুজুর ঘুরে দাঁড়ালেন। যা কিছু চিকন, যা কিছু ফুরফুরে তা হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। মোহনগোপাল নিজের মুঠো খুলে কি যেন দেখতে চাইলেন; বহুক্ষণ আগে এই দিগন্তকে পিছনে রেখে ঘুরে ঘুরে নাচছিল, বেহাগের লহেরা নিপট, ধানীও লাট লাট খেয়েছিল। মেহেরউন্নিসা হোঁদলা ভেড়ুয়াকে দেখে তিনি কেমন যেন ভীত হয়েছিলেন, ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে ভেড়ুয়াকে ধরতে গিয়ে মেহেরকে ধরে ফেলেন। মেহের আই আই করে খানিক কুকুর কাঁদুনি দিয়ে সোহাগ কামড় দিয়েছিল হুজুরের হাতে, সে-কামড়টিকে বারবার খুঁজেছিলেন।

সত্যিই তিনি কি খুঁজেছিলেন? হয়ত না। মদ ইদানীং তাকে আরও জাগ্রত করেছে, মদের রীতি তা না হলেও ধর্ম্ম তাই; আর তাই যদি তবে তিনি অদ্ভুতভাবেই জাগ্রত। মোহনগোপাল সঙ্কল্প করেছেন হাওয়াকে দেখবই। দূর প্রাচীন অতীতের অমোঘ পাথুরে দেওয়ালে ক্রমাগত ঢুঁ মেরে চলেছেন অতীত আমার চাই, সাক্ষাৎ অতীত। ফলে অতি সহজেই তাঁর নিজের ভিতরে একটি হাঁকপাঁক ঢুকে পড়েছে, অতিকায় গোঁয়ার মাংসপিণ্ডবৎ দিন রাত এইটুকু মাত্র বিচার, কোন উষ্ণতা নেই।

খাঁচা ভাঙার পক্ষাঘাত আনে না। নানাবিধ মুখচোরা লাজুক সৌন্দর্য্য তাঁর কাছে নামমাত্র হয়েছিল, তাই এখন যখন তিনি সাহস করে অথবা অসাবধানতা বশত, মূর্ত্তিগুলির দিকে তাকালেন, দেখলেন, পরীগুলি অসম্ভব জীবন্ত। চন্দ্রা-

লাকে নাতিসবুজ, এ পাথরের মায়া যেন বা তাঁর রক্তকে সত্যই লাল করে দিয়ে মনের মধ্যে শিশুর পরাধীনতা এনে দিতে চাইছে। ক্রমাগতই তাঁকেই কোন এক স্বপ্নলোকের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি যেন কোথায়— টিট ঘাড়া রক্ষার উপর দাঁড়িয়ে। একবার তাঁর মনে হয়েছিল এক ঝটকায় এ সকল রলতাকে তিনি তছনছ করে দিতে পারেন। উত্তেজনায় মোহনগোপাল এখন াঙ্কর মাছের চাবুক অথবা ছেঁড়া জুতা।

পরক্ষণেই তিনি যেন শুনতে পেলেন, অগণন মৌজা মহাল থেকে, এই বিরাট লাক চরাচর গরুড়ের মত করজোড়ে প্রভু প্রভু বলে উঠেছে। অদূরবর্ত্তী কয়েদ-ানা থেকেও প্রাণান্ত আর্ত্তনাদ। সকলের বুকে তাঁর নাম— এরা কারা যাদের মরে না ফেললে জীবিত ছিল বলে লেখা যায় না। মোহনগোপাল জানত া, ভয়ঙ্কর হওয়ার মধ্যে এমন এক মেজাজী আনন্দ আছে। সহজ মানুষের াত উঠেই তিনি বন্দুকটা তুলে নিয়েই, ভবকে দেখতে চেষ্টা করলেন। ভব উপুড় হয়ে শুয়েছিল, কাপড় তার এলোমেলো, সেখানেই এক লাথি মারতে ভব উঠে কাপড় সামলে, চোখ কচলাতে লাগল। ভব চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলে, সামনে বন্দুকের নল, বোকার মত সরিয়ে দিতে গিয়ে শুনল তিনি কিছু বলছেন।

ভব নল দেখে ভয় পেয়েছিল। কারণ তখনও আলো দেওয়া হয়নি। মোহন-গোপাল বন্দুক নিয়ে তাকে তাড়া করেছিল। বাইজী গান থামিয়ে চুপ। ভব লঘরে ঢুকেছিল, হুজুরও এসে পড়লেন। একটি আয়নায় সহসা প্রতিফলিত ভবকে গুলি মেরেছিলেন, তারপর এক অট্টহাস্য। সেই থেকে ভব ভয়ে ভয়ে আছে। তবু এখন সাহস করে সে বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে, তাঁকে শুইয়ে দিতে গেল।

টিলার উপর দিয়ে আলো অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে, কুসুমের শীতলতা আর নেই, এখন থাক। তবু বেলেরাস্তা এখনও তপ্ত নয়। এমত সময়ে গেট পার হয়ে নাতিদীর্ঘ একটি ভীড় ক্রমে এই বিরাট বিরাট থামওয়ালা তিন-চার গাড়ী দাঁড়ানর মত প্রশস্ত গাড়ীবারান্দায় এসে ঠেক খেলে। নিমাই হেলের ছেলেটি মাথা উঁচু করে 'হোউ' বলে উঠেই নীচু করে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি সহকারে হাসতে লাগল, এর পূর্ব্বেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি হয়েছিল। যারা যারা বয়সী তারা তাকে তাড়া দিয়েছিল।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই, চটির ফটফট আওয়াজ শোনা গেল। এবং দেখা গেল

নায়েব যে কষি বাঁধতে আঁটতে, এসে উপস্থিত, একগাদা অভিবাদনের হাসি উপর দিয়ে নজর চালিয়ে নিজের কাঁধ মচকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঠিক করে বললেন 'কোন্ হারামজাদা রে?' বলেই দাঁতের ফাঁকে কি যেন আটকেছে, সেটাকে ছিক্‌ছিক শব্দ করে অদ্ভুতভাবে টানতে থাকলেন। সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ছিলেন, 'হুজুর সবে উঠলেন, (বেলা এগারোটা) চাম তুলে লিবে…'

ইয়াসিন কার যেন কানে কানে বলেছিল, 'জাতে মুচি নাকি…'

নিমাই হেলের ছেলেটি বাপের নিকটে কাছ-ঘেঁষে আপনকার মাথায় হাত দুটি স্থাপন করতঃ দাঁড়াল। কিয়ৎক্ষণ চুপ, শুধুমাত্র পায়রা শব্দের বোল পড়া নির্দ্দয় হয়ে উঠেছিল। পুনশ্চ নায়েব বললে, 'কুথাকার গেছ পাথুরে, বেহুড়ুকে (হোড়া মানুষ) গাঁ-মৌজা উজাড় করি আনছিস হে, কুকুরটাও লিয়ে এসছিস হে…'

রববানি কানের মধ্যে কড়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে ঝাঁকি দিতে দিতে বললে—'ই কি গো, ছেইলা ছানা রাজদর্শন করবে বটে গো, তাই লিয়ে এলাম হে কাঙাল মানুষ রাজা দেখি নাই— রাজা দেখুক।'

রাম সম্ভবত, একথা বলেছিল যে, 'তুমি ত বুললে সব্বাইকে লিয়ে আসতে এখন…' রামের মত নিশ্চয় আর সকলেরই নায়েবের ব্যবহার বেশ অবাক লেগেছিল। গতকল্য সন্ধ্যার ব্যবহারে একটু হাত-কচলান ভাব ছিল।

রামের কথার উত্তর দেবার মত মন নায়েবের ছিল না, যেহেতু রববানির জবাব তার কাছে খুব লাগসই বলে মনে হয় এ কারণে যে এ সকল কথা সে নায়েব হুজুরকে বলতে পারবে এবং হুজুর এহেন কথায় বড় তুষ্ট হবেন। নায়েব বললে, 'লে তুরা বস, এখনই হুজুর লামবেন…হাঁ হাঁ চুটাফুটা খাস্ নাই ই ঠাঁইকে… সহবৎ সম্ভ্রম দেখাস…' বলেই চলে গেলেন, কেননা বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ানর মত তাঁর জোর ছিল না।

এখানে এইভাবে ভুঁয়ে বসাটা যদিচ খুঁতখুঁতে ব্যাপার, তথাপি বসতেই হল। যেহেতু সকলেই শলাপরামর্শ করে এসেছে, মনে সকলেই ভেবেছিল হাঙ্গামা আটকাতেই হবে, কার সময় সুযোগ পালটেছে। শাজাদ সেদিন কারো কথা কাউকে ভাঙেনি।

শাজাদ খুদাতালার নাম স্মরণ করেই এসেছে, আসবে না এমন ত হতে পারে না। এই বোধ হয় প্রথম রুহুখগাঁয়ের লোক রাঘবপুরের তলবে এল। এখানে ছাগল-গরু চরাতে অনেকবার এসেছে, কিন্তু এইভাবে কখনও আসেনি। সত্যই

তাহলে প্রমাণ হয় যে রুসুখগাঁ কমজোরই হয়েছে। একথা বড় দুঃখের বটে। রুসুখগাঁয়ের রোগাপাতলা তগড়া মিলিয়ে জন পঞ্চাশেক যারা এসেছে তাদের মুখে একই ভাব ; এদের চোয়াল যেন নেই, চোখ ছোটবড় হবে না। সকলেই চুপচাপ করে বসে, গুনগুনানি যদি একটু বড় হয় তৎক্ষণাৎ একে অন্য গায়ককে 'হিঃ রে' বলে চোখ মটকে ধমক দেয় অবশ্য দু-এক দানা রস-রগড়ের কথা হয়েছে, এ ওর কানে ফিসফিস করেই বলেছে। কোন কোন শ্রোতার কাঁধে বক্তার দাড়ি লাগার জন্য, সুড়সুড়ি খেলে গিয়েছিল। শব্দ করে কেউ হাসেনি, অট্টহাস্যের মূক অভিনয় করেছিল। এক-একটা হাঁ যেন কলে খুলে নিভে যায়।

রববানিকে ইয়াসিন একটা ঢিল দিয়ে মাটি আঁচড় কাটতে কাটতে বলেছিল, 'চাচা তুমি বলেছিলে, রাজবাড়ি এলেই আগে চিঁড়ে গুড় দেয়, লাস্তাপানি দেয়— সে কেমন জলপান গো? লায়েব যেমনি দিলেক? সেই রকম না ধরে খেও মা?' ইয়াসিনের গলা জোর হয়েছিল। ফলে অনেকগুলি রেখাঙ্কিত অট্টহাস্য দেখা গেল।

এমত সময়ে সিঁড়ির উপরে দরজার কাঁচে কে যেন প্রতীয়মান। সাদাটে লতা-পাতার কেয়ারি করা লম্বা কাঁচের সার্শিতে একটি মুখমণ্ডল, এবং তার রেশমের চীনে কোটের অনেকটা অংশ। এই দরজার কিছু দূরে একটি বন্ধ খড়খড়ি হঠাৎ বন্ধ হল, সেখানে ছিল মোসায়েব ভব, সে বোধ হয় ইয়াসিনের মন্তব্যের কিছুটা শুনেছিল। তাকেও সার্শিতে দেখা গেল, হুজুরের ভ্রূদ্বয় কুঁচকে উঠল। তিনি নায়েবকে কি যেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। প্রশ্নকালে তাঁর মুখ ছিল নায়েবের দিকে, এবং আঙুল এদের দিকে সেই সময় উঁচান ছিল।

হুজুরের রাগতভাব, বেশী আঙুল চালাতে গিয়ে সার্শিতে অসাবধানতাবশত লেগেছিল, ফলে একবার আঙুলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন কিছু দেননি…'

নায়েব অতিমাত্রায় ভীত স্বরে বললে, 'জ্ঞে ভাঁড়ারীকে বলিনি, কারণ এরা ত ঠিক আমাদের প্রজা নয়।' একথা নায়েব বুদ্ধি করেই বলেছিল, যেহেতু এতেক লোকদের চিঁড়া যোগান দেওয়ার মত ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

'থামুন,' বলেই বলে ফেললেন, 'হোক না হোক' অর্থাৎ ভাবটা এই যে আমি একজন বিরাট কিছু, রাজা। আর অন্য কোন অর্থে নয়। কিন্তু এই কথার পরই নায়েবের ধৃষ্ট উত্তর তাঁর কানে বাজল। বললেন 'প্রজা নয় মানে?' যেন তিনি কামড়াতে প্রস্তুত।

'জ্ঞে, জ্ঞে, হুজুর, ওরা হুজুর…'

'ওরা হুজুর মানে আমার প্রজা… মানতেই হবে' বলেই চুপ করে থেকে কিয়ৎ-ক্ষণ কিছু যেমন বা ভেবেছিলেন, ভাবলেন তাঁর বলা উচিত ছিল, 'ওদের চৌদ্দপুরুষ মানবে' অন্তত ইত্যাকার উক্তিতে তাঁর বনেদিয়ানা স্পষ্টতর হত নিজের কাছে ত বটেই, অধিকন্তু সমবেত সকলের কাছে। এরপর তিনি বললেন, 'মানাতে না জানলে কেউ মানে না' বলেই দরজা খুলতে হুকুম করলেন।

দরজাটা কিছু শব্দ করত খুলে গেল। সম্মুখে হুজুর এবং তার পিছনে রূপকথার ঐশ্বর্য্য। হলঘরের খানিক দেখা যায়। বেহারারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটি রাজসিক চেয়ার এনেছিল, পাদানি এনে দিল, প্রকাণ্ড পাখা এল। সমবেত জনমণ্ডলী যারা এতাবৎ মাটিতে বসে ছিল তারা একে একে উঠে দাঁড়াল (সার্শির পিছনে আবির্ভাবের সময় কেউ ওঠেনি)। ইয়াসিন উঠতে গিয়ে তার কাঁধের ছেঁড়া নেতাটা (গামছা) পড়ে যাচ্ছিল। কে একজনা নাক ঝাড়তে গিয়ে স্থির হল। শুধুমাত্র শাজাদ দেহের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত উদ্ধত ভঙ্গি জোর করে খাড়া রেখেছিল, কেননা তার পেটে বুকে শীত চলে ফিরে, সে তার আপনার বাঁ হাতখানি কোমরে স্থগিত রেখেছিল।

পরীর মত মুখখানি দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্, তারা 'পৃতিমা' তারা 'যাত্রার রানী' বলে তাঁকে ধরেছিল। কথঞ্চিৎ ঘোর কাটার পর, ছোট ছোট কুর্নিশ – কিছু গড় (আভূমি নয়) চঞ্চল হয়ে উঠল। হুজুর দয়াপরবশ হয়ে তাদের দিকে আবির নয়নে দেখেছিলেন। হসহস করে হাতপাখা আসে যায় ফলে কিছু লোক যখন দেখে, অন্যেরা তখন বঞ্চিত হয়।

হুজুর চেয়ারে এখন যেন ঠিকভাবে বসতে পারেন নি। প্রজা দেখে ভারী খুশি, দু-একবার গলা পরিষ্কার করলেন, নানান অস্থিরতা প্রকাশ পেল। ইতোমধ্যে শুনলেন নায়েব তারস্বরে হাঁকছে, 'ওরে লে গড় কর, ঈশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ব্রজগোপাল চৌধুরী বাহাদুর হুজুরের লাতি…শ্রীল শ্রীযুত রাজা মোহনগোপাল চৌধুরী বাহাদুর তোদের বাপ-মা, লে লে' বলে নিজেই বিনয়ে পাপোশ সদৃশ হয়ে গিয়ে বললে, 'গরীবের মা-বাপ…'

পৃথিবীর হুজুররা সকলে মা-বাপ দুই, ফলে ক্লীবলিঙ্গ! হুজুর সলজ্জভাবে নায়েবের দিকে চেয়ে কখনও মুখ নিচু করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নায়েব ভুঁড়িটি যথাসম্ভব নাচিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর দরবার ঘরে যদি…'

'না…দুমিনিটে সেরে নেব' বলেই তিনি সম্মুখের ভীড়ের দিকে বেনামা নজরে

চাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ দুঃখময় ভীড় দেখেন নি। কতগুলি অনিশ্চিত শীতে কাঁপছে। নিজের অস্থিরতায় পাদান উল্টে গেল, তিনি নিজেই তুলতে যাচ্ছিলেন, সহসা কৈলাস এসে ঠিক করে দিলে। হুজুর নিজের ব্যবহারের জন্য মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। হুকা-বরদার এসে একটি বিচিত্র আলবোলা রাখল অনতিদূরে, কাটগেলাসের উপর সোনার কাজ করা বৈঠা; তাতে দশ-বার নহর নল। মুখ-দানটা অত্যন্ত আদবকায়দায় হুজুরকে দিলে। হুজুর মোহনগোপাল যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। কস্তুরীর গন্ধ পরিব্যাপ্ত হল।

হুজুর অধিক নাটকীয়ভাবে বসে মুখদানটায় টান দিলেন, পুনঃপুনঃ দিয়ে-ছিলেন কিন্তু কোথা ধোঁয়া! তাকে কেমন যেন বা জীবন্ত রগড় বলেই বোধ হল। মুখদানটা সরাতে পারছেন না কারণ এটি অহঙ্কার, এটি অহঙ্কার। ত্বরিতে সকলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় বেয়াকুফ বলে বোধ হল। সকলেই তাঁকে যেমন অনুপযুক্ত ভাবছে। মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়েই নায়েবের কথাটা মনে হয়েছিল, সুতরাং আর আর কথা, যথা এদের সঙ্গে পুরাতন বিবাদ, যথা শাজাদের অবজ্ঞা করার কথা মনে হয়েছিল। কে যেন তাঁর ভিতরে 'মাভৈ মাভৈ' বলে একবার যেন বা হুকুম করেছিলেন, 'রতি পাইক', কিন্তু প্রকাশ্যে নানাবিধ স্বরে একটি রূঢ় পদ শোনা গেলে 'কয়েদখানা দেখিয়ে নিয়ে আয়।'

এমন যে নায়েব সে পর্য্যন্ত এই উক্তিতে যেন ধাক্কা খেয়ে গেল। ভবও যারপরনাই স্তম্ভিত! হুজুর নিজেই তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে পাখীরা যেমত ঘাড় কাত করে কথা শুনে, তেমনি শুনেছিলেন। মনে হয়েছিল এ গলা অনেক অন্ধকার পার হয়ে এল। তিনি বলে উঠলেন 'নিয়ে যা'। কোন কিছু ভেঙে পড়বে, ভয়ঙ্কর শব্দ যেন প্রকম্পিত হল।

ইদানীং জনসমাজ অস্পষ্ট হয়েছিল, হুজুরের বাক্যে কেবলমাত্র তাদের বুকটা ধক্ করে উঠে ঢিপ্। কে একটা বাচ্চা ছেলে সর্দ্দি টানতেই যেটুকু শব্দ হয়েছিল তাতে তারা কেঁপে উঠেছিল। এতক্ষণ কেউ কারও দিকে চায়নি। এমত সময় দু'জন নীলকোর্ত্তা পরা তকমা-লাগান লোক এসেই বললে, 'চল হে।'

হাওয়া চালিত শুষ্ক পাতা যেমত চলে, তেমনি সকলেই। কিন্তু তবু ছোট বড় নানাপ্রকারের দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গিয়েছিল। ঈশ্বরকে স্মরণ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। সকলেরই মুখ নীচু, শবযাত্রায় যেরূপ দেখা যায়। গাড়ীবারা-ন্দার অন্যদিক দিয়ে বার হয়ে, যখন তারা প্রথম লতানে গোলাপযুক্ত বাতিখাম্বা পার হয়েছে, এ সময় রববানি কিছু পাশ কাটিয়ে শাজাদের পাশে এসে অনুচ্চ

কণ্ঠে বললে...'মন মানাও গো, আমরা ছোট হই নাই...আমরা আল্লার নামে আছি...'

শাজাদ এ কথায় হেঁট মুখটা তুলে, একবার তার দিকে, অন্তরায় সারা প্রকৃতির দিকে চক্রাকারে তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল, মাথা নাড়ল।

অনেকটা আসার পর, সারি সারি গুমটিঘর। তারা সকলেই গুমটিঘরের বারান্দায় উঠল। অনেক ঘরে তালা দেওয়া, সর্ব্বশেষ ঘরটি বড় এবং এইটিই কয়েদখানা। কয়েদখানার সম্মুখে এক পিঁপে চুন ভিজান আর নানাবিধ কলি-ফেরানোর সরঞ্জাম; কিছু বালি, কিছু সুরকি বারান্দার নিচে মাঠে ডাঁই করা।

লোহার মোটা গরাদওয়ালা দরজা। হুড়কোতে মুঠোর মত দেখতে বেশ ভারী তালা লাগান। অসম্ভব একটা ঝাঁঝাল গন্ধ এরা সকলেই পেয়েছিল। সমস্ত ইজ্জত ভুলে সত্যই সকলেই কয়েদখানা দেখতে লাগল! গরাদে মুখ রেখে জটা খানচাতে খামচাতে শিবাই বামুন বললে, 'মেলা আঁচড় মোচড় দিলে গো মিঞা।'

কারু কথা কইবার মত মন নাই, যেমন লোকে ঐতিহাসিক ফাঁকা ঘরসমূহ দেখে, তেমনি এরা বড় চোখে দেখছিল। ছোট একটি নিশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে একজন যখন সরে আসে, অন্যজন তখন সলজ্জভাবে গরাদে মুখটা লাগিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করে। ছোট ছেলে যে ক'জন ছিল, তারা হামাগুড়ি দিয়ে বড়দের হাঁটুর ফাঁকে ঢুকে দেখছিল, মজার কিছু দেখা যাবে বলে চারিদিকে চাইছিল।

কয়েদখানার ছাদ খুব নীচু, উপরে ছাদ গোল হয়ে ভাঙা। খিলানের ইঁট খোয়া মশলার শুর কালো হয়ে আছে। কতক চামচিকে। ছোঁড়াদের মধ্যে কে একজন 'হুক' করে উঠতেই, চামচিকে ছুটে পালাল। ছাদের গোলা ফাটের আগাছা আর কালমেঘ এতাবৎ যা হাওয়ায় নড়ছিল, তা সকল চামচিকের চোটে দুলে উঠল। ঘরের উত্তরে একটি ছোট জানালা, দেওয়ালে দেওয়ালে ইকড়িমিকড়ি ফাটল, সেখানে ফার্ন গাছ।

শাজাদ শিবাই বামুনের হাত ধরে বললে, 'দেখছ গো দেখছ...' শিবাই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ দুটি যথেষ্ট বড় করে ছিল। শাজাদ পুনর্ব্বার বললে, 'ওগুলা হাতের ছাপ না বটে?'

দেওয়ালে ভৌতিক হাতের ছাপ, কখনও ফার্নের তলে, কখনও বা ফাটলের ধারে। মহাসাগরে নিমজ্জমানের শেষ চেষ্টাটুকু। শাজাদ ভীত হয়েছিল, দুখেল

গলায় সে প্রশ্ন করলে, 'এতেক হাতের সই ছাপ কেনে গো বামুন, উটা কি লিখা বটে ?'

শিবাই নিরীক্ষণ করত উত্তর দিলে, 'মনে লয় যারা ছিল ইখানে তাদের সই ছাপ হবে···উটা ভ-বা-নন্দ···কে জানে কোন শালা।'

শাজাদ কি একটা কথা বলতে চেয়েছিল, দু-একবার শিবাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলি বলি করে বললে, 'তুমার কি মনে লয় উয়ার···মধ্যে' বলে থেমে মাথার ফেট্টিতে ঈষৎ ঠিক দিয়ে এক দমকে বলে গেল, 'উয়ার মধ্যে আমার তুমারও বাপদাদার ছাপ আছে নাকি বটে···?' এরপর গরাদ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হস্তদ্বয় একটির পর একটি প্রসারিত করে অতি ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। এখন তার আয়ত চোখ দুটি হাইয়ে বড় হয়ে গিয়েছিল, সে শিবাইয়ের দিকে চেয়ে পুনর্ব্বার আপনার হাতের দিকে চেয়ে সহসা অকারণে ভুকে দেখে বলেছিল, 'লাও দেখ না হে কি মনে লয় গো তোমার।'

শিবাই জটা খামচাতে খামচাতে দেওয়ালগুলির দিকে চেয়েছিল, এবং পরে শাজাদের হাতখানি অবহেলাভরে সরিয়ে বলেছিল, 'ই রে ক্ষ্যাপা হইছ নাকি ?'

'দেখ'

'আঃ কোন পালাগানের ক্ষ্যাপা তুমি বা'

শাজাদের চোখ তখনও আপনকার উন্মুক্ত হস্তে নিবদ্ধ। হঠাৎ মাথাটা দুলিয়ে বড় অসহায় গলায় বলেছিল, 'ক্ষ্যাপা হই নাই, মন মরে গো, কে যেন বলে, কেউ না কেউ ছিল ?' বলে ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালের ছাপের দিকে তাকাল, তার মাথাটা অন্তরের দুঃখে কাঁপছিল। ইতিমধ্যে আর আর অনেকেই আপন আপন হাত দেখে কোনমতে উঁকি মেরে দেওয়ালের ছাপ দেখার চেষ্টা করে। শাজাদ দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললে, 'বল হে কি বল বটে' তখনও তার হাত উন্মুক্ত।

সেই হাতের উপর একটি তড়কা চাঁটি মেরে, মিথ্যা কোপ সহকারে শিবাই বললে, 'লাও ! ছিল ত ছিল, হা কপাড় এমন খ্যাপা ত দেখি নাই, এক ছটাক আটকল নাই— বলি ছাপ যদি এখানেই থাকত তাহলে কি জমি কি ভোগসুখ করতাম হে ? জমি পতিত বলে লিখা হত হে ?'

ইত্যাকার উত্তর, আশাতীত বর্ষা আনলে, এরা থৈ পেয়েছিল। খানিক চুপের পর সকলেই যাত্রাই ঢঙে মাথা দুলিয়েছিল, কেউ হাতটা মুছে নিলে পরনের ত্তেনাতে। শাজাদ বড় বড় চোখ করে হেসে ফেলেছিল, বললে, 'বটে বটেক

হক কথা গো—আয় তোর…ধরে চুমু খাই' বলেই এতাবৎ প্রসারিত ডান হাতের উপর বাঁ হাতের শেষ-তেহাই মেরেই ছোট একটা লাফ দিল, এবং বলেছিল, 'বামুন আর জম্মে তুমি জজ ছিল গো, আল্লা করে তুমি একভাতারী ঘুসকী পাও।' বলেই নিমাইয়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকে বললে, 'লে লে নিমাই, ছোট জাত দেখরে, ঠাওর কর তুর বাপদাদার ছাপ কোনটা হে।'

নিমাই তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে, 'লাও! পুড়া কপাল হে, ঠাওর কি কারণ? উ ঠাঁই সে ছাপ লেই গো, ছিল বটে সে ত বুড়া রাজার গালে' বলেই আড়ে দেখলে পাইক কোথায়। দেখেই গম্ভীর। এ কারণে যে তার গলা একটু চড়া হয়েছিল।

নিমাইয়ের রগড় ঠমকে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে গিয়ে, এক বল্‌গা হাস্যের ধোঁয়া ছেড়ে গলা নামিয়ে নিলে। ফলে সকলেরই গলা-কাত্‌রান শব্দ শোনা যায়।

শাজাদ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ওহে পারোইয়ের বাগ্দীর ছেইলা পাইক, ই কোঠা তেমন লায়েক সোমত্ত লয় হে— শালীর উমর পন্‌তার' বলেই তার তকমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আ হে, আ হে পোশাকআশাক বড় ডাগর দেখি! বড় খাসা দিইছে হে, আ হে তকমা ত বড় জবর খুব খুব, মনে লয় আর্শি বা বটে,' বলেই মাথাটা নিচু করে তকমা দেখতে লাগল।

পাইক দু-জনেই একটু নড়বড়ে হয়, তারা পোশাকের গর্ব্বে কথঞ্চিৎ হ্যাকা হয়েছিল। তারা কথার গায়কিতে একটু বুনো তামাশার ইঙ্গিত পেয়েও কিছু বলেনি, কেননা যেহেতু এদের সকলকেই তারা চেনে জানে। তারা কর্ত্তব্যের খাতিরে শুধুমাত্র নিজেদের সোজা সুঠাম রেখেছিল।

শাজাদ ইতিমধ্যে তকমায় আপনার প্রতিবিম্ব দেখে, মোচ চুমরে নিয়ে গুন-গুন করে গান ধরলে—

'শাল বনে শাল পাঁউড়া
কদহুঁ গাছে কলি রে
বঁধুর গায়ে লাল গামছা
তার ছটক দেখে মরি রে'

গানের সঙ্গে সঙ্গে সে এবং আর আর সকলেই হাঁটু ভাঙতে থাকল। মাথা দুলিয়ে অনুচ্চস্বরে গানটি ধরেছিল।

পাইক নিজের মেরুদণ্ডটি খাড়া করে বললে, 'ঝটপট লাও হে।'

'ই কি দিল্লীর দরবার যে ঝটজলদি দেখে লুব' কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'ই হু পাথর-চাপটি মেলার খেদা রাণীর দরবার' এটা অন্য চাপা গলা।

সকলেই তাকত ফিরে পেয়েছিল। শাজাদ তার দুই হাত দ্বারা দুই পেশী চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, 'চল হে···'

আবার তারা গাড়ীবারান্দায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। খুব উবল নক্সাকরা পিঠদানে মুখখানি ঠেকিয়ে রেখে হুজুর তামাক খাচ্ছিলেন। এখন কিছু ধোঁয়া বার হয়। সম্মুখে ভীড় উপস্থিত। রববানি বুড়ো আগে এবং আর সকলে তার কাছাকাছি। হুজুর দুই আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট মুছে প্রশ্নমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আল-বোলার নল নাড়তে লাগলেন।

রববানি কুর্নিশ করত বলেছিল 'দেখলাম বটে হুজুর।' তার ঠোঁটে হাসির রেখা ছিল, অন্যান্য সকলের ঠোঁটে অল্পবিস্তর ছিল। দুঃখ চেটে মুখের হাসি যেরূপ হোক, অন্তত তাচ্ছিল্য একথা হুজুর ভাবতে পারলেন না। অনেকেরই চোয়াল এখন নড়ছিল।

হুজুর মোহনগোপাল মুখদানটি দেখতে দেখতে, সহসা একবার শাজাদকে দেখে নিলেন, বেশ কিছুটা মূল্য দিয়ে এই মুখখানি মনে রাখতে হয়েছে। কিন্তু কয়েদখানা দেখানোর মধ্যে এমন এক সৌখীন আরাম ছিল যে, নিজেকে এই প্রথম তিনি অভিজাত বলে ভাবতে পারলেন, আনন্দে চেয়ারের উপর উবু হয়ে হাঁটুতে তার মন বাহু জড়িয়ে ধরে বসে দুলতে ইচ্ছে করল। এ কারণে যে এই প্রথম আল ডহর, নিগূঢ় অন্ধকার ভেঙে, অতীতের মধ্যে, স্থান লাভ করতে সক্ষম হল। আপনকার অন্তরের বোকা-ধড়ফড়ে অস্থিরতা এখন ডাঙ্গায় উঠেছে; আপনার গোঁফের দুই পাশ একটু বিন্যস্ত করে অল্প করে মোচড় দিয়ে বললেন, 'তোরা সবাই জমির দাখিলা-পাট্টা নিয়ে কাল সকালে নায়েব মশাইয়ের সঙ্গে···'

'হুজুর, দাখিলা-পাট্টা আমাদের নাই, আমরা···' রববানি ধৈর্য্য সহকারে এ কথা বললে।

'দলিল নেই, দাখিলা নেই,' বলেই নায়েবের দিকে ধনুকের মত ভ্রূ উঁচু করে চাইলেন; এটা প্রশ্ন করার জন্য নয়, নিজের খুশি ঢাকবার জন্য। যেহেতু তিনি ভেবেই পাননি, যে তিনি এত চতুরভাবে কথা কইতে পারবেন, নিজের উপর বিশ্বাস বেড়েছিল। এবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'নেই কেন?'

'জে হুজুর,' বলে স্কুলের ছাত্র মনে করবার জন্য যেমন উঁ উঁ শব্দ করে তেমনি

করেছিল, কারণ হুজুরের চতুর অজ্ঞতা দেখে সে অবাক! সে এই সঙ্গে হাতও কচলাচ্ছিল।

'আজ্ঞে আমাদের ওই ছটাক ছটাক জমি,' রববানি বলতে গিয়েছিল 'দলিলের থেকে জমি ছোট হুজুর—'

'ছোট হোক আর যা হোক আমি…ওর খাজনা…ধার্য্য করতে হবে। যাক নায়েব মশাই, ওদের যখন ওসব নেই, এই এক কাজ করুন, কে কত জমি ভোগ দখল করছে তার একটা হিসেব নিন। মৌজায় সর্ব্বসমেত কত জমি আছে?'

'জ্ঞে— জ্ঞে…' নায়েববাবু হুজুরকে সুবিধা দিলে।

'থামুন থামুন, দেড় হাজার বিঘে রুমুখর্গা, ঠিনকি, টাবুই মিলিয়ে গাছপালা, সড়ক ডহর টিলা খর সোঁতা বাদ দিলে তেরশো বিঘে দাঁড়ায়।'

রববানি বললে, 'হুজুর হিসাব যখন করছেন, তখন খয়রা গুমটো লপ্ত আছে হুজুর?'

হুজুর এ-কথায় কান দেননি। মিষ্টি লাগা আঙুল শিশু যেমত চুষে, তেমনি তিনি মুখদানটি চুষে চুষে টান দিচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে উপর দিকে ধোঁয়া ছেড়ে নিজেকে ভারী মজার তৈরী করেছিলেন, পা তাঁর নড়ছিল। এরূপ আরাম তিনি জীবনে পাননি, রতি পাইক ঠিক কথা বলে। হঠাৎ বলে ফেললেন, 'দেখ বাপু তোমরাই আমার একমাত্র প্রজা যারা…' বলেই তাঁর লজ্জা হল এরপর আড়ে নায়েব এবং এদের দেখে নিয়ে হুড় হুড় করে বলে গেলেন, 'তোমরা কস্মিন-কালে খাজনা দাওনি, তোমাদের হয়ে আমরা দিয়েছি, ঠাকুরদাদা ভাল মানুষ ছিলেন। (নায়েব হাত দুটি কপালে ঠেকালে) তিনি বরাবর…'

বড় পাখার শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। রববানি অন্যমনস্কভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল, তার চোখে পড়ল পাখাবরদার সনাতন আপনার কোমরের দাদ চুলকাচ্ছে, এ দৃশ্যে সে খানিকটা সোজা সিধে হয়ে দাঁড়াল, বললে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর, আপনার জানতে আজ্ঞা হয়, হুজুর ও-লাট কোম্পানীর ঘরে হাজা শকুনবসা পতিত বলে লিখান…' আর বলতে সক্ষম হল না রোষে আবেগে উপরন্তু বিনয়ে তার হাড় খটখট করে উঠল; প্রকাশ্যে কষ বয়ে জল আসছিল মুছে নিলে, ঘাড় তখনও নড়ে।

এ সকল লোক চোখের সামনে থাকলেও থাকার কথা নয়। দীন যারা তারা যে এতেক বিসদৃশ তাকে যেন ছিল। এরূপ ভয়ঙ্কর সত্য প্রকাশে হুজুর চেয়ারে হাস্যকরভাবে নড়েচড়ে উঠেছিলেন, গলার স্বর শুধুমাত্র লাফ দিয়ে উঠল, শুধু

শোনা গেল, 'কি বললি রে'র — 'ও ল্লিরে'। তবু তার রাগ প্রকাশ পায়নি।

'জানতে আজ্ঞা হয় — হুজুরের গোলাম আমি,' বলে একদা ডাকসাইটে মানী লোক — অন্ত বৃদ্ধ রববানি মাথাটা নীচু করলে। সরু ঘাড়ের উপর মাথাটি নড়ে, ঘড়ির ধুকধুকির মতই চাপদাড়ি এপাশ ওপাশ করছিল।

যদিচ নিমকখোর গোলামের কণ্ঠস্বর ছিল না, তথাপি রববানির কথা কইবার ধাঁচ, বাক্য ব্যবহার, যা তিনি থিয়েটারেই শুনেছেন তাঁর কানে যেন বা শিশিরের পয়ার ঢেলে দিলে। আপনার হাত দুটি দেহের সঙ্গে জুড়ে আঁট হয়েছিল, হাত ছাড়িয়ে কি যে কর্ত্তব্য তা এক পলকে ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন। মনে হল তিনি যেন সাবালক হয়ে উঠেছেন, দুরন্ত জন্তুর মাংসপেশী দিয়ে সমস্ত অন্তরীক্ষটা গড়া। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন বলে উঠল 'রাসকল যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, ফের যদি শুনি মেরে হাড় ভেঙে দেব' গলার আওয়াজ আঁশপাট, মোরগ-কোঁকানি ছিল। সম্মুখের স্তব্ধতা দেখে বুঝলেন, এ তাঁরই গলার স্বর। ভয় ভাঙল, দুঃখ হল, এ কারণে যে স্বরে তেমন তেমন দর্প ছিল না। মান্য লোক স্ত্রীর ছেঁড়া কাপড় দেখলে যেমত ছোট হয় তিনিও সেইরূপ আপনার অক্ষমতার জন্য হেঁট হয়েছিলেন। মন হায় হায় করে উঠল, উচিত ছিল, 'জুতিয়ে চামড়া তুলে নেব' অথবা 'চাবকে গতর ট্যারা করে দেব' বলা। সুতরাং কি যেন মনস্থও করেছিলেন।

সাড়া নেই, অনেক উপরে থামের ক্যাপিটাল আশ্রিত দুয়েকটা গোলা পায়রা উড়ে গেল, চামচিকে কড়িকাঠে স্থির। প্রকাণ্ড লাল নীল কাঁচের আলোটার দণ্ড লেগেছে গাড়ীবারান্দার ছত্রিতে, এইটুকু দেখে পুনর্ব্বার চোখ নামিয়ে হুজুর বললেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না, সব হিসেব দিয়ে যাবে — শিক্ষা-সেস রাস্তা-সেস সব দিতে হবে…'

রববানি লাঠির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, 'হুজুর বাবুমশায়, আপনি রাজা বটে, আপনার নাম নিলে দিন ভাল যায়, পেট ভরে গো…' এরপর আরও সরল মনে বললে, 'পতিত গুমটো জমির খাজনা আবার কি হবে গো, আপনার এত আছে, ওটা পতিত লিস্কর থাক…'

রববানির কথার মধ্যে হুজুর সাপের মত মাথা আন্দোলিত করছিলেন, কোথায় তাঁর স্বরটা সুর ধরতে পারবেন, এই জন্যই বটে। গলা ফেটে পড়ল 'ফের… মজাদা…জুতিয়ে মুখ…চাবকে চামড়া তু-তুলে নেব…' অবশেষে স্বরে বাষ্পীয় ফোঁস ছিল। এবং আপনার গলার স্বরে নিজেরই জলতেষ্টা পেয়ে গেল। নিজেই

অত্যধিক ভীত, অন্ধকার ঘরে যেন বা তিনি একাকী। কখন যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা তাঁর স্মরণ ছিল না। চেয়ারে বসে চীৎকার করা বেচারীর এখনও হাতসই হয়নি।

সমবেত সকলে প্রজ্ঞাঘাতকে রূপান্তরিত। কেউ, মানে খেলারাম ভেবেছিল এত সুন্দর মুখ এমন ভয়ঙ্কর হতে পারে কি করে!

ইংরাজ যেমন দুঃখী ভিখারীকে বুটের লাথি মেরে 'গড সেভ দি কিং' গান করে— তেমনি তারও চোরা মানসিক ভাব হয়েছে। আর কিছু পরে এখন ফুলের ইঙ্গিত না থাকলে ভ্রমরের গুঞ্জন ছিল, সেই কারণে আর কিছু পরে বাবরের সহ্য ক্ষমতা পাবে, মাজুন খাবে আর মানুষের মাথা গড়িয়ে পড়ছে দেখবে, রক্তস্রোতে মাছ ছেড়ে দেবে, তাঁবু সরে সরে যাবে। এইরূপে ভগবান থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

তাঁর গলার স্বর এখন প্রতিধ্বনিত হল, রুনুপগাঁয়ের বৌ-ঝিরাও যেন শুনতে পেল। ছোট বড় সকলেই অধৈর্য্য হয়েছিল, গা অনেকেরই শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েদখানা দর্শনে ক্ষিপ্ত শাজাদ ত্বরিতে দৌড়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ফেলেই ধীর হল, তার দেহ দুলেছিল। শিবাই বামুন তার জটায় বাঘনখ দ্বারা খাম-চালে। তার নখগুলি কি বড় বড়! ইয়াসিন পিছন থেকে দেখল, সেই নখ আর হুজুরের মুখমণ্ডল, নখগুলি যেন বাবুর মুখ ছিঁড়তে উদ্যত। আবার বড় পাখা এসে মুখ ঢাকল।

এমত সময় ছোট একটি রূপার পাত্রে একটি টিকলো গেলাস খানিক ঈগলের পিঙ্গল দৃষ্টি! আর এক রেকাবে স্ফটিকের মত কোতিলা। হুজুর সত্বর এক চামচ কোতিলা মুখে দিয়েই, গেলাসে একটি গোদা চুমুক দিলেন, মুখ নিঙড়ে উঠল, সাহস ঝনঝন শরীরে। মুখ দিয়ে ইশারা করতেই নায়েব কান বাড়িয়ে মুখটা ছুঁচোর মত করলে কারণ সদ্য মদের গন্ধ! হুজুর বললেন, 'দাদার আমার বড় ছাতি···(দুয়ারে বান্দিবেন হাতি, দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি) এ গান এরাই বেঁধেছিল।'

জিব কেটে না না বলে নায়েব বললে, 'এরা সে ঝুমুর বান্দে নাই, তারিণী ঘাটওয়ালের পরজারা—'

'ও,' খুব একটা রাগ করা গেল না তবু রুক্ষ স্বরে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ নাম দখল না দিচ্ছ কেউ এখান থেকে নড়তে পারবে না,' বলেই তিনি উঠলেন, পেটেণ্ট দেদারে আলো হেলদোল হয়, হুজুর নলটা হাতে নিয়ে দু-এক পা

গেছেন এমত সময় ভব হন্তদন্ত হয়ে এসে নলটা নিল, চাকররাও অবশ্য শশব্যস্ত হয়েছিল। তারপর ভবই অত্যন্ত যত্ন সহকারে কোঁচাটা তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে।

বন্দুকওয়ালা পাইক ত ছিলই, এ ছাড়া সড়কিওয়ালারাও ছিল। নায়েব বললে, 'হ্যাৎ তোরা বাপু কোন কম্মের নোস – তোদের মানুষ করতে লারব··· ভাল করে ধরতে হয় রাজা মানুষ ··'

কারও উত্তর দেবার মত মন ছিল না। শুধু শিবাই বলেছিল, 'লায়েববাবু, চ্যাংড়াগুলা ঘরকে যাক গোচগাছালি আছে।'

নায়েব বললে···'তোরা যা খড়াকালি মাটির মানুষটাকে, যাই দেখি' বলে সে অন্তর্দ্ধান হল।

সকলেই একের পর একজনা বসে পড়তে বাধ্য হল।

উপরে দোতলার ছোট বারান্দার লোহার কেয়ারী-করা রেলিঙের ভিতর দিয়ে দেখা যায় খোলা দরজা। হাসির শব্দ গমক খেয়ে উঠছে, এখন গানের আঁচলা শোনা যায়। বাগানদার নিখুঁত জংলা অধৈর্য্য স্তব্ধতায় চক্‌চকে হয়ে উঠে। তবলার তাড়নায় কোথায় যে সে গান থৈ পাবে তা যেন ভেবেই পায় না। আবার হো হো শব্দ এবার কাহারবা, 'না পাকড় হাত মনমোহন কালাই চুড়িয়া টুট্‌ যায়েগী' তৎসহ ঘুঙুরে ফুলকো কদম র‍্যালা! এবং বুকফাটা ওয় হোয় ওয় হোয় 'আয় কবুতর কি চুবুতর!' বাইয়ের ভেড়ুয়ার গলা, তারপর বা 'বোট চমকী ঘটি!' এটা ভবর উক্তি।

সকলেই অনেকবার মুখ উঁচু করে উপর দিকে তাকিয়েছে, যাদের গাম্ভীর্য্য কম তারা নোংরা প্রশংসায় হিক করে হেসেছে। ছোট ছেলেরা ঘুমিয়ে কাতর কেননা অনেক সময় হয়েছে। সকলেই রববানি বা শাজাদের গলার স্বর শোন-বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, কিন্তু চুপ। এখন সকলেই অস্থির; এ মনোভাবের প্রকাশ ছিল, কেউ মাটিতে চাপড় মেরেছে, কোনজন অদ্ভুত সুর করে, ভগবানের নাম করে আলস্য ভেঙেছে। কে একজন দেহ হাতের উপর ভর করে বসেছিল, তার কনুই ভেঙেছে। কারা দু'জন বাঘবন্দী খেলছিল। ইতিমধ্যে ঘোতাই বলে উঠল, 'খেমটাওয়ালী শালীরা– হে হে'

পতিতপাবন আড়মোড়া দিয়ে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে খেমটাওয়ালীদের উদ্দেশ্যে বললে, 'দুটি খেতে দিও, পায়ে পড়ে থাকব গো'। একথা অন্যত্র হলে,

যদি হাটেমাঠে, যদি ঝুমুরের আসরে, তখন নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এঁড়ে বেচে হাসত। এখানে সবাই হাসি থেকে মুখ সরিয়ে নিল।

এমতকালে হুজুরকে দোতলার বারান্দায় দেখা গেল। এক হাতে গেলাস, অন্য হাতে পিঙ্গল টুকরো। তিনি দেখলেন, গাড়ীবারান্দার আলোর প্যাঁচান দণ্ডের শেষে বিচিত্র কাঁচের আধার, তার পাশ দিয়ে দেখা যায় একটি বাচ্চা ছেলের, এখন সে জাগ্রত, তার বিবশ শুকনো মুখখানি, আর তার বড় বড় দুটি চোখ—একারণে যে সে উপর দিকে চেয়েছিল। এবং এরই আশেপাশে অনেকে। বড় ইষ্টিশানের তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম চাতালে যেমনটি দেখা যায়। হুজুর ভারী খুশি হয়েছিলেন, হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে তার হাত থেকে পিঙ্গল টুকরো খসে, এখানে ভুঁয়ে পড়ল। এটি একটি অল্প-খাওয়া মাছভাজার টুকরো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের মুখখানি একটু হাঁ হয়েছিল। তবু নিম্নের এই দুঃখীদের দেখে তাঁর ভারী আমোদ হয়, তিনি নাচের ভঙ্গি করতে করতে এখান থেকে চলে গেলেন।

মাছভাজা টুকরোর দিকে অনেকেরই নজর পড়েছিল। চোখ ভারী হয়ে উঠেছে অনেকের। কেউ বা ঢোক গিলেছে, ঠোঁটে জিব বুলাতে গিয়ে কেউ থেমে গেছে। এদের কুকুরটা অবাক হয়ে দেখে, নাক কুঁচকে, উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেই সেই টুকরোটায় মুখ দিতে গেছে, সেই মুহূর্তে ঘোতাই তার ন্যাজ ধরে টান মেরেছিল, কেঁউ কেঁউ করে পিছু হাঁটতেই একটা লাঠির ঘা মাটিতে পড়ল, ভাগ্যে লাগেনি। রববানি লাঠিটা সরিয়ে নিলে! তাহলেও কুকুরটা আর্তনাদ করে উঠল। মার শালাকে—শালল্লা···কাঙাল। বিভিন্ন গলার আওয়াজ হয়েছিল। এইটুকু অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারার জন্য সকলে সরলভাবে নিশ্বাস নিতে পারল।

হুজুর যেন দেখতে আরও সুন্দর হয়েছেন, রঙ যেন অঢের গৌর। রাত্রে দেখা পাশ পৃথিবী যেমন বা বর্ষার ধোয়ানি গেয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। একথা ব্যতীত, আরও যে, নিরালম্ব অশরীরী ফোয়ারা যা এতাবৎ আকাশে আকাশে ঘুরেছে ক্ষণেকেই যেন বা মাটি পেলে, ক্রমাগতই উৎসারিত জলের নৃত্যময়ী ঝঙ্কার। এ বাড়ির স্থাপত্যপদ্ধতির সঙ্গে তার চেহারারও একটা রহস্যময় মিল সৃষ্টি হল। তিনি অনেকবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, অথবা সেই সূত্রে তিনি নিজেকে ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন, 'বুঝলি ভব, বেটারা খুব ঢিট হয়েছে—ভেবেছিল কোথাকার অগা এসেছে—ওরে বা রক্তে আমার জমিদারী খেলছে,' বলে নিজের হাতে টুক করে একটা

চিমটি কেটে হি-হি করে হাসলেন। 'আও পেয়ারে পঞ্জা লড় জমিদার' বলে হাসলেন।

'বাঃ হবে না, তুমি ত তবু কিছুই করলে না অন্য কেউ হলে মেরে দবনা ভেঙে দিত।'

ভবর কথাটা শুনেই হুজুর স্থির হলেন। পরক্ষণেই তার পা নাচতে লাগল গলার হার একটু ঘুরিয়ে নিয়েই বললেন, 'আরে লো ভৈরবী ছোড়, দুসরা উড়াও।'

বাইজী মৃদু হেসে তার কড়ে আঙ্গুল কামড়ে অন্য সুর ধরলে। গারা ঠুংরী 'না মার কাটার নয়না বাণ' বলেই মহা আবেগ অনুরোধে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলে, রতনচুড়টি দেখা গেল, পরে হাতের আঙ্গুল দিয়ে আপনার বড় চোখের কাছে নিয়ে আকারইঙ্গিত ভাঁও করে বুঝাতে লাগল। বাইজীর মাথার ঝাপটা ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়েছিল। হুজুর মোহনগোপাল গানে আর স্থির হতে পারলেন না।

আকাশ থেকে আমরা বহুদূরে থাকি একথা সত্য, কিন্তু আকাশ থেকে বহুদূরে যখন সরে যাই সেকথা ভয়ঙ্কর। এতক্ষণ বাইজীকে ডান হাতে আলিঙ্গন করেছিলেন, আধ-শোয়া রমণীর কণ্ঠে পিলু কিয়ৎপরিমাণে ফাঁকি পড়ছিল। বাধা সৃষ্টি করে বসে আছি নিজেই, একথা মনে হতেই, তিনি হাত সরিয়ে নিলেন, রমণী পড়ে গিয়ে হাসতে লাগল। আলুলায়িত কোঁচায় পা পড়ে হুজুর কিঞ্চিৎ দুলে উঠেছিলেন; ভব মহা তৎপরতার সঙ্গে কোঁচাটা তুলে, ঝেড়ে, তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল। অসহিষ্ণুভাবে কোঁচাটা ফেলে দিয়ে হুজুর সোজা বারান্দার রেলিঙের নিকটে।

তাঁর দৃষ্টি বিরাট দুই থামের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে, একটি ওরকেরিয়ার তার পাশে রেলিঙ, সেখানে একটি স্থির, নিরীহ সুন্দর পিঙ্গল ঘোড়া। এখান থেকে বড় বাচ্চা দেখায়, এই সরল স্বভাব দেখতে তাঁর কিছু সময় নষ্ট হয়েছিল। পূর্ব্বে এ দৃশ্যটি চোখে পড়লেও, তাঁর মন যেন ফিরিঙ্গী হয়ে উঠল, সুন্দর মুখখানি ডাকিনীতন্ত্রের উপকরণ এরূপ। চোখ ছোট ছোট করে বলতে গিয়ে, থেমে গেলেন বিড়বিড় করে উঠল ঠোঁট দুটি। একটু আওয়াজ 'নায়েবকে ডাক'।

নায়েব চটি ফট্‌ফট্‌ করে উপরে এল, হুকুম নিলে, চলে গেল। হুজুর সিঁড়ির চাতালে রক্ষিত 'হিবনাস আক্রুপি' মূর্ত্তির সাদরে গালটি টিপতে গেলেন, আঙুল ফস্কে গিয়েছিল। তার মুখে খানিকটা অর্দ্ধভুক্ত (?) মণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে গেলেন।

গাড়ীবারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে, এবং গোল মাঠের শুরু, ঠিক তারই উল্টো দিকেই একটি বেশ বড় জানলা। সেখানে হুজুর দণ্ডায়মান, হাতে তার সোনার কাজকরা বন্দুক। গুলি পুরে 'খাল্ক' করে একটি শব্দ হল, কি জানি কেন তিনি তারস্বরে বলেছিলেন 'ব্রাণ্ডি'।

ভব থতমত খেয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল। ব্রাণ্ডি ঢালার শব্দের পর আর এক শব্দ হুজুরের চটি ফট্‌ফট্‌ শব্দ, এরপর পানীয় খাওয়ার শব্দ তারপর মৃদু খুরের শব্দ আর কচিৎ হ্রেষাধ্বনি। ভব সোজা হতে পারল। ঘোড়াটাকে এনে নিকটের আলোর খাম্বার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

রুসুখগাঁয়ের লোকেরা ঘোড়ার আওয়াজ শুনেছিল। একজন হ্রেষাধ্বনি শুনে, উঠি উঠি করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। থামের তালে খাড়া বেদী, হাত তিনেক চওড়া। শাজাদ তার ঘোড়া দেখতে পেলে না। একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে খানিক এগিয়েই, চোখ বড় করে বললে, 'চাচা আলম।'

এ কথার সঙ্গেই মদের সোরাই মুখে ঢেলে এগিয়ে পিছিয়ে, তাক করলেন। ভবও তাড়াতাড়ি একটু মদ্যপান করেই কানে আঙুল দিয়ে রইল। খুট করে আওয়াজ হল। দিক প্রকম্পিত করে মেঘগর্জ্জন হল, সার্শির আলগা কাঁচে চিড় খেয়ে গেল। চামচিকে পায়রা ছত্রভঙ্গ হয়। এদের কুকুরটা ল্যাজ তুলে কাঁই কাঁই করে ছুটল। আর শাজাদ পাঁচিলের উপর যেন বা সাঁতার দিচ্ছে কোন দিকে যায়।

গুলির ঘায় বেচারী নিরীহ জানোয়ার লাফ দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল, খাম্বা লগ্ন দড়ি ছিঁড়ে সাপ যেমত খেলে উঠে। মানুষের যন্ত্রণার মত আওয়াজ শোনা গেল। পুনর্ব্বার খুট করে শব্দ, এবার সুন্দর পিঙ্গল করুণ চোখ দুটির মাঝখানে নাসারন্ধ্র ভয়ঙ্করভাবে স্ফীত, অযুত রেখা স্পষ্ট হয়, রোমকূপ গভীর, একটি ভ্রমর এ ভয়াবহ রূপ দেখে হাওয়া। দাঁতের উপরে রেশমী রঙ যে এত হতশ্রী বিসদৃশ সেকথা লেখা নেই। সবুজ ঘাসের উপর বিশাল দেহটি লুটিয়ে পড়ল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়ো হল, এবার শ্লথ হয়ে গেল। শুধু বাতাসে তার কেশর নড়ে।

ভব কানে আঙুল দিয়েই 'হুররে' বলে লাফ দিয়ে উঠেছিল। এখন দাঁড়কাকের আর সেই কুকুরটার বিকট চীৎকার শোনা যায়। কিছু ঘুঙুরের আওয়াজ উপরের বারান্দায় স্তব্ধ হল। হুজুর নিবিষ্টতায় নিশ্বাস বন্ধ করেছিলেন, এখন বন্দুকের নল ভাঙতেই তিলিক্ করে টোটার খোল খুলে পড়ল। ভব ভয় পেয়ে-

ছিল, পরক্ষণেই টোটার খোল তুলে চুমু খেয়ে মাথায় নিয়ে খেমটা নাচ নাচতে লাগল।

বাইরে বন্দুকের ধোঁয়া স্তর ভেঙে গড়ে উঠে ; অনেকেই এখন বসে, বন্দুকের আওয়াজে অনেকেই চোখ বুজিয়ে বসে, ভয়ে জবুথবু! শাজাদ এখনও সেই অবস্থায়, শেষ গুলির শব্দে কাটা ছাগলের মত তার দেহ চমকে উঠেছিল। এখন সে আলমের কাছে যাবার জন্তে হাঁকপাঁক করছে। কারা তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিলে। সে দৌড়ে যেতে গিয়ে কার গায়ে পা লেগে লাট খেয়ে পড়ে ধরাশায়ী। সে যেন ইচ্ছে করেই চিৎ হয়ে পড়ল। মুখে মুখে আল্লা নাম, ঠাকুর ঠাকুর জপ! শাজাদ চক্ষুদ্বয় বড় করে কি যেন দেখতে চেয়েছিল। এমত সময় নিমাই হেলের ছেলে তার বাপকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, তখন শাজাদ 'হা আল্লা কোন পাপে আলম গেল হে' আর বুকে চাপড় পড়তে লাগল।

হুজুর বন্দুক হাতে এখানে দেখা দিলেন, কঠোর স্বরে বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'এটা গোকর্ণ নয় যে কে কার মেশো, এখানে আমি আছি…'আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার এখানে ঘোড়া কেউ চড়তে পাবে না…ঘোড়া মাল বইবে…।'

শাজাদ উঠে বসে ডুকরে কাঁদবার চেষ্টা করলে, অনেকেরই চোখে দীঘিজলের মায়া ছিল। শাজাদ হাত দিয়ে সর্দি অপসারণ করে একবার মাটি চাপড়ে, কাঁদবার চীৎকার করেছিল। হুজুর এতাবৎ আকাশের শান্ত মূর্ত্তির দিকে চেয়েছিলেন, চোখ ফেরাতেই রববানির দিকে দৃষ্টি পড়ল, কোথায় যেন ঠাকুরদাদার সঙ্গে মিল ছিল, বৃদ্ধেরা প্রায় একই রূপ দেখতে হয় হয়ত। সহসা নিজেকে জাগ্রত করে বললেন, 'এটা কাঁদবার জায়গা নয়' বলেই হুড় হুড় করে বললেন, 'কাল সকালেই যেন দখল হিসাব সবাই দিয়ে যায়— না হলে কয়েদে পচতে হবে।'

গরীব যারা, তারা ভারী মজার হয়, তারা মেয়েমানুষের মত হুট বলতেই কাঁদতে পারে। কিন্তু এদের দারিদ্র্যের খেসারত দিতে-করতে চোখের জল ফুরিয়েছে। একমাত্র 'ও হো হো' শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু বড় একটা ছিল না। বারুদের গন্ধ শাজাদের স্মৃতিতে আটকে ছিল।

নায়েবের গলা উঠল, আড়ষ্টতা কাটল, 'ওরে ওর মুখে কেউ হাত দে না, নিয়ে যা ওকে বাড়িতে' বললেন।

সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ইয়াসিন শাজাদের মুখে হাত দিতে গেল।

একমাত্র রববানি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'নায়েব আসমান আজজিও

নীল গো'। সে 'বাবু' যোগ করেনি।

নায়েব এ-হেন সাঁইমুরশেদী কথায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে, হুজুরের দিকে চাইল, হুজুরের মুখখানি কেঁপে উঠেছিল।

সকলেই উঠল, শাজাদ ঘোতাইয়ের কাঁধে ঘাড় এলিয়ে দিয়েছে, ঘোতাই আর ইয়াসিন তাকে ধরে, এগিয়ে চলেছে; কে একজন ত্বরিত পায়ে এসে একটা পড়ে-থাকা গামছা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। শাজাদ ঘাড় কাত অবস্থাতেই আলমকে দেখে তার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল। সকলে তাকে ধরে ফেললে। 'হায় বাজান হায় বাজান' উক্তিতে অন্যান্য সকলে ম্রিয়মাণ। হঠাৎ সে মাঠে পড়ে চাপড় দিতে লাগল, আর মুখে ঘাস ছিঁড়তে লাগল, এখন সত্যিই তার চোখে জল এল।

এ সময়ও গোলাপ প্রস্ফুটিত। ঘোড়াটির চোখ কেন যে খোলা তা ভগবানই জানেন। রুনুখগাঁয়ের লোকেদের হাল্কা ছায়া ঘোড়াটির উপর দিয়ে বহমান রক্তধারার উপর দিয়ে রয়ে রয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল।

জটপাকান ভীড় হুজুর দেখলেন গেট পার হল। হুজুরের যে কি এক বিকৃতি হল, হঠাৎ ঘুরেই দৌড়! হলঘরের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আপনকার ধুতির কোঁচা জড়িয়ে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টেবিলে লেগে গুলির আওয়াজ হল, ও দেওয়ালের সেজের বাতি ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল। হুজুর যেন সাহস ফিরে পেলেন, পরক্ষণেই সেই জার্দিনিয়ে-তে অঙ্কিত সুন্দর দৃশ্যে গুলি ছুঁড়লেন। দৃশ্যটি অদ্ভুত শব্দে রূপান্তরিত হল।

তিনি ভয়ঙ্করভাবে হাসতে গেলেন কিন্তু শব্দ হল না, শুধুমাত্র একটি ভৌতিক হাঁ-ই মুখে স্থির হয়ে রইল, কোন শব্দ নেই দেখে ভব দরজার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। হুজুর ঘোড়া তুলছেন, আর টিপছেন। ভব কাছে এসে তাঁকে তুলে ধরতেই তিনি বললেন, 'ভব আমি ঘুমাব' স্বর অতীব রুগ্ন। এইটুকু সময়ের মধ্যে রঙ যেন কালো হয়ে গেছে।

ভব খানিক মদ দিল, হুজুর মুখে দিতে গিয়ে গেলাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'ব্রাণ্ডি এত লাল কেন।'

এখানটা বাথান মত, মহুয়া আর নিমে ঘেরা। সময়ের কিছু আগে মহুয়া ফুটেছে, তারই ভাতুই গন্ধ। হাওয়ায় কিছু কিছু খসে পড়ে। শাজাদ এখানে শুয়ে ঘুমায়। মাঝে মাঝে তার শরীর চমকে চমকে উঠেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা।

শিবাই বামুন এবং অন্যান্যরা মৃদুস্বরে একটি দেহেলা গান গায়, শবদাহের পোড়ার শব্দ এই গীতে বর্ত্তমান। শ্মশানে এ গান তারা গায় 'যবে এ দেহ্ তরণী ডুবে যাবে, ও তোর ডোবা খোপে নোনা লেগে রঙ খসে পড়িবে।' দেহেলা গানের সুরে মন বড় কেমন-কেমন করে। শাজাদের চোখে জল গড়াচ্ছিল, বুঝা গেল তার ঘুম ভেঙেছে। দু-একবার চোখ জোর করে চেপে ধরেছিল।

ঘোতাই কলসি থেকে কি যেন একটি খাবরিতে গড়িয়ে শিবাইকে দিল, শিবাই বললে, 'কোম্পানীকে দাও!'

চোখ বুজিয়ে শাজাদ বলেছিল, 'বামুন বারুদের গন্ধ পাও?'

'পাই।'

'কোত্তি এতেক শিয়াল ছিনাছিনি গো।'

'মনে লয় গোবেন্দপুর।'

গোবিন্দপুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদ দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। মাথাও ঝাঁকানি দিলে, এ কারণে যে তার একটি দৃশ্য কল্পনায় এসেছিল। যথা— গোবিন্দপুরের আধা ভাগাড়, সেখানে নিশ্চয়ই আলমকে ফেলে দিয়েছে, নিশ্চয়ই মুচিরা তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে (কেন কে জানে) বালমচির নিয়েছে। অনেক শাদা হাড়ের মধ্যে সবুজ ড্যাঙ্গায় গোলাপী আলম পড়ে আছে, খুরগুলি কালো, নাক মুখ কালো। শাজাদ আর স্থির থাকতে পারল না, ভিতরটা যেন বাহিরে বার হয়ে আসতে চায়। চিক করে থুতু ফেলে, হাপরের মত কাঁপতে লাগল। ক্ষোভে রাগে অধীর। শুধু বলেছিল, 'আমার বুকে লাথি মেরে মেরে ফেল গো!'

ইয়াসিন বললে, 'ই হো, ই হো চেঁচাও কেনে, ক্যাপা হইছ হে? টান খাবে, না পাউরা…।'

'ক্ষ্যাপাই বটে রে মিয়া,' বলে উঠে খুব নীচু একটা ডালে বসে বললে, 'আমি মানুষ নই মিয়া ভাই।'

ঘোতাইয়ের একটু খুকী নেশা হয়েছিল, সে চিক করে মদে-তিক্ত থুতু ফেলে বললে, 'আরে হে হে পরাণ তুমি আবার মানুষ ছিলে কবে হে? কোথা বুকে চাপড় মেরে হেঁতেল শাণ দিবে না, আঁচলে বান ডাকাচ্ছ।'

পাউরা মুখে ঢালতে ঢালতে হাত নাড়িয়ে বললে, 'আমার বহুত পাপে আলম গেছে…আমি…'

'আহে ডরে ডুকরাইছ বল…বিবাগী হবে বটে…' ইয়াসিন বললে, 'তুমি শালা

লিজ্‌জেই জাহান্নাম, তুমি জন্মাও নাই, তুমি শালা তরমুজী রাঁড়ীর পরনের তেনারও অধম।'

'কি বললি?' বলেই শাজাদ লাফ দিয়ে এল, খালি পেটে সত্ত পড়তেই পেট মোচড় দিয়ে উঠেছিল, ঝপ্‌ করে ঘোতাইয়ের ঘাড় আর ইয়াসিনের গামছা মত কাপড়টা ধরে ফেলেছিল। ঘোতাই এ ব্যাপারে বিশ-পঞ্চাশটি ছোট ছেলের মত কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

শিবাই উঠে ত্বরিতে শাজাদকে ছাড়িয়ে বললে, 'যে শালাকে মারার কথা তাকে মার গা' বলে ঠেলা দিল। শাজাদ পুনর্ব্বার ডালে বসে স্থির হয়েছিল; তার দুটি হাতের উপর মাথাটি ন্যস্ত।

এখন চাঁদের আলো এখানে সেলাইয়ের ফোঁড় কাটা। মদ খাওয়ার আরামের শব্দ, আর মহুয়া পড়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ শাজাদ বলে উঠল, 'একটা যদি বন্দুক পেতাম…'

নিমাই এবং ইয়াসিন তাকে ভেংচে, কান্নার সুরে, 'ও হু হু হু' করে উঠেছিল। ইয়াসিন বলেছিল, 'মরি কি পাট্‌ঠা মরদ, গায়ের দরদ…সাবাস!' তারপর খুব লাগসই আবদারে গলায় বলেছিল, 'কেনে হে ঘোড়া মারবে কি হে?'

শাজাদ পুনর্ব্বার চোট পেলে। তার অস্থিরতা শোনা গেল, হে হে করে লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, মাটিতে পড়েই উঠেই কার সঙ্গে যেন লড়তে লাগল, মাঝে মাঝে তারই হাপিস্‌-হাপিস্‌ শব্দ। কে একজনা মদের কলসি নিয়ে সরে গেল, যেখানে যেখানে সে আস্ফালন করে এগিয়ে যায় সেখান থেকেই লোক পাশ কাটায়। অবশেষে শোনা গেল দরদালান কাঁপান চীৎকার, 'দে শালা আমার হেঁতেল'।

'থাড়াও হে, যেতে যেতে ঘুমাই পড়বে বটে,' শিবাই বলেছিল।

শাজাদ তৎক্ষণাৎ একটি ঘুঁষিতে তার প্রত্যুত্তর করেছিল, শিবাই মুখ সরিয়ে নিলেও অল্প লেগেছিল। যেখানে লেগেছিল, সেখানে একবার হাত বুলিয়ে বললে, 'আর একটু পাউরা খাও হে, জোর আসে নাই, ঘুঁষিতে ডর আছে, থোঁপা থোঁপা লাগে।'

'মস্করা লয়, আমি যাব,' শাজাদ বললে।

'রাত বাড়ুক বটে, এখন ত ঘোড়া মারার মোচ্ছব শুরু হবে,' ইয়াসিন বুদ্ধির কথা বললে।

সত্যই মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। হুজুর গান শুনছিলেন। সমস্ত সৌখীনতার উপর দিয়ে কে যেন লাফ দিয়ে উঠেছিল। যে বুকখানি অনেক রেখা অযুত রঙ দিয়ে তৈরী এখন ঘোড়াটি সেখানে নাল ঠোকে। ঠুকে ঠুকে অভ্যন্তরের শিকড়-লাগা ফোয়ারাটিকে ক্রমে ভেঙে ফেলতে চায়। এ দৃশ্য মদে স্থির, অসভ্য আলিঙ্গনেও মাথা তুলে উঠে। হুজুর অন্যমনস্কভাবে বন্দুকটা স্পর্শ করত চেপে ধরেছিলেন।

অন্য হাতে হুজুর বাইজীকে আকর্ষণ করে নিজের হাতের উপরেই রাখলেন, বাইজীর হাত থেকে একটি মেওয়া খেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। কোথাকার এক অনন্ত রাস্তা তার মধ্যে সমস্ত কিছু বীভৎসতা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে, কক্ষের পর কক্ষে এখানেও প্রতি ইঙ্গিতে প্রতিবিম্ব, বিচ্ছুরণ অমোঘ নিত্যতা সৃষ্টি করেছে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রকাণ্ড সোনা-কেয়ারি ফ্রেমে, যেন বড় অন্ধকার।

বাইজীর গীতের মধ্যে কাঁধে ভাঙন দিয়ে তাল সমতা রাখতেই, হুজুরও চমকে উঠেই বললেন, 'কি মেহের, ডরতা…ডর কেয়া' বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি আছি, হাম হ্যায়'।

আয়না আর ঝাড় কলসে ঠিকরান আলোর মধ্যে এরা অটুট। এখানে একটি মুহূর্ত্ত নেই যেখানে প্রকৃতি বর্ত্তমান, গোলাপ সত্যিই ত আর মানুষের হাতের খেলনা নয়। এখানে কোথায় হুজুর দাঁড়াতে পারেন। মনে হয়, ওই শাদা মৃদু পুতুলটাকে গিলে ফেলি। মনে হয় গান তার স্মৃতিকে ছাপিয়ে উঠুক। হঠাৎ বাহবা দেবার নামে অসম্ভব চীৎকার করে উঠলেন। গীত চমকে থেমে গিয়েছিল।

'ভব।'

ভব তাঁর কাছে এল।

'রতি পাইক!'

'কেন?'

'ডাকাত…সে শালাকে আমি খুন করব।'

'সে কি!' বলে ঈষৎ হাসির ধমক দিল।

হুজুর বললেন, 'তুঃ শালা' বলে হেসে নিয়ে খুব মেয়েলী স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ট্রেন কখন রা' বলেই একটু বেশী সাহসী হয়ে বললেন 'আজ ঘরটা কেমন যেন ম্যাদাটে ম্যাদাটে লাগছে না রে…জংলী চাকর-বাকর নিয়ে কোন কাজ হবে না, এই কদিন দেখিনি প্রত্যেকটা জিনিসে যেন সাঁজ লেগেছে।'

'তা বটে···তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে আর—'

'আচ্ছা ভব ঘোড়া ভূত হয় ?'

এ কথায় ভব কোন উত্তর দিতে পারল না, অথবা সে ইচ্ছা করেই উত্তর দেয় নি। গানের প্রশংসায় 'আহা' দিলে এবং এক চমক গানের কলিও সে ধরেছিল যথা—'আ কদর পিয়া রে'।

হুজুর একটি শ্বাস ত্যাগ করে পায়ের তেলোতে হাত বুলোতে লাগলেন। তিনি বোধ হয় কিছু ভাবছিলেন।

এখন অনেক রাত। সারেঙ্গীওয়ালা সারেঙ্গী জড়িয়ে শুয়ে, তার রূপার বোতামের ঝালর তাঁতে লেগে আওয়াজ তুলছিল। বাইজী তাকিয়ায় হাত রেখে, বাঙালী স্ত্রীলোকটি তাকিয়া গোট করে কালীঘাটের পটের মত। ভব শব হয়ে আছে ; একমাত্র হুজুরই জাগ্রত, তিনি তাঁর হাতের হীরার আংটি ঘোরাচ্ছিলেন। বুনো হাওয়ায় কলসের ডুবলি (ধুকধুকি) নড়ছিল। তারই কোমল নিখাদ, খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

হুজুরকে কে যেন জোর করে উঠিয়ে নিল। এ বোধ হয় কক্ষে রক্ষিত সৌখীনতার আত্মা। যা চির স্থিরতার মধ্যে এক একবার অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। হুজুর নিজে কিন্তু বন্দুকটা তুলে নিলেন। একবার মাত্র থমকেছিলেন, রঙিন ভাস উদ্‌ধৃত উড়োন-গোলাপ তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

চাঁদের আলোতে বুড়ো মানুষেরা কি অসম্ভব ভৌতিক হয়, উপরন্তু যদি তার চোখ অর্দ্ধ উম্মিলিত থাকে। রতি পাইক বুকে হাত রেখে এখানে হুজুরের ঘরের সামনে ঘুমায়। হুজুর এসেই পা দিয়ে তাকে ঠেলা মারলেন।

রতি উঠেই দেখল, সামনে বন্দুকের নল। রতি পিছনের লোকের গাত্র-সুবাসে বুঝেছিল, ইনি কে।

'হুজুর' বলে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলে।

'রতি, কোথায় তোকে মারব বল ?'

রতি উঠে সহবত দেখিয়ে মুখ তুলে চাইল, ঘরে আলোয় ঝোপঝাড়ের মত মুখ। শুধু ভ্রূদ্বয় উঠে নামে।

রতি পাইক তবু হাতজোড় করে বলেছিল, 'হুজুর এমন ভাগ্য কি আমার হবে।' কিন্তু বলে রতি আর দেরী করল না, কোমরের কষিটা একটু আঁট করেই দৌড়াল।

মাতৃস্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী অযুত ঐশ্বর্য্য ; জিহ্বাহীন অন্ধকারের সম্মুখীন অজর

ঝরনার মনোহারিত্বের পাশ দিয়ে কখনও ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে রেখে; বৃদ্ধ রতিকান্ত পাইক পলায়মান, পিছনে টাল-খাওয়া মত্তপ নূতন হুজুর।

হুজুর বলেছিলেন, 'তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন...'

তাই রতি ছুটতে ছুটতে বলে চলেছে, 'আমি কি বলেছি, তাঁরা কেমন ছিলেন, তাঁদের দাপট, তাই বলে...এখন বলব—তাঁদের দাবে ভূত পালাত হাত বুনেদী খেতাবী' বলতে বলতে সে এখন সিঁড়ি দিয়ে নামল। গাড়ী-বারান্দা · তারপর রাস্তা, পিছনে বাবু। কে যেন তাঁকে দৌড় করাচ্ছিল, না হলে এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। রতির পক্ষেও নয়।

রতি দাঁড়াল, বললে, 'একটা ঘোড়া মেরে এত ভয়, হা কপাল' এই সময় হুজুর যেই বন্দুক উঠিয়েছেন রতি আবার দৌড়, মুখে তার এক কথা, 'একটা ঘোড়া মেরে...জমিদারী করা' এ সময় গুমটি ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল বললে, 'এইখানে যত বেটা মরেছে কেঁদেছে, সে শুনলে ত আঁতুড়ে মারা যেতেন, তারা ছিল মানুষ ...কয়েদে যাও এখনও কান্না শুনতে পাবে—তাদের মুখে ত ভাত উঠত না, কত গাঁ জালালে, কত ঠগ মেরে সাধু করলেক আর তার বংশে এমন!' রতি আর দৌড়তে পারছিল না তাই সে আর বলেছিল, 'না আমার মরাই ভাল বটে হুজুর তোমার গুলিতে আমায় মেরো না আমি গাছে ঝুলব...তোমার গুলিতে মরলে আমায় আবার জন্মাতে হবে...' হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

কয়েদখানার মধ্যে চাঁদের আলো ছিল। ফলে দরজার গরাদ মিলে, কোথায় যেন মড়ার খুলির মত। পরপর গরাদগুলি ভয়ঙ্কর দাঁত। হুজুর একবার রতির দিকে অন্যবার গরাদের দিকে চাইল। রতি কাপড় দিয়ে ঘাম মুছছে, হুজুর কয়েদখানার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফার্নের পাতা নড়ছে। ভয়ে চীৎকার করতে গিয়েই ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—দু-একজন পাইক। বললেন, 'রতি ওদের লণ্ঠন আনতে বল আমি নিজে কলি ফিরাব।'

একজন কলসি উপুড় করে মুখে ঢালবার চেষ্টা করলে দুয়েক ফোঁটা পড়ল। এখন রাত্র গভীর। দূরাগত চৌকিদারের 'হৈ' আসে, এবং মাদলের টিম্ টিম্ আওয়াজ। আর শুকনো পাতার কঙ্কালিক শব্দ। জন্মের আবেগ অসংখ্য বিচিত্র-তায় টোপ গিলে আছে।

কীটের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কমেছে, নিশ্বাসের উষ্ণতার মধ্যে সমস্ত চরাচর।

আর একজনের উষ্ণ নিশ্বাসে অন্যে ভীত, এ কারণে যে আসন্ন দাঙ্গার উৎ-সাহে সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বল। এ ওকে ধাক্কা দেয়, অথচ পাতা খসার শব্দে, অথবা মহুয়া যখন বিচ্যুত তখন, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিম্নে এবং গাছে যেখানে চন্দ্রালোক পুষ্পিত সেখানে চকিত হয়। এ দৃষ্টি সন্দেহবাচক। কেহ আরও ভীত, মহুয়া গায়ে যদি পড়ে তবেই ল্যাজ তুলে। কেউ এই সুযোগে কিছু সাহস দেখায়, দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছিল।

শাজাদ আর এক ভূমিকায়, বাঘেলা দাপটে একবার এদিক অন্যবার আর-একদিক পদচারণা করে, সে কখন বা আলো-আঁধারের মধ্যবর্ত্তী, দুই হাত উপরে তুলে হো হো করে উঠে। এরূপ যে সে কাউকে আহ্বান করছিল। এর সঙ্গে শিবাইয়ের, আর এক তান্ত্রিক স্বরে, 'ওঁ হে লম্বোদর⋯মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলংদণ্ডঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে – হে – শৈলসুতা-সুতঃ গণপতিং সিদ্ধিপ্রদ কামদম। হে লম্বোদর।'

শিবাইয়ের চীৎকারে সকলেরই গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। শাজাদ চুপ, উর্দ্ধে হাত দুটি জোড়া করে ঝাঁকি দিয়ে বললে 'বা জান বা জান' এমত সময় কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে এল। নেমেই খবর দিলে, সঙ্গে সঙ্গে হো হো, লম্বো-দর ইত্যাদি নানা ডাকে আক্রমণের খেদানি দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। এখান থেকে রাঘবপুর অনেকদূর, তবু কেন যে তারা ছুটছে তারাই জানে। এখনও তাদের ছত্রাকার দৌড় দেখা যায়, ধূলা উড়ে।

আর কিছু দূরে গ্রীক মন্দির যেমত। এখানে সকলেই থেমেছে, হেঁতেল শক্ত করে ধরে। অনেকেই টুকটুক মাটিকে নমস্কার করে নিয়েছিল, শাজাদ, 'মা মাগো' বলে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকালে⋯মাথা যেন উঠতে চায় না, একটু চোখ ফিরিয়ে দেখলে ইয়াসিন। তার সম্মুখে হাত দুটি গ্রন্থের মত খোলা। সে নিত্যকর্ম্ম আচার জানে না, তবু সে জানে ওরই মধ্যে মন থৈ পায়। আর এক কথা যে, সে যে অন্যায় তছরুপ করতে যাচ্ছে না, তার কৈফিয়ত তাকে দিতে হবে। শাজাদ ভীত হল, হাঁকলে, 'হে লুতফর বাপ্!' কোথায় যেন সে নালিশ পাঠাচ্ছে অর্থাৎ ইয়াসিন তাই সে ধমক দিয়েছিল।

শাজাদ, খেলারাম, শিবাই এবং সঙ্গে ইয়াসিনও ছিল এরা পিছনের দিক দিয়ে উঠে এসেছে। এ ঘরে সকলেই নিদ্রিত, ঘুম মানুষকে কি অসভ্য করে তুলে, খেলারাম হাঁ করে চেয়েছিল। এমন সময় রতির পিছনে হুজুর বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

শাজাদের চোখ বড় করে ইশারায় সকলেই সতর্ক হয়েছিল। শিবাই 'যাঃ' বলেই নিজের মুখ নিজে চেপে ধরল।

শাজাদ শুধু অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওরা কোথায় নীচে চারজন ত?'

শিবাই শুধু মাত্র জোরে নিশ্বাস ফেলে সায় দিয়েছিল। এখানে তারা চুপ করে রইল। সামনের খোলা ছাদ, দেখলে একটি লণ্ঠন নিয়ে···দুজন কারা যায়।

লণ্ঠনে দেখা গেল, হুজুরের সাদা পাগড়ি। যারা লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিল, তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আলোটা গুমটি ঘরে উঠে গেল। খিলানের একটি স্তিমিত ছায়া। সেখানে একটি লোক।

তারা নিচে নামল, এসেই দেখে দুটি লোককে কারা যেন ঘায়েল করছে। তারা আর দাঁড়াল না, সোজা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে যখন যায় তখন গুমটি থেকে কে একজন হাঁকল—'কে-হো।'

তারা প্রস্তুত হবার পূর্ব্বে এরা বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়ে গিয়েছিল, মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ে দিল, রতিকে খেলারাম কব্জা করলে। আর আর যারা রুসুখগাঁয়ের লোক এখানে ওত পেতে ছিল তারা এসে পড়ল।

হুজুর পিঁপে থেকে চুন নিয়ে কয়েদখানার কলি ফেরাতে অধৈর্য্য। তাঁর নিজের নামে গান তিনি গাইছিলেন, 'দাদার আমার বড় ছাতি দুয়ারে বান্দিবেন হাতি। দাদা গো যত টাকা লাগে গুনগারি' বলেই না ফিরেই বললেন 'আমি ভয় পাইনি'···বলে ফিরে দেখেন কে একটা লোক। 'ওরে একটু ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়···'

'মুখ মাথায় চোট দিও না' ইয়াসিন একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শাজাদের হেঁতেল লাগল।

অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল, হুজুর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পড়লেন। পা মাটিতে সরে সরে যেতে লাগল, রক্তাক্ত মাথাটা দেওয়ালের আগাছায় লেগে হাতের ছাপের উপর দিয়ে নামতে লাগল।

শাজাদ নিজের মুখ থেকে, চোখ থেকে, ছুটে-আসা রক্তটা মুছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ফার্ন গাছে যে রক্ত লেগেছিল তা টুপ টুপ করে পড়তে লাগল। হাতের ছাপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

খেলারাম একটু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। বললে, 'হুজুর তোমার রেণ্ডী-গুলো রাঁড় হল গো।'

শাজাদ বুকের কাছে কান পেতে দেখলে শ্বাস নেই। সে গম্ভীরভাবে উঠে গরাদ একটু ঠেলা দিলে। চোখ তুলে দেখলে, ইয়াসিন ঠেঁটি পরিহিত খিলানের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে, হাত তার গ্রন্থের মত খোলা, কার কাছে যেন বা ক্ষমা চাইছে। যেন বলছে মানুষের বিশ্বাস হোক তিনি আছেন। ফলে মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের ব্যবধান প্রান্তর প্রান্তর হোক।

পরিচয়, ১৩৬৬ পৌষ, মাঘ

রু ক্মি ণী কু মা র

এখনও, আপনাকে পুত্ররূপে অভিহিত করিবার, সম্যক, উদাত্ত কণ্ঠস্বর সৃষ্ট হয় নাই। অতএব উহারই, অন্ধকারের, অপ্রশস্ত, সহজ, ঋজু মধ্যবর্ত্তী স্থানে আপনকার অর্থাৎ প্রাকৃতজনের তপ্ত ব্যক্ত সন্তঃ নিশ্বাসের মৃদু অভিমান তথা চক্রবৎ সত্যের যদিও শস্যের জীর্ণতা পরিণাম দৃষ্টিকে প্রখর ও যুক্তিকে সংহত করিলেও সন্ধ্যাকে ব্যাপক, যে কোন মুহূর্ত্তে স্মরণীয় করিয়া তুলে নাই, শুধু অমোঘ সফলতা চিন্তায় বেপথুমান।

রুক্মিণীকুমার প্রত্যুষের এই বিরাট নগরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একটি সাধারণ লোকগীতি গাহিতে চেষ্টা করিল, দিকসকল তাহার সুন্দর শরীরের মধ্যে বহুদিন হইল পথ হারাইয়াছে, চন্দ্রসূর্য্য তাহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া মরিয়াছে, সে, রুক্মিণী, আপনকার স্বরচিত?

অন্ধকারে সে আসা যাওয়া করে, অবশ্য একথা সত্য যে বিস্ময় নিয়ত স্রোতোধারা দর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত তাহা অতীব শ্রীসম্পন্ন মসৃণ নবতম ললাটের সৌন্দর্য্য, সমীরণ উদ্বাস্ত প্রদীপশিখার ধীর স্বর্ণাভ আলোকে সম্পূর্ণ সুডৌল এবং অনেকগুণে অসহ্য পরাক্রমশালী সন্ত্রাস্ত তাহারই, বিস্ময়, সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং স্তব্ধ এবং নিশ্চিন্ত এবং সমাহিত।

ইহা ব্যতীত, নিশ্চয়, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, যে বিহ্বলতা ঘুমের আধো জাগ্রত অবস্থায় কোন এক সাগরসৈকতে যাহা আশ্চর্য্য বিশুষ্ক ও সমকালীন সেই স্থানেই, দুর্য্যোগময়ী চন্দ্রালোকিত রাত্রে, আহতমর্ম্মা হইয়াছে, হায় সুপ্রাচীন লবণাক্ত গূঢ়তম স্বাদ! যেক্ষণে দ্বন্দ্ব ও ঐকান্তিক রঙের অভিজ্ঞতা, কীটবিহীন শূন্যতায়, একীভূত হইয়া একক চরিত্র লাভ করত আপনকার অন্তরঙ্গতার পথ নির্ণীত দর্শনে সবে মাত্র, জানালার পরিকল্পনা ও সে-জানালায় ফুলের আধার রাখার দামী অধৈর্য্য।

তখন সে ছাদে, নিম্নে সুসংবদ্ধ গম্ভীর স্নায়বিক অনন্ত কলিকাতা, শূন্যপথ অচিরাৎ বিচ্যুত কোন এক বিরহী যক্ষের আত্মা ভূমিলুণ্ঠিত শতধা হইয়া অগণন দাম্ভিক চতুষ্কোণ মণ্ডিত, উহা সুতীক্ষ্ণ আয়ত পদ্ধতির নিশ্চয়তা এবং স্তব্ধ

চেতনার, যদিও বাহুবন্ধনের প্রকৃত পূর্ণরূপ, পক্ষীশাবকের অসহায়তাই যাহার উপলব্ধির বীজ এমন নহে, সূক্ষ্ম চতুর ধনী অবয়ব; যে চেতনা বজ্রের অহংকারদৃপ্ত, প্রকৃতির লিখিত আওয়াজের বৈপরীত্যে স্থির এবং ধৃষ্ট বিধিলিপির করতলগত একটি নির্ভীক সচেতন পদার্থ।

সে আপনার বীরত্বকে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে জাগ্রত করত এখন সুন্দর বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় তাহার আয়ত, দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, এরূপ স্পষ্ট করিয়া এ-শহরের বহুকাল দেখা হয় নাই, এতাবৎ যাহার রাস্তাঘাট, সমুদয় আশ্চর্য্যকে সে যন্ত্রের মত ব্যবহার করিয়াছে, ইহার এক পথ হইতে অন্যপথে পৌঁছিয়া প্রথমত স্বস্তির দ্বিতীয়ত বুদ্ধির নিশ্বাস ফেলিয়াছে, ফলে কলিকাতার বাতাস তদানীন্তনকালে ঈষৎ উত্তপ্ত হয়। বেচারী, শান্ত অবিকৃতভাবে পথ-চলার সংস্কার পূর্ব্বজন্মেই, হয়ত ভুলক্রমে, ফেলিয়া আসিয়াছে, পিছন তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে, আজও করে। তবু রুক্মিণীর আজ এই অপ্রশস্ত ছাদে, নিজেকে অসম্ভব অফুরন্ত, লঘু, ছেলেমানুষ বোধ হইতেছিল। এহেন অনুভবে, এ কথাও, হয়ত, ক্ষণেকের জন্যই অকারণেই তাহার মনে উদয় হয় যে সে ভারক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত; প্রকাশ থাক যে, এ হেন ক্লান্তির কখনই তৃষ্ণা নাই যেহেতু তাহা জিহ্বাহীন; সমীরণের অপেক্ষাও নাই এ কারণ যে ইন্দ্রিয় সকল অভিব্যক্তিশূন্য; উহার অবশ্যম্ভাবী আরাম দূরতম কোনও শতাব্দীর সজীব প্রাচীর-চিত্রাবলী কিম্বা অতিদূর হেম উপত্যকার ক্ষীণদেহী, খর, রাশভারী, সুন্দর, নিশুতি রাত্রেও পরিচ্ছন্ন, গভীরতার ইঙ্গিত প্রদর্শনকারী সুদৃঢ় রেখা সমান, দারুণ, তীব্র স্রোতস্বিনী। কিন্তু ব্যঞ্জনা অক্ষর-বিরহিত অতি সনাতন লোকসঙ্গীত গুঞ্জন করিবার বাসনাই তাহার বিশেষ, সেজন্য ভ্রূযুগ চঞ্চল এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সুললিত ছন্দ তাহার ওষ্ঠেই ইদানীং লুপ্ত।

গঙ্গামণির, তাহার মার, প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; গঙ্গামণি সকালের রাত্রি-বিজড়িত শরৎকালীন বিশেষ রক্তিম আলোয় দণ্ডায়মান অবস্থায় নিঃশঙ্ক চিত্তে মালা জপ করিতেছিলেন, এ মালা স্ফটিকের; সর নাপতিনী ৺পশুপতিনাথ কৈলাস মানস সরোবর তীর্থ করিয়া আসিয়া এই উৎকৃষ্ট মালা দিয়া প্রণাম করে, যেহেতু তাহারা ব্রাহ্মণ; এখন এ-মালা, যাহা স্ফটিকের, তাহার মার হস্তেই ভ্রমণশীল, দর্শনের অর্থাৎ যোগসাধনার সত্য। রুক্মিণী অন্যমনে মালাখানির উঠানামা লক্ষ্য করিয়া পরে তাঁহার মুখমণ্ডলের, যাহা পৃথিবী পরিক্রমণের ফলে

দিনের গর্ব্বে হৃষ্ট, তাহার শ্রী, ধী দেখিয়া অল্পকালের জন্য অবাক, বৃদ্ধার অঙ্গুলির ফাঁকে বিরাট নিরবয়বের অন্তঃকরণ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সূত্রে, পুনরায় তাঁহার ওষ্ঠে গঙ্গোদকতুল্য পবিত্র শব্দরাজি ধ্বনিত হইতে থাকিল, 'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য স্যোক্তাঃ শরীরিণঃ অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত; য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।' এই শ্লোকদ্বয় তাহার সঙ্কল্পকে কেবল মাত্র দৃঢ়তর করিবার মানসেই নিত্যই উচ্চারিত হয়। সম্মুখে বিবৃতাঙ্গ কলিকাতা।

অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, কৃষ্ণ হিম, নিঃসন্দেহে বলা যায় ঝিল্লিরব মুখরিত বনরাজি আবেষ্টন করিয়া আছে, চিমনীর লহর করা শিরস্ত্রাণ, প্রাসাদের শীর্ষ ত্রিভুজে জড়োয়া নক্সা, মাঝে মাঝে কপোতের ঝটিতি উড়ে চলা, নীলিম ধোঁয়ার উর্দ্ধগতি রেখা, আর অসংখ্য রাস্তা যাহাতে প্রতীকের কোন মেয়েলী দুঃস্বপ্ন নাই, এপাশে গম্ভীর মন্দিরের চূড়া, অন্যদিকে, প্রার্থনা স্থাপত্যে রূপান্তরিত, মসজিদ। কোথাও গঙ্গা-স্নানার্থী, কোথাও ব্যস্ত মানুষ, লাঞ্ছিত কুকুর, ফেরিওয়ালা সকল কিছু মিলিয়া স্বামী যে শয্যায় শয়ন করেন তাহাই যেমন মহিলাগণের সুখদায়িনী তেমনি এক পরম রমণীয় অধৈর্য্য বিছানার মায়া সৃষ্টি করিয়াছে।

এতদ্দর্শনে সম্মোহিত রুক্মিণী আপনার ক্ষোভপ্রসূত আক্রোশে মা ভৈ মন্ত্রে উদ্ধত পুরুষকারকে জাগ্রত করিয়া মহা আস্ফালনে, তাহার অজানিত ভীম প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখসমরে আহ্বান করিল। আরবার বালকবৎ উৎসাহে, সে ঘোর রৌদ্রকর্ম্মা কণ্ঠে, নির্ঘাত বাক্য পরম্পরা ঘোষণা করে। তাহার এবম্প্রকার উক্তিতে সমগ্র ত্রিভুবন পাণ্ডুর শরতের বিমল আকাশ দূরে সরিয়া যায়।

গঙ্গামণি বক্রভাবে পুত্রের প্রতি তাকাইয়া কহিলেন, 'কি কুক্ষণে বললুম। সাত-সকালে ছাদে…'

রুক্মিণী মার কথার উত্তরে কেবল মাত্র মৃদু হাসিয়া, প্রাণ ভরিয়া কলিকাতাকে দেখিয়া, মার বস্ত্রখণ্ড যাহা উড়িয়া একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা, ফণিমনসার আধার রূপে ব্যবহৃত, টিনের কানায় আটকাইয়া গিয়াছিল, তাহা খুলিয়া লইবার অভিপ্রায়ে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়।

সহসা রুক্মিণী বিদ্যুৎ-আহত হইল। ক্ষণেকের মধ্যেই আপনকার অস্তিত্ব শতচ্ছিন্ন, সে না তাহার অন্ধকার কোনটি এখন বাস্তব, তাহা সে বিচার করিবার কচিৎ অবসর লাভ করে নাই, নিশ্বাস দুরন্ত কীটপতঙ্গেরা শুষিয়া পরিতৃপ্ত,

কর্দ্দমাক্ত বেলাভূমি হইতে নৌকা সবেগে প্রবাহমধ্যে অবতরণ করিতেছে, অপ্রত্যাশিত নৌকা আগমনে জলকেলিরত পক্ষীকুল কাতর আর্ত্ত কলস্বরে শূন্যে উড্ডীয়মান, কিছু বা ত্রাসে নক্ষত্রপথে ত্বরিতেই অদৃশ্য। স্বীয় চোখেতে গ্রহতারকার জ্যোতি লইয়া দুর্ব্বার বেদুইন, যেমত বা নিরতিশয় সহজভাবে, আপনার তর্জ্জনীর দ্বারা নিশীথের অয়স্কান্তিমান অম্বর প্রদর্শন করাইল, এবং আকাশ স্বচ্ছসলিলে অবগাহন করিয়া নূতন হইয়া উঠিল। যন্ত্র অচিরাৎ বিলম্বিত সর্প অপি রুষ্ট হইয়া কঠোর নিনাদ দ্বারা বহুবর্ষব্যাপিনী কীর্ত্তিকে সঙ্কুচিত করিল, যান্ত্রিকতা স্বগত চমকপ্রদ প্রভাব হারাইল; সংখ্যা আপনকার বুদ্বুদের ক্ষণিকতায় অন্তর্হিত; প্রজ্ঞা ক্ষীণ, নিষ্ঠা ধূলিশয্যাশায়িনী, ঝটিতি শর্করাকর্ণী প্রবল বায়ুর ভয়ঙ্কর ঘাতে হেমনির্ম্মিত তুলাদণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, চপলমতি আদিবাসীরা করতালি দিল; প্রহর গণনায় ছেদ পড়িল; নিশ্চিত কাম উচাটনকারী ক্ষিপ্র অঙ্গদহনকারী শব্দ সকল সমুত্থিত হইয়াছে।

রুক্মিণীকুমার, অবশ্যই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, আত্মরক্ষানিবন্ধন সতর্ক হস্তযুগ ইদানীং শিথিলকৃত হওয়াতে তখনই স্থবির— ঈষৎ উত্তোলিত হইয়াছিল।

কেননা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীর ঘেরা ছাদস্থিত সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বাস্তবতার সম্মুখীন, যাহা হঠাৎ প্রত্যক্ষে সে স্তম্ভিত, যাহা সৌন্দর্য্য যাহা বিভীষিকাপ্রায়। দেখিয়াছিল গোলাপ-ছাপ সংচ্ছন্ন নীলা লিনোলিয়মের উপর শায়িতা, বিবসনা, ইহার তুমুল কেশরাশি জলভারাক্রান্ত মেঘ ইব, সুগভীর গম্ভীর যৌবনা কেহ, যাহার অঙ্গ গোরোচনা, যাহা শারদ সূর্য্যালোকে কাঞ্চনবর্ণ।

যুগপৎ যাহা সুন্দর যাহা ত্রাসদায়ী।

তখনই রুক্মিণী যাহা অঙ্কিত প্রোচ্ছলিত রক্ততরঙ্গ এমন দেখে, কখনও যাহা অদূরে লণ্ঠনের আলোয়— কর্ত্তিত কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মতই; আশ্চর্য্য কল্ট ৪৫-এর গুলির আওয়াজ এখনও দিকসকলে প্রকম্পিত, জানালার এপাশে দাঁড়াইয়া পলায়মান কুকুরের ও সদ্যঃ নিদ্রা-উত্থিত পক্ষীদের আর্ত্তস্বরের মধ্যে— তাহার, রুক্মিণীর, মনে হইয়াছিল, পিচকারী রক্তধারা দর্শনে, যে উপেনের রক্ত মানুষের মত! মানুষের রক্ত লাল? রুক্মিণী অপার্থিব কামভাব অনুভব করিল।

এমন সময় উচ্চরবে বলিতে চাহিল মানুষের রক্ত লাল! এহেন ভাবনায় রুক্মিণী সমাধিস্থ, সে এক পরিণত অন্ধকার; এমত কালে অচিরাৎ কক্ষমধ্যে কোন অল্প স্পন্দন তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দেখিল একটি পোস্ট কার্ড নিকটস্থ বেসামাল করোসিন কাঠের টেবিল হইতে চ্যুত হইয়াছে— এখন যে টেবিলের উপর

উপেনের দেহ শেষ আশ্রয় লইয়াছে— ক্রমে রক্তধারার নিকট পড়িল!

নিশ্চয়ই এই বর্ত্তমানতা রুক্মিণীর অন্তরে চিরবহমানতার আভাস আনিয়াছিল। বিশ্বাস হয় যে, সে দূর হইতে উক্ত চিঠির পঙ্‌ক্তিগুলি পড়িতে পারে। শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং, অন্য পাশে গ্রামের নাম পোঃ জিলা চাঁদপুর, বাবা উপেন তুমি কেমন আছ, অনেক দিন হইল তোমার পত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তায় আছি ; তোমাকে নন্দ মারফৎ যে চিঠি পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে সবই অবগত হইয়াছ, চালা বদলাইবার জন্য চিন্তা না করিয়া···অথবা হয়ত রানীকে দ্বিতীয়পক্ষে দিবার আমাদের ইচ্ছা নাই···অথবা কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন তোমার বাবার আর আরোগ্যলাভের আশা নাই···

ইত্যাকার মোটা দুঃখের, বৈচিত্র্যহীনতার প্রতিবিম্ব তখন ঐ রক্তধারার মধ্যে ছিল, এবং অদ্ভুত নখের শব্দ উপজাত হয়। রুক্মিণী ঐ চেহারা সহ্য করিতে অপারগ, যদিও তাহার চোয়াল এখনও কঠোর শক্ত কিন্তু স্তিমিত, রিভলভারে ধোঁয়া ও গন্ধক মিশ্রিত গন্ধে সে নিঃশ্বাস লইয়াছিল। কক্ষ অভ্যন্তরের উপেন এখন চাঁদমারী আর নয়। আলোয় সমস্ত স্থান ধীরে বীভৎসায়িত হইতেছিল।

তবু চেয়ারের কঠিনতা তাহাকে এখন আলোর প্রতি গুলি ছুঁড়িতে প্রণোদিত করে, শিখা লক্ষ্যে সে রিভলভার ঈষৎ উত্তোলন করিয়া ট্রিগার টিপিল। নিমেষেই লণ্ঠন উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া— কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ এখনও মধুর— এক অসভ্য আলো ব্যাপ্ত হইতেছিল। কেহ যেন আলো উদ্গীরণ করিতেছে।

এইরূপ আলোয় বিশ্বাসঘাতক উপেনের কলিকাতা নিষ্পেষিত শীর্ণ মুখখানি দৃশ্যমান, উপস্থিত যাহা অতীব গ্রাম্য।

ঐ ধিকিধিকি চিল্লিকার শব্দময় আলো বিস্ময়কর অন্ধকার সৃষ্টি করিতেছিল। রুক্মিণী এমনই আলোর সম্মুখে ভয়বিহ্বল নেত্রে একদা দাঁড়াইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বের কথা রুক্মিণী স্মরণ করিতে চাহিয়াছে, জানালা দিয়া সে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহার কানে অবাক জলপান ফেরিওয়ালার আর্ত্তস্বর আসিতে সে বোধ করে যে এখন সে যেখানে তাহা একটি দুঃস্থ জীর্ণ মেসবাড়ির ঘর। খানিক আগে রাখালদার পশ্চাতে একটি কাঠের পলকা নড়বড়ে সিঁড়ি, ইহা অন্ধকারাচ্ছন্ন, বহিয়া সন্তর্পণে উঠিয়াছে। প্রতি পদক্ষেপে রাখালদা বলিতে-ছিল, 'খুব সাবধান,' আর সে ক্রমাগত শ্বাস লইয়াছে, তারপর একটি মারাত্মক কাশির আওয়াজ বামে রাখিয়া এই কক্ষে আসে।

এ ঘর নিজেই এক বিশাল মহামানব, এখানে স্থিতিবান হইয়া রুক্মিণীর

অন্তরাত্মা এককালে হরষিত ও অবশ, এমন সময় রাখালদা বলিল, 'এনেছি… এসেছে…'

রুক্মিণী কোনমতে নিরীক্ষণ করিল, নিকটের তক্তপোশে চাদরে আপাদমস্তকাবৃত কাহাকে রাখালদা সম্বোধন করিয়াছিল। এবং রুক্মিণী ঘর্ম্মাক্ত হয়।

চাদরাবৃত কেহ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আলো জাল…দেশলাই আমার মাথার কাছে…'

রাখালদার হাত তক্তপোশে শব্দ করিতে থাকিয়া অগ্রসর হয়, অন্বেষণের শব্দ কি বিস্ময়কর! এবার দেশলাই মিলিল, রাখালদার স্বস্তির নিশ্বাস এই কক্ষকে স্বাভাবিক করিল। এখন সমস্ত কিছু কিঞ্চিৎ আলোকময়।

রুক্মিণী সভয়ে চাদরাবৃত বিরাট একটি নামের দিকে চাহিয়াছিল। যদি রুক্মিণী সত্য স্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিবে তাহার মনে হইয়াছিল যে সে পলায়ন করে। ভয়ে তাহার জিহ্বা শুকাইতেছিল, সে আপনার মাকে ডাকিতে চাহিয়াছে নিশ্চয়ই নৃশংস পুলিশের চেহারা, পাপাত্মা ইংরাজের বাঁদুরে লাল মুখমণ্ডল তাহার সম্মুখে ভাসিয়াছিল, মনে হয় তাহার হাতে হাতকড়া পড়িয়াছে, পদদ্বয়ে বেড়ীর অস্বাচ্ছন্দ্য।

রুক্মিণী!

এই কণ্ঠস্বর অজস্রবার পৃথিবী পরিক্রমণ করত অবশেষে তাহার নিকট আসিল। অবশ্যই সে কাঁপিয়া থাকে। এবং পরক্ষণেই সে যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া উদ্বুদ্ধ। আরবার সে ঘর্ম্মাক্ত হইল। পলকেই তাহার সমক্ষে এক ঘটনা দেখা দিল।

চাদরাবৃত কেহ সম্প্রতি চাদর অপসারণ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। রাখালদার আজ্ঞা তাহার কানে আসিল, 'রামানন্দবাবু, প্রণাম কর।'

রুক্মিণী বিমূঢ় বটে, সে প্রণাম করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আড়ষ্টতা এখনও পূর্ব্ববৎ। সে যুগান্তকারী প্রচণ্ড গতিবেগের মুখোমুখী…মুক্তিকামী ভারতের প্রতীক এই সেই রামানন্দ বসু…ঠিক যেন আর এক বিবেকানন্দ।

রাখালদা বলিল, 'এখনও আপনার জ্বর আছে…'

'না তেমন কিছু নয়…' উত্তর দিয়া রামানন্দবাবু কহিলেন… 'তুমি রুক্মিণী… কেন আমার কাছে এসেছ জান…'

রুক্মিণী মৌন ছিল।

'আমরা যে পরাধীন একথা…আমরা যে শোষিত একথা…আমরা যে মৃতকল্প

একথা…তা তুমি জান…' এসময় রামানন্দবাবুর সুদীর্ঘ চোখে অশ্রু আসে।

রুক্মিণী শুধুমাত্র তাঁহার প্রতি অসহায়ভাবে তাকাইয়াছিল।

'উপলব্ধি করতে পারবে…'

রুক্মিণী তখনও স্থির।

'রাখাল লণ্ঠনটা দাও ত…'

রাখাল মেজে হইতে লণ্ঠনটা তুলিয়াছে মাত্র এবং তখনই রামানন্দবাবু তক্ত-পোশ হইতে উঠিয়া মেজেতে দাঁড়াইয়া লণ্ঠনটি গ্রহণপূর্ব্বক উহার পলিতা অসম্ভব বাড়াইতে লণ্ঠন হা হা করিয়া জ্বলিতে থাকে, শিস্ ক্রমান্বয়ে উঠে, উহা অর্থাৎ লণ্ঠনটি প্রায় রুক্মিণীর মুখের নিকট ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কখনও হস্তমৈথুন করেছ…'

রুক্মিণীর কণ্ঠশোষ আরম্ভ হইল। সে অদ্ভুত উপায়ে মস্তক আন্দোলনে জানাইল, 'না…'

'নারী সহবাস করতে ইচ্ছে হয়…?'

'আজ্ঞে না…' রুক্মিণী ভয়ঙ্কর আলোক শিখার দিকে চোখ রাখিয়া সত্য করিল।

'ভেরী গুড্…'

রাখালদা ধীরে যোগ দিল, '…আজ্ঞে ওর দাদা (সৎভাই) সন্ন্যাসী…ওরা খুব ধার্ম্মিক…'

রুক্মিণী এত আলো একসঙ্গে কখনও দেখে নাই—।

'তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর…তাহলে…'

'আজ্ঞে সব সময় ডাকি…'

'স্ত্রীলোকের থেকে দূরে থাকবে, গীতা পড়বে…বিদ্রোহীদের জীবনী পড়বে… বিবেকানন্দর…'

রুক্মিণী পুনরায় শিখা দেখিল। রামানন্দবাবু তাহাকে এক অশ্রুত পূর্ব্ব বীরত্বের সন্ধান দিলেন।

সে ফণিমনসা হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিল। চকিতে তাহার মধ্যে এক দুরপনেয় কাম সর্ব্ব শরীরকে উষ্ণ করিয়া তুলিল। সে অধীর হইয়াছে, একবার ইতিমধ্যে সে নীচে মার প্রতি তাকাইল। এবং তৎক্ষণাৎ আবার পার্শ্বের ছাদের দিকে দেখিতে বাধ্য হয়।

এখনও লিনোলিয়মের উপর শায়িতা রমণীর কোন ভাবান্তর হয় নাই, শুধু

দেখা গেল পার্শ্বস্থ একটি বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতেছে।

রুক্মিণীর মুখের চেহারা গঙ্গামণিকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে, তাই তিনি কহিলেন, 'আমি কি জন্যে তোকে উঠতে বললুম…'

গত রাত্রের ঝোড়ো বাতাসে গঙ্গামণির কাপড়খানি উড়িয়া এখন যেখানে রুক্মিণী, সেখানে, ছাদে, ফণিমনসায় দৈবাৎ আটকাইয়াছে! রুক্মিণী গঙ্গামণির কথা শুনিলেও নীচের দৃশ্যে সে আকৃষ্ট; এখানে উঠার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সে বিরক্ত হয়, কেননা তাহার মনে শঙ্কা কণ্টকিত হইয়াছিল, মাঝে মাঝে '৩৩ পিস্তলের শৈত্য তাহাকে ভয়ঙ্কর এক জগতে লইয়া যায়, যেখানে নিশ্বাস স্তব্ধ হওয়ার ক্ষণগুলি অপেক্ষমাণ…।

সে সেই শৈত্যে হাত রাখিয়া বা সেফটি ক্যাচ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার কালে দুন্দুভিনাদে

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥

এই পবিত্র শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উত্তরোত্তর দ্বিধাগ্রস্তই হইয়াছে; এক একবার পিস্তলের নল সে আপন কপালে বুলাইয়াছে, আর সে তখনই মা ভৈ বলিয়া উঠে।

উপেনের মৃত্যু, যাহা, রুক্মিণীর কেমন যেন সংস্কার, যে তাহা যেমন তাহার আপনকার হাতের তালুর উপরেই ঘটিয়াছে; ফলে এই আজব বিকারে সে ত্রাহি করিয়াছে। তাহার গাত্র অভাবনীয় উত্তপ্ত হইয়াছিল, এ সত্য প্রথম বুঝিতে পারে, যখন গৌরমোহন খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া উপস্থিত।

এই ঠোঙ্গায় পিস্তল ছিল, যাহা তাহার আত্মরক্ষার নিমিত্ত বা আত্মহত্যার নিমিত্ত পাঠান হয় (কল্ট লইয়া ঘোরা ফেরা যারপরনাই অস্বাচ্ছন্দ্যের)। এই ছোট যন্ত্র স্পর্শেই তাহার জ্ঞান হয় যে আপন দেহ অসম্ভব গরম।

অবশ্য এই কথাই তাহার মা যখন তাহাকে বলে তখন সে শুধু উত্তর দিয়াছে, 'ও কিছু নয়…'

'ও কিছু নয় কিরে, আমার মনে হয় একশো চার কি পাঁচ হবে…'

'তুমি ভেব না…জ্বরই যদি তাহলে উঠতে পারতুম কি…'

'তা বটে তবু একবার ডাক্তার…'

এখন এখানে আপনার কষ্ট-অর্জ্জিত দাম্ভিক দুঃসাহস লইয়া দণ্ডায়মান,

আপনাকে কল্পনা করে সম্পূর্ণ অভিনব বৃক্ষ আর চারিদিকে সমগ্র শহর তাহারই শিকড়, আপনাকে অবিশ্বাস্য হাল্কা অনুভব হয়। অতঃপর ঐ ছবি।

গঙ্গামণির কথায় সে প্রায় বলিতে উদ্যত হইয়াছে 'আঃ চুপ কর না' এ কারণ যে তাহার মনে হয়, ঐ কণ্ঠস্বরে নিম্নের সেই অগাধ সুবিশাল অপ্রমত্ত নয়নাভিরাম চিত্র ভাঙ্গিয়া কৌতুকপ্রদ লজ্জায় পরিণত হইতে পারে।

কিন্তু নিম্নের মহা পরাক্রমবিশিষ্ট অনন্ত অদম্য যৌবনার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্বেগ ছিল না, উহা নিরতিশয় উদাস, উহা নিরবধি, উহা শান্ত!

ইতঃপূর্ব্বে রুক্মিণীর চোখে বহু রমণী-দেহ পড়িয়াছে, বিশেষত কড়ি ঠাকুজ্জির বাড়ির ট্রাম ইন্সপেকটর গোবিন্দবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী সরলা, যে কলতলায় অনাবৃত দেহে স্নান করিত, লোকলজ্জার বালাই যাহার ছিল না, এবং যে এমন বটে, যে যৎপরোনাস্তি সতর্কতা সত্বেও রুক্মিণী তাহার সম্মুখীন, স্ত্রী-দেহের কূটজ বৈচিত্র্য, বিশেষত রোমরাজির পাশবিক বিদ্যমানতা, প্রত্যক্ষে সে আপন বয়সোচিত হ্রীজিত হয় সে, অবাঙ্মুখ সে এবং ঘৃণায় ক্রুদ্ধ, যে সে এখনও বালক, এমনকি স্কুলের পেচ্ছাপখানায় কুৎসিত লিখিত পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত যে পাপাত্মক ইহা তাহার জ্ঞান এবং ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে যেহেতু; অবশ্য তখনও তাহার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ হয় নাই।

অধুনা সে তেমনই অব্যবস্থিত চিত্তে সম্মোহে সে শ্যামীকৃত হইয়াছে, যে দেহকে সে সকল মুহূর্ত্তে শব্দ গন্ধ হইতে আড়াল করিতে পর্য্যন্ত তৎপর, সেই দেহ অনিবার্য্য বেগে ব্যক্ত হইতে চাহিল···এতাবৎ যে আমিত্বে সে নিষ্পেষিত তাহা উধাও– এক নবীন আশ্রয় সে বুঝিল নিম্নের রমণীদেহকে। কোন গুপ্তচর যাহার সন্ধান পাইবে না···এবং তাহার উৎকণ্ঠার এক অব্যর্থ আশ্বাস।

আরবার, তখনই, ইহা আভাসিত হইল উহা এক পুঞ্জীভূত স্থবির রক্তস্রোত··· এবং ইহার অতলে যাইতে চাহিল।

এতক্ষণ পরে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত করিল এই সেই রমণী।

গঙ্গামণির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কেননা এ সময় বহু ঊর্দ্ধে কালো আকাশে একটি তারা খসিয়াছিল, ফলে নিছক দীর্ঘশ্বাসদায়ী ইহা, এবং ত্রাসকারী অতীত সৃজিত হয়, আর যে ক্ষণিকের জন্য সদ্যঃ অপগত সন্ধ্যার সৌখীন বাতাস লাল, জবাফুল, ভয়ঙ্কর। তাহার গাত্র চমকিত হইল; অতি ধীরে, শ্রদ্ধার সহিত জপমালাখানি কপালে স্পর্শ করাইলেন ও অস্ফুট শব্দে ওষ্ঠকম্পনের নামান্তর

ইহা, তিনজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই সূত্রে আপন পুত্র রুক্মিণীর উল্লেখ চিন্তায় আসে।

গঙ্গামণির নিকট যেহেতু এই বাসস্থান ক্রমশঃ ভীতিপ্রদ হইতেছিল, অবশ্য ইহা সত্য যে এই আশ্রয় তাঁহাকে যারপরনাই আনন্দ দেয়, কেননা এখানে বিরাট আকাশ মিলিয়াছে— ইতঃপূর্ব্বে শোভাবাজার অঞ্চলের কড়ি ঠাকুজ্জির বাড়ি স্মরণে এখনও তাঁহার দেহ বিকল হইয়া যায়।

কি ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রা— গুমট স্যাঁতসেঁাতে জঘন্য সর্পিল অনুভব, রাত্রে কুকুরের খেয়োখেয়ি, ইঁদুরের উপদ্রব, তৎসহ নর্দ্দমার কূট গলিত শকুনখুসী পচা ঘর্ম্মাক্ত গন্ধ, যেখানে রুগ্না ভিন্ন সকল স্ত্রীলোকই কামুকী বিপথগামিনী, পুরুষরা লম্পট। বাড়িওয়ালী কড়ি ঠাকুজ্জির বাৎসল্যভাবে নগেনবাবুর ছেলে হরিকে, ১২ বৎসরের ছেলেকে, তেল মাখান দর্শনে গঙ্গামণি ঈষৎ মন্তব্য করেন। ফলে এই কড়ি ঠাকুজ্জিই পুলিশে খবর দেয় যে রুক্মিণী স্বদেশী করে।

ফলে যখনই পিছনের জানালা খুলিতেন তখনই দেখিতেন একটি মুখ। রুক্মিণী বলিয়াছিল, 'তুমি খামখা আঁতকাচ্ছ কেন, উঠতি বয়সের ছেলেদের পিছনে এমন টিকটিকি লেগে থাকেই…'

তারপরই ঝরাপাতার উর্দ্ধে এই আকাশ বড় ভাল লাগিয়াছিল গঙ্গামণির। এখন জপমালা হাতে যে আকাশ হঠাৎ অপরিচিত কেননা তাঁহার মনে আতঙ্ক ছিল, অদূরে তুলসীতলার ছোট প্রদীপ, ইহার থরথর আলোয় ছাদ কাঁপিতেছে। ছোট একটি নিশ্বাস লইয়া ছাদের শেষে যে টালির ঘর তাহার জানালা দিয়া কাহাকেও দেখা যায় কিনা এই মানসে ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া তাকাইলেন। অতঃপর দেখিলেন, আপনার মালা প্রদীপের শিখাকে শান্তভাবে পরিক্রমণ করে।

অন্যপক্ষে গঙ্গামণিকে রুক্মিণী ঘর হইতে নজর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, প্রদীপের পক্ষীশাবকতুল্য স্পন্দিত আলোয় তাহার মা— গঙ্গামণির মুখখানি ইদানীং প্রতীয়মান এবং সেখানে, তুলসীর সবুজতা এবং মার ভক্তির পরাকাষ্ঠা তথা গঙ্গামণি নিজেই— দুইটি আশ্চর্য্য এক রূপে ভাস্বর; এই বাস্তবতায় রুক্মিণী অতিমাত্রায় সচেতন, উহা আষাঢ়ের মেঘের নির্দ্দয় বিদ্যুতেরই সত্য; তাহার মধ্যে যে অধৈর্য্য যে বিরক্তি এতক্ষণ থাকে, তাহা ইদানীং অসহায়তা…নিজেকে অপরাধী সনাক্ত করিতে উহা প্ররোচিত করে, পবিত্রতার যে সে নিজে ছাড়া অন্য প্রতীক নাই তাহা নবীভূত হয়।

রুক্মিণী দেখিল, সুহৃদ তাহার প্রতি বড় চোখ রাখিয়া বলিয়াছিল, 'ফটিকদা (ওরফে রামানন্দ বসু) আমায় একদিন বলেছিলেন, শুকদেবের চেয়ে আমাদের দারুণ হতে হবে, কায়মনোবাক্যে সৎ। সেদিন গঙ্গার ধ্বনি কি ভাল লেগেছিল ···দেখ্ তোরা আমার···বিশেষত তুই আমার জীবিত স্বরূপ···চরিত্রে এতটুকু খারাপের ছায়া না লাগে···দেখবি শরীরটা কি হাল্কা।'

এই সততার তেজেই সুহৃদ জানাইয়াছিল···'আমার মনে খেদ নেই···জানি আমার ফাঁসি অব্যর্থ···ব্যারিস্টার দাশ বলছিলেন অবশেষে কিংস মার্সি···শুনে যেন অপবিত্র হয়ে গেলুম··· ।' আর একদিন ব্যক্ত করে, 'হ্যাঁ জেল ফুঃ আমার কাছে···আলোর তারতম্য মাত্র··· সৎ হওয়া ছাড়া আর গতি নেই···'

একদা দীননাথের ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল মনে হইল, স্বীকারোক্তির জন্য যাহার নৃশংসভাবে বীর্য্যপাত ঘটান হইয়াছে, এখন, মুমূর্ষু ; যাদবপুরের হাসপাতালের খাটের শুভ্রতার উপরে বালিশে মুখ রাখিয়া সে ক্রমে আপনকার নিপীড়ন কাহিনী বলিতে লাগিল। মেজর বিল সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহার হুকুমে মুরদা-ফরাস শুবার (নাম) দীননাথের···অঙ্গ লইয়া···'তারপর আমি অজ্ঞান' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পাখীর ডাক আসিয়াছে, সন্ধ্যা সমাগত, রুক্মিণী অবলোকন করিল, রামানন্দবাবুর চক্ষু তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় তাঁহার স্মরণে আসিয়াছিল যে এই মেজর বিলকে, দুরাত্মাকে—যে ব্যক্তি নানান অত্যাচার উদ্ভাবনের জন্য কর্ত্তৃপদবাচ্যদের উচ্চপ্রশংসিত, এই মেজর নাইটহুডে সম্মানিত হইবে, অথচ কোন ধৃতই আজ পর্য্যন্ত তাহার অত্যাচারে বিচ্যুত হয় নাই (অবশ্য অত্যাচারের নামে দুয়েক জন হইয়াছে) ইহাকে হাপিস করা বহুদিন যাবৎ ঘটিয়া উঠে নাই, অবিলম্বেই কর্ত্তব্য।

দীননাথকে দেখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে রামানন্দবাবু বলিয়াছিলেন, 'মৃণাল তুমি··· নির্ব্বাসিতের··· পড়েছ···'

'হ্যাঁ ফটিকদা···'

'আমিও পড়েছি···' রুক্মিণী ঈষৎ অভিমানে কহিল।

'আমাকে বলত যে জায়গাটা ভাল লাগে··· না না সারাংশ নয়···একেবারে উপেনবাবুর লেখা···?'

মৃণাল ও রুক্মিণী অল্প শীতকাতর বুঝায়।

রামানন্দবাবুর মৃদু ভর্ৎসনার কণ্ঠ শ্রুত হইল, 'ছিঃ ছিঃ···ওসব বই কি দীনেন

রায় না পাঁচকড়িবাবুর লেখা…যারা স্বাধীনতার জন্যে…যাক্…মুখস্থ রাখবি, মন্ত্রের মত উচ্চারণ করবি…দেখ আমার কেমন মনে আছে…কেন বলছি বলত…বিলকে সাবাড় করতে হবে মুস্কিল সে বিরাট পাঁচিলের মধ্যে থাকে'।

ইহা শুনিয়া রুক্মিণীর অদ্ভুত চাঞ্চল্য ঘনায়মান হইয়া সিঙ্কিড়ায় পর্য্যবসিত, কেমন যেন অনুভব হয় যে সে ইলিসিয়াম রোড (ইদানীং লর্ড সিন্‌হা রোড) দিয়া যাইতেছে, সলজ্জ উৎকণ্ঠায় ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সে বিরাট সবুজ গেট দেখে, নীচে গেটের গায়েই এক দরজা, যাহা খোলা, সান্ত্রীর বুট প্রতীয়মান।

ইহার পর ভারী পদদ্বয়ে অনেক দূর অতিক্রম করে, এখন হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডার্সনের দোকান, ইহা দর্শনে সে রোমাঞ্চিত, সে সঙ্কল্প করিল, আজ আমি সেই স্থান স্পর্শ করিব, যেখানে গোপীনাথ সাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যর্থ গুলির চিহ্ন আছে; এবং নিজের হাত হইতে একটি পয়সা ফেলিয়া উহা কুড়াইবার ছলে, সে গুলিবিদ্ধ স্থান স্পর্শ করিতেই তাহার বালক শরীর চকিতে বিদ্যুৎ!… পুনরপি দীননাথের দুঃখময় মুখখানি তাহার নয়নে উদয় হয়।

রুক্মিণী একবারও প্রশ্ন করিল না যে, কেন ইত্যাকার স্মৃতি তাহাতে পুনর্জ্জীবিত হইল। অন্যপক্ষে যে রুক্মিণী আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিল, কখন বা হাতের তালু চাদরে ঘর্ষণে কদাচ স্বীয় চোয়াল আলোড়নে মানসিক শৈথিল্যকে সটান তীব্র করণে প্রয়াস পাইল, এবং যে ইহার পর মাথার তেলচিটে বালিশের তল হইতে কাগজে মোড়া কাটারী অতি সন্তর্পণে বাহির করিয়া অনাবৃত এক অংশ সে দেখিল—ইহা তাহাদের কয়লা-ভাঙা-কাটারী, ভোঁতা হাতলহীন, তৎসত্ত্বেও কোথায় যেন ইহার রুষ্টতা ভয়ঙ্কর।

এযাবৎ এই অস্ত্রটি তাহাকে পীড়িত করিয়াছে, ইহা অনুপস্থিত কাহারও অবমাননায় ক্রুর, উপরন্তু আপন আত্মসচেতনাতে আঘাত হানিয়াছে, যে পুরুষকার উর্দ্ধমুখীন যাহাকে ইদানীং রক্ত উদ্গারের বিভীষিকার মধ্যে সবে মাত্র চিনিয়াছে—তাহাকেই যেমন বা বিদ্রূপ নিমিত্তে বর্ত্তমান। সে চোখের নিকট হইতে উহা সরাইয়া লইয়াছিল মাত্র একারণ যে উহার বিদ্যমানতা তাহার সহ্য হইতেছিল না।

অথচ ইহা সত্য যে তাহা অবহেলা করার মতন, অবজ্ঞাভাব বৃত্তি রুক্মিণীর নাই। বস্তুত, বালিশতলায় অনন্ত উপায়ে রাখা ঐ কাটারীর মধ্যে—বহু জল ঝড় গড়খাই তমসা পার হওয়ত যে ভালবাসা অদ্যও অবিকল তাহারই একটি নিদর্শন ছিল।

উহা গঙ্গামণির ভালবাসা। যে গঙ্গামণির ইহা আকাঙ্ক্ষা, সুখ নয়, শান্তি নয়, রুক্মিণী শুধু বেঁচে থাক! এখন গঙ্গামণি তুলসীতলার নিকট বসিয়া মালা জপিতেছিলেন। তাঁহার মালা জপা শেষ হইয়াছিল—মালা জপা কি শেষ হয়। এবার অনুচ্চস্বরে 'জয় রাধে মাধব' ধ্বনিত হইল, কিন্তু অন্য দিনের মতন হাঁটুতে হাতের ভর দিয়া তিনি উঠিয়া স্থান ত্যাগ করেন নাই। যেহেতু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে যাবৎ এখানে ততক্ষণ রুক্মিণীর কোন ভয় নাই।

রুক্মিণী গঙ্গামণির 'মাধব' নাম শুনিয়াছে, উপস্থিত সে নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছে; কৃতসঙ্কল্প; নিশ্চয়ই অবহেলায় নহে—কাটারীর মোড়ক হাতে সে ছাদে আসিল, কিছুকাল একস্থানে স্থিতবান কেননা ইহাতে মার দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া সম্ভব, অথবা তাহার দিক্‌ভ্রম ঘটে, পরক্ষণেই সে প্রথমে ঈষৎ শঙ্কিত, ক্রমে জড় পদক্ষেপে কয়লা যেখানে ডাঁই করা স্পষ্টতই সেখানে কাটারী নিক্ষেপ করার গতির হস্তে ধীরে রাখিল, অতএব অতীব অল্প শব্দ উত্থিত হইয়াছে। যুগপৎ শব্দে প্রদীপের শিখা উপক্রত, গঙ্গামণি ক্ষিপ্রতা সহকারে আপন হস্ত দ্বারা মৃতকল্প শিখা রক্ষা করিলেন, আপনার সন্তানের প্রতি চাহিলেন। ঈষৎ থমকান স্বরে কহিলেন, 'ওমা কি রাখলি রে...'

'ও কিছু নয়' উত্তর দিয়া সে একান্তের গঙ্গাজলের কল খুলিয়া অপ্রয়োজনেই হাত ধুইয়া ছাদের মাঝ বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার একটি কর্ত্তব্য আছে, তাই সে কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিবার চেষ্টা করিল, এখনও সে সহজ নহে, আকাশ দেখিল, দীপিত গৃহসমূহ তাহার চোখে পড়িল, প্রাচীরের নিকট গিয়া রাস্তার প্রতি তাকাইল যে সন্দেহজনক কেহ আছে কিনা। এবং ঘুরিয়া সহজভাবে প্রকাশিল, 'তোমার যেমন মাথা খারাপ...কাটারীটা...'

গঙ্গামণি পুত্রের কথায় খানিক অপ্রতিভ, তিনি একাগ্র। এসময় দূরাগত গ্রামোফোনের সঙ্গীত ভাসিয়া আসে, তৎসহ স্বল্পায়ু মোটরের হর্ন, তবু গ্রাম্য সংস্কারে তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, অভিমানে জানিতে চাহিলেন, 'দু দিন রইল...আজ বিকেলেও বালিশ উল্টে দেখলি...কই তখন ত কিছুটি বললি নি...'

এমত প্রকাশে ইহা নির্জ্জলা যে কোথাও যেন তাঁহার লাগিয়াছিল এবং তৎপরে তিনি খুব অসুখী গলায় বলেন, 'কি ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড, ঠিক সন্ধ্যে না উৎরোতেই...কি অলুক্ষুণে কাণ্ড...যা আমার কথা শোন...রেখে আয়...'

রুক্মিণী মার প্রথমোক্ত বাক্যে বিচলিত একারণে যে তদীয় কথার মধ্যে সত্য থাকে, যে সে বিকালে কাটারীটি আবিষ্কার করে ও তৎক্ষণাৎ মার দিকে

সপ্রতিভ অন্তরে চাহিয়াছে, গঙ্গামণি একমনে সেলাই করিতেছিলেন—রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ ঐভাবে ছিল, সে অন্তমনস্ক, পরে মোড়ক হইতে হাত সরাইয়া লইতে, তাহার গাত্র চমকিত, একটি মুখমণ্ডল এখনই আভাসিত হইল।

সে লজ্জায় অবসন্ন। তাহাদের এই বাড়ি কাঠের সিঁড়ি যাহা উত্তরে—বাড়ির বাহিরে অবস্থিত—তিনতলা অবধি সংলগ্ন সিঁড়ি দেখিয়া সে ভাবিত হয় যে··· মা বুড়ো মানুষ···যদি পা পিছলে যায়, এবং সে বলিয়াওছিল, 'তোমার আর রাত থাকতে গঙ্গাচ্চানে গিয়ে কাজ নেই···' এই সিঁড়িই ইদানীং তাহার মানসিকতার নির্জ্জনতা, এখানকার অসংযম, বালখিল্যতা সংশয়হীন; সে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে কান পাতিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালি খসে এবং সে যুবতীজনসুলভ উচ্চকিত হয় এবং কালো চশমা পরা কড়ি ঠাকুজ্জির চেহারা তাহার সম্মুখে ঝলক দিয়া উঠিল।

নিজেকে সে ধিক্কারিতে কঠিন হইয়াছে; তাহার সংকল্পচ্যুতি ঘটিল; মিনিট কিছু আগে সে যে একমনে উপেনের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া দিন ধার্য্য করিতে বলিয়াছে তাহা যেন অপবিত্র হইয়া গেল, এই কয়দিন তাহার ধ্যানজপে সংযমে থাকার স্থিরীকরণ বৃথা হইল। আপনার কাছে আপনি নিমেষেই বড় ক্ষুদ্র রূপে দেখা দিল। অবশ্য একের মৃত্যু হত্যার ষড়যন্ত্রে তাহার দেহে চিল্লিকার শব্দ এককালে প্রতিধ্বনিত ও পুঞ্জীভূত হয়, কুলকুণ্ডলিনী কিন্তু গুহ্য লিঙ্গ নাভিস্থল তথা মূলাধারেই, সে অসম্ভব উষ্ণ।

বহুদিন পূর্ব্বে, সেদিন দোলযাত্রা, ইনফরমার রাজেনকে সে যখন ছোরা মারিয়া মারিবার পরিকল্পনা করে তখন এরূপ হয় নাই, তখন কার্য্য সাধনে ভীষণ বিষম হাস্য উদ্রেক হয়···তখন পলায়মান ডাক্তারি গ্লাবস্ একস্থানে খুলিয়া পকেট হইতে আবির মাখে, দ্রুতপদে সচকিত নয়নে কেহ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কি না নির্ণয়ও তাহার দ্বারা হয়···একটি হুইসিলের শব্দ তদীয় কর্ণে পৌঁছায় নাই···কিন্তু ফকির চক্রবর্ত্তী লেনে ঘুরিতেই পুলিশ···এমন কি পনেরো আনা ডাউন মাতালও ছুটিতেছে, বেশ্যারা আতঙ্কিত, বেশ্যাপাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়ের কেহ ফরমাস খাটিত, কেহ বা খেলায় রত, একটি শিশুবয়সী যাহার মা ইদানীং রাস্তায় হটাইয়াছে, সে একটি কাগজের সাপ লইয়া খেলিতেছিল, উপস্থিত সেই শিশু থ, তাহার হস্তধৃত সর্প অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত। দোকানীরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়—বয়সী খানকীরা নির্ভয়ে বিকট মুখখিস্তিতে প্রগলভ, তাহারা সরোষে হাতের বিড়ি বা সিগারেট ছুঁড়িতেছে···কেহ ক্রোধে অধীর হইয়া আবির মাখা

মুখে আপন বসন তুলিয়া সবেগে মুতিতেছে, আর মুখে বলিতেছে ছ্যারা রারা…
অন্য দিকে কেহ ছড়া কাটে দূর পাল্লার প্রস্রাব স্ফুরণ দর্শনে সাঁই রি রি রি,
চড়াক ঝন ঝন, টুপ টাপ খিপ। লে শ্যালা হোলি হায়!

এখানেই কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, 'রুক্মিণী, রুক্মিণী…'

'আরে ফণী…'

'পালা পালা চট করে…হারামজাদা পুলিশ বো…চো…বা…শালা…এখানে
উঠে পড়…'

রুক্মিণী রকে উঠিয়া দেখিল, স্যাঁতস্যেঁতে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অনেক রমণী,
তাহাদের ধূমপানে এ স্থান পরিপূর্ণ সেখানে, সে রুক্মিণী, চলৎশক্তি-রহিত,
নিশ্চয়ই সে আরক্তিম হইয়াছে, এই রমণী পরিপ্রেক্ষিতে যে সে কুণ্ঠায় অন্যত্রে
দৃষ্টিসংযোগের প্রয়াস পাইয়াছে এবং এখানে দরজার পাশে একটি কাটা ডাব
ছিল। শতচ্ছিন্ন পর্দা ভেদে স্পষ্টতই দেখা যায় একটি উলঙ্গ রমণী সিক্ত গামছা
দিয়া আপন অঙ্গ ও উরু মুছে, জলকণাগুলি প্রসিদ্ধ হয় যে তাহা কৌতূহলোদ্দীপক
ইহা ব্যক্ত! রুক্মিণী দেহের মধ্যে অন্ধতা পরিব্যাপ্ত…।

কলিকাতা একটি নয়নাভিরাম মায়াময় গভীর নগর—ক্রমাগত শ্মশান ও যে
কোন বৈরাগ্য জননী ভাববিগ্রহকে গলাধঃকরণ করে, চিবায়; অধুনা চারি-
দিকের রমণী সকল তাহারই শুভ্র উৎকৃষ্ট ঘোর দন্তপঙ্‌ক্তি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে
সে হত্যা করিয়াছে, যে সে আততায়ী…যে তাহার জন্য কোথাও এঁদো ঘরে
স্পিরিট ল্যাম্পে দুধ ফুটিতেছে—যে, কোনও বিশেষ মোড়ে রেসিং সাইকেল
(ইহার মাডগার্ড আছে যদিও) লইয়া কেহ অপেক্ষা করিতেছে। সবই সে
বিস্মৃত…নিশ্চয়ই এখানকার ইতর পিচকারীর ব্যবহারে রঙদান যথাস্থানে তাহার
সত্তা অপহৃত হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে সে আপন ব্রণবিরহিত ব্রহ্মচর্য্যের
আদর্শ বিচ্যুত নহে।

ইতিমধ্যে সেই অঙ্গমার্জ্জনারত রমণী বাহিরে—রকে এবং আপন দরজায় কাটা
ডাব দর্শনে ক্ষিপ্ত; তদীয় শরীর ফণায়িত হইল, বলিল, '…কোন বাপ ভাতারী
তার…তে আমি ঢেঁকির সোনা পুরে দি…তার…রগড়ের জায়গা পায় না…
আমার দোরে কাটা ডাব রাখা…তোদের গরমী হোক…যে শালী রেখেছে
তার…আমার…মানুষ ভাঙান…'

সহসা তাহার কানে পুলিশ লইয়া কুৎসিত মন্তব্যে সে লব্ধচেতসা হওয়ত
আশপাশ পর্য্যবেক্ষণ কারণে উত্তমাঙ্গ ফিরাইতে দেখে সহাস্যবদনা বিচিত্র

অঙ্গাভরণে—কেননা নাকে সোনার নোলক ও সুডৌল নথ ও ইহার সুতলী বক্রভাবে গিয়া কানে গ্রথিত, ইঁয়ো পাতা কাটা কেশবিন্যাস, প্রতি পাতায় একটি একটি চুমকী বসান—এহেন রমণী অতীব বিদেশী জাহাজীদের পছন্দ, ইহাই 'হিন্দু ফিমেল'—এই রমণীর আঁখিপক্ষ্ম এমত স্পন্দিত যে যে কোন পুরুষের উরু উচাটন হইয়া থাকে। এই রমণী তাহার নিকট আসিয়া এমত হাসিল, যে ইহার হাস্যধ্বনিতে আপন গতয়ের শব্দ আছে, কেলিরত শব্দ (উজ্জ্বল-নীলমণি বা অন্যত্রে ইহার বর্ণনা আছে, যতদূর মনে পড়ে) এবং সে সুমিষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'কঁড় বসইবি…'

যে সুচতুরা রমণী, যে উৎকল নিবাসী, ইহা রুক্মিণী বুঝে এবং তদীয় বাক্যে সে চমকিত ও যুগপৎ 'ফণী ফণী' ডাকে ব্যাকুল হইয়া এদিকে সেদিকে অন্বেষণে শিশু!

'ফণী কঁড় দলাল…' ভ্রূকুঞ্চনে রমণী জিজ্ঞাসিল।

কে একজন কহিল, '…তুই চিনবি না লো (কারণ উৎকলী সম্পূর্ণ নবাগত), বিনো বলে ভিতর মহলের এক মাগীর ছেলে…ও তো ফণের সঙ্গে ঢুকল, সে ছোঁড়া গেল কোথায়…' এবং সে 'অ, ফণে ফণে' বলিয়া ডাকিয়াছিল।

রুক্মিণী এতক্ষণ বাদে চারিদিকের গীত তবলার ফুটন্ত আওয়াজ শুনিল।… দরজার দিকে চাহিল, ইহা বন্ধ, একটি বিশেষ টোকা পড়িল, দরজা অল্প খুলিতে একটি কানা প্রবেশ করে…উড়ুনী চাপা বগল হইতে একটি পাঁইট ও একটি বোতল বাহির করিতে থাকিয়া বলিল,'…এখন খানকীর ছেলে…বোয়া চো-রা রাস্তা যাকে পারছে…ধচ্ছে…শুনছি বাড়ি তল্লাসী কচ্ছে, শালা আজ হোলির বাজার নৈনেৎতর করলে গা…এই লাও তোর মোদক আনতে ভুল হল…'

রুক্মিণী ভাবিল যে সে সত্যই নরকে, এতেক বৈচিত্র্য তাহাতে ঘটে যে গঙ্গাস্নানের কথা তাহার মনে হয় নাই ; ক্রমে ফণীর আজব ব্যবহারে সে জড়, একদা প্রশ্ন আসিল, ফণী উধাও হইল কেন ?…বহুদিন পূর্ব্বের থার্ড বেঞ্চের ফণীর মুখখানি সে দেখে—ক্লাসে যাহার কোন বন্ধু ছিল না…মুখখানি ম্লান, এইটুকু জানিত যে তাহার মা নাই…কাহার সহিত আমবারুণীর দিনে ফণীর…গঙ্গার ঘাটে সাক্ষাৎ হয়…সাঁতারে ব্যস্ত…এমত সময় সদ্যঃস্নাতা একজনা ডাকিল… 'বলি হচ্ছেটা কি উঠ শীগগির।' ফণী অসাবধানে উত্তর করে, 'যাই মা।'

'…সে কিরে, তুই না বলেছিস তোর মা নেই…'

গঙ্গায় বর্ত্তমান ফণী বলে, '…আমি কুড়নো ছেলে…মানে পালিত…ও

আমার মা নয়।' ফণী কখনই স্বীকার করে নাই যে তাহার গর্ভধারিণী আছে। এখন রুক্মিণী ফণীর কাণ্ডজ্ঞানে একান্ত অসহায়ে কাতর নয়নে ইতস্তত তাকাইয়াছে, অবশ্যই অস্ফুট উচ্চারিল, 'এখন…'

'আশ্চজ্জ, ফণে ছোঁড়া গেল বা কোথায়…' কেহ মন্তব্য করিয়াছে।

কানা তৎক্ষণাৎ যাহাতে মোদক না-আনার কারণে রূঢ় খিস্তি গঞ্জনা থামে, তাই, উত্তর করিল, '…দেখলুম সে ত বলাই উকিল (যে প্রত্যহ, কালো কোট পরনে, রসিকের পুরানো শিশি বোতলের দোকানের এক পাশে বসে, উহাই তাহার চেম্বার—তাহারই) সঙ্গে থানায় গেল রিসকায়।'

'হাঙ্গামা কিসের রে পোড়ারমুখো খাণ্ডগীর ছেলে…' একজনা বর্ষিয়সী, ইহার মাথায় ঝুঁটি করা খোঁপা, পরনে গামছা, হাতে সিগারেট, অন্য হাতে একটি গাড়ু, ইহার আকৃতি যেমন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার—অবশ্য ইহার স্তনদ্বয় পীন—জানিতে চাহিল।

তবু কিন্তু ইহাকে তদ্রূপ সাজে দেখিয়া রুক্মিণী এবার স্বাভাবিক, আপন নিশ্বাসের শব্দ সে শুনিয়াছে অর্থাৎ যে এখানকার ইহারা সকলেই যে মানুষ, যে যাহারা মরণশীল, যে যাহারা নির্ঘাত সুন্দর—এহেন সংস্কার উপজাত হইল।

কানা কহিল, '…মনে হয় ওমনি উকিলের সঙ্গে…বেলে কাউকে বোধহয় খালাস করতে…অনেককে ধরে নিয়ে গেছে…বেচারা ফুলওয়ালা পজ্জন্ত… কাল মিসট (মিস) লাইটের ঘরে…ডাঙ্গার বাবুদের ম্যানেজার এসেছেল… সে নাকি গুন্‌তি দিতে পারে না, প'য়া কম হয়…তাই তার দোশালা (যদিও ফাল্গুন মাস) কেড়ে নিয়েছেল…ঘড়ি, ঘড়ির চেন…কেউ বলছে…মানে সুন্দর দালাল * বলেছে মাগী নাকি টুপভুজঙ্গ ম্যানেজারের বুকে বসে মুখে…মু, তাই ম্যানেজার এক লরী গুণ্ডা পাড়ার ছোঁড়া এনেছে সেই খবরে পুলিশ…'

'…তাই বল, আমি ভাবি নিয়ম মাফিক হল্লা…ছ্যা ছ্যা মাগীর কি আক্কেল …মাগী ডোরা গুণ্ডাকে নাঙ করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে…ছ্যা ছ্যা শুনলে পাপ হয়…'

রুক্মিণী ফণীর অন্তর্দ্ধানে বিমূঢ়, তথাপি এই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত, এমত ভাবনার মধ্যেই শুনিল সদর দরজায় ভয়ঙ্কর সঘন আওয়াজ হইতেছে, কেহ

*প্রকাশ থাক… জিদ বাড়ির… অবি… কবিরাজ নিবাসী সুন্দর দালালের—যে প্রত্যহ সকালে গরুকে ॥• জিলাপী খাওয়াইত নিজ পাপ খণ্ডন নিমিত্ত—সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

যেন কিছু দিয়া পিটিতেছে…আর যে তৎসহ প্রচণ্ড নাদে কে বা কাহারা কহিতেছিল…'দরজা খোল, জলদি খোল··'

অন্দরে বিষম অবস্থা ঘটিল। বারবনিতাগণ যে যার আসন ফেলিয়া অদৃশ্য… কত পিঁড়ি কেনেসতারা জলচৌকি এখানে সেখানে, রুক্মিণী প্রায় হতচেতন তবু তাহার কানে বাহির হইতে আগত উচ্চৈঃস্বর ও পায়রার বকুম আসে, আপন বৈকল্য কোনক্রমে উৎপাটন করত, সে দৌড়াইবে মনস্থ করে, কেননা, কানা উত্তর করিল, 'খুলতা খুলতা হায়…' কানা তাহাকে বলিল, '…অন্দরের দিকে পালাও, কোন মাগীর ঘরে ঢুকে পড়…পালাও পালাও…'

দোলের দিন, রাজেনকে হত্যার পর, ঐ বাড়ির লাম্পট্য কামগন্ধ তাহাকে আশ্চর্য্য উষ্ণ করে কিনা এখন স্মরণে নাই। কিন্তু অদ্য উপেনকে বিনাশের পরামর্শে সে অবাক উষ্ণ হইয়াছে—অহো বধ করা খলু কি অনৈসর্গিক রমণ-প্রক্রিয়া।

সে রুক্মিণী, এখনও তাহাদের বাড়ির সিঁড়িতে, তদ্রূপ উদ্‌গ্রীব—দেওয়ালে কান রাখায় ঈষৎ বালি খসিল ইহাতে সে চমৎকৃত, তখনই উপর দিকে লক্ষ্য করে এবং অন্যত্রে; তাহার কণ্ঠ শুষ্ক সম্ভবত। সে কাহার অস্তিত্ব জানিতে চাহিয়াছে, সত্য সত্যই দেওয়ালের অপর পার্শ্বে কেহ আছে, না সবই স্বপ্ন যথা!

কেননা সে সময় মধ্য রাত্র, উপেনের সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে, সামান্য বৈষয়িক লাভের নিমিত্ত সে এই ঘৃণ্য কাজ করিবে, কি না সে বিলাত যাইবে এবং আই-সি-এস হইবেই ফেল করিবার তাহার কোনই দুর্ব্বিপাক নাই; নির্ঘাত। কেননা সে রাজসাক্ষী! ইতিমধ্যেই চমৎকার মান্দ্রাজী সান্‌ডেলস্ আড়াই টাকা দিয়া কিনিয়াছে…এবং দুই চারিটি রেফারেন্স বই কিনিয়াছে…আণ্ডার উইয়ার কিনিয়াছে! বাড়িতে চাঁদপুরে এককালীন ৫০৲ টাকা মনিওডার করিয়াছে…এবং সে সিগারেট ধরিয়াছে·· ইহাতে রুক্মিণী আরও ক্রুদ্ধ। উহারই সহিত কি এতদিন বন্দেমাতরম্ গাহিয়াছে, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি একই কণ্ঠে তুলিয়াছে মা ভৈ বলিয়াছে!

মার ঘর হইতে ঝিম্ টিনের দেওয়ালগিরির আলো যাহা এখানে অল্প ছিল তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমবর্দ্ধিত দেখা যায়, বারম্বার সে বালিশ ফিরাইয়াছে, এহেন সময় পাশের যে দেওয়াল ঘেঁষিয়া তাহার তক্তপোশ; তাহার

উপরিভাগে এক জানলা বর্ত্তমান*, কেমন এক শব্দ হইল, জানালার কাঠের গরাদে দুই গৌর হাত দেখা যায়...এবং পলকেই আবছায়া মুখমণ্ডল, সবিশেষ দুইটি মৃগনয়ন!

যে রুক্মিণীর শরীরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া উপজাত হয়, এবম্ভূত বিদ্যমানতা অপ্রার্থিত এ কারণ যে, সে তখনই আপনার বস্ত্রাংশ যাহা এযাবৎ হয়ত বেসামাল বোধে যত্নবান হইল বিস্তস্তে; কিন্তু সে চক্ষু ফিরাইয়া দৃশ্য হইতে লয় নাই। বরং এতাবৎকার উত্তেজনা অপ্রকট হইয়াছে, সে এবং জানিতই না যে ইতিমধ্যে সে ব্যক্ত করিয়াছে '...আঃ কি সুন্দর...।' জানালা বন্ধ হইল। সারা রাত তাহার দেহে দোরোখা উত্তেজনা তাথিয়া উঠিয়া ভয়ানক বৈলক্ষণ্য ঘটাইল। আশ্চর্য্য ইহা কোনক্রমে অশরীর তাহা বোধ হয় নাই। তবে ইহাও সত্য যে পরক্ষণেই —চেতলার গলি ভাসমান হইল; তাহারা, সে আর নিকুঞ্জ, ফটিকদার আজ্ঞা অনুযায়ী বিজয় অ্যাপ্রুভারের খোঁজে গোপালনগর রোডের মাঝবরাবর এক বিচিত্র গলিতে উপস্থিত, চরকডাঙ্গা বোম কেসের বিজয় অ্যাপ্রুভার এখানে আপন মাসীর বাড়ি লুকাইয়াছিল; সে আর নিকুঞ্জ একটি খোলার চালের বাড়ির সম্মুখে, দরজায় লেখা— ভদ্রলোকের বাড়ী গৃহস্তের (!) বাড়ী (ইহার ঈ-কার অল্প মোছা ও আমাধরা ইঁটের টুকরায় কোন শয়তান অন্য একটি বর্ণ সংযোগ করিয়াছে), ইহাতে দুইজন যেমন বা অশুদ্ধ, উর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চারণ করত মুখে বস্ত্র চাপা দিয়া ডাকিল, 'ব্যাজা! ব্যাজা!' এবং তৎসহ দরজায় আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল, চন্দ্রালোক কম্পিত মেটে উঠান, ওতপ্রোত হইল কোন ভদ্রমহিলা, স্পষ্ট যে তিনি বর্ষিয়সী বিধবা, ইহার পরনে থান, ওষ্ঠসংপুট বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত, বেশ খানিকক্ষণ স্থির থাকিয়া পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন '...সে এখন রাঁড়ের বাড়ি থাকে...।' এ পর্য্যন্ত চন্দ্রালোকে এতাবৎ মৌনতার পর এই দুষ্ট উত্তরে দুই বালব্রহ্মচারী শ্যামীকৃত অপবিত্র হইল। ভদ্রমহিলার মুখমণ্ডল দেখিতে তাহার বাসনা হয়। কেন যে হয় তাহার সদুত্তর নাই, নিকুঞ্জ কহিল, 'কি তোর কাণ্ডজ্ঞান...'

ইত্যাকার আশ্চর্য্য কয়েক দিন, এমনও যে রুক্মিণী প্রতীক্ষা করিয়াছে, এবং আপনাকে ধিক্কারে জর্জ্জরিত করে এবং মা এ ঘটনা জানেন কিনা তাহা সুচতুর

* এই বাড়িটি অনেক অংশে তথাকথিত মুঘোল স্থাপত্য সম্মত অর্থাৎ প্রাচীন রীতির। অর্থাৎ যখন বিশ্বাস ছিল তিন পুরুষ না হইলে একটি গৃহ সম্পূর্ণ হয় না, ফলে পুরুষানুক্রমে ব্যবস্থার ভেদে বাড়ির অন্দর বিচিত্র হইয়া উঠে।

প্রশ্নসকলে অবহিত হইয়াছিল। গঙ্গামণি শুধুমাত্র ম্লান মুখে বলিয়াছিলেন··· 'কেন যে এ বাড়ি ভাড়াটে থাকে না···তা···'

এবং প্রত্যহই রুক্মিণী বলিয়াছে, 'ইহা কি সুন্দর! ইহা কি সুন্দর!'

কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার কিরূপে ঘটে! যেহেতু অন্য পার্শ্বে একমাত্র পুরুত মশাই ব্যতীত কেহই ত থাকে না। অধীরতা ক্রমান্বয়ে উগ্র হইতেছিল, এ বাড়ির তিন পাশে হিন্দুস্থানীদের বিকট বস্তি, এক পাশের বাড়ি বেনেদের, যাহার আপাদমস্তক বন্ধ।

এ কৌতূহল অসংযত জানিয়াও সে একদিবস মনস্থ করে পুরুত মশাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু তাঁহার দেখা পাওয়া দুর্লভ। ভোর তিনটা হইতে তিনি প্রস্তুত— গঙ্গায় স্নানাদি, বসুদের বাড়িতে ঠাকুর ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউ-র সেবা, তোলা, ভোগরাগ, শীতল দেওয়া পর্য্যন্ত যাহার নাম-সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত ব্যস্ত। একমাত্র রাতে যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে পুঁথি পাঠ করেন তখন দেখা হওয়া সম্ভব।

পুরুত মশাই কাশীনাথ ভট্ট পুঁথি পড়েন, গঙ্গার হাওয়া গ্যাসের আলো উপদ্রুত, সম্মুখে শ্রোতাসকল আর ইতস্তত দুর্ব্বৃত্তরা, ইহাদের বাবড়ী চুলে তেরী বাগান করা, কাহারও চোখে সুরমা, কেননা এখানে নানা বয়সী স্ত্রীলোক আছে, ইহার এক অংশ রসিক ভারী অল্পবয়সী তথা ডাগর বিধবা, ইহাদের হাতেও কুড়োজালী চোখ চমৎকার সচকিত, চুলে সাধারণ যত্ন। ইহারা মনকে আঁখি ঠারে। বৃদ্ধা বেশ্যাও দুয়েকজন নিশ্চয়ই আছে। রাত্রে গঙ্গার ঘাটের এহেন অভিজ্ঞতা বহুদিন রুক্মিণীর নাই, বছর পাঁচেক আগেও সে গঙ্গামণির সহিত এই স্থানে আসিয়াছে, তাহার পর শ্মশানে ও পরামর্শনিবন্ধন ছাড়া এখানে রাত্রের গঙ্গাতীরে আসা ঘটিয়া উঠে নাই।

পাঠ না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। বালী বধ পাঠ হয়।

প্রথমেই তাহার মনে হয় এখানে নিশ্চিন্তে আত্মগোপন করা যায়, এখানে পুলিশ নাই, এখানে তাহার প্রতি কেহ তাকাইলে কোন সন্দেহ আসে না; তখনই বেচারী আনন্দর কথা মনে পড়ে— যে জীবনে একদিনও স্বদেশী করে নাই, এমন কি তকলী পর্য্যন্ত কাটে নাই, সিল্ক টুইলের সার্ট ও ঢাকাই অতি সূক্ষ্ম ২০০ কাউন্টের সুতার বস্ত্র পরিত, তাহাদের বাড়ির দাসদাসীরা বিলাতী লাট্টুমার্কা (রেলি ব্রাদার্সের) কাপড় পরে, যে সে রাস্তা ঘাটে চলিতে, তাহার

প্রতি কেহ নজর করামাত্রই, ক্ষিপ্ত, যে ঐ ব্যক্তি স্পাই! এবং যে আনন্দ তাহাকে এড়াইতে ব্যগ্র, এই ভাবে সে ইদানীং বদ্ধ পাগল হইয়াছে; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহাকে রোজই দেখা যায় বারোক অথচ করিন্থীয়ান থামওয়ালা অট্টালিকার তেরী কাটা বারান্দায়, সিল্কের গেঞ্জী ও কোঁচান ধুতি পরনে দণ্ডায়মান, পাশেই তাহার আইরিশ সেটার জোড়া আর যে নিকটে এক চাকর; রাস্তায় যে কেহ অবলীলাক্রমে তাহার দিকে চাহে, তখনই সে তারস্বরে বলিয়া উঠে, 'স্পাই! স্পাই।' তৎসহ তদীয় কুকুরদ্বয় চীৎকার দিতে থাকে, চাকরের, তাহাকে শান্ত করণে 'খোকাবাবু খোকাবাবু' ব্যাকুল কণ্ঠ শ্রুত হয়। এমনও যে শিশু, স্কুলগামিনী বালিকা, বৃদ্ধারাও অভিযুক্ত হইয়াছে অকারণ ত্রাসে, সে বিস্মৃত যে তাহার রূপ দেবতাতুল্য। তাই লোকে দেখে।

এই সেই গঙ্গা। ত্রিপথগামিনী পুণ্য দেবনদী গঙ্গা। সে এখন কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া আপন দেহের সর্ব্বত্রে সিঞ্চন করিল, তখনই ইহা অসাধনে মুখনিঃসৃত হইল… 'মা গো আমাকে পবিত্র কর…' সম্ভবত সংস্কার বশতঃ ইহা ব্যক্ত হয়, তথাপি ঐ উক্তি এক অপ্রার্থিত নব দীপ্তি লাভ করিল, দেখিল সে ছাদের বৃহৎ ট্যাঙ্কের পাশে অতীব গোপনীয় স্থানে বসিয়া 'পথের দাবী' পড়িতে পারিবার আগ্রহে 'চরিত্রহীন' পড়িতেছে।* সত্যই কি সে পবিত্র হইতে পারে! যুগপৎ দৃঢ় হইল, না পণ্ডিত মহাশয়কে কোন প্রশ্ন করিবে না। ঠিক এমত সময় তাহার কানে এক করুণ ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে;

ষ্টিমারের আলোকে প্রতীয়মান হইল কোন রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা। সঙ্গে সঙ্গে একটি ধমক শোনা গেল, 'এই বুড়ী, ডাক ছেড়ে কাঁদবি না বলে দিচ্ছি…আরও ত লোকে কাঁদে কেউ ত তোমার মত ডাক ছাড়ে না…'

'ভুল হয়েছে বাবা…'

'যত শালার মরণ এখানে…'

কেহ জপ করে কেহ ধ্যানে। কোন বৃদ্ধ শুষ্ক মুখে, চোখে অশ্রুধারা, কেহ

* বইটি সোনাদার সদ্য বিবাহিত বৌর বিবাহের উপহার— ইনি, এই বধূ রুক্মিণীর কিছু বড়, ইঁহার অনেক ছোটখাট কাজ সে করিত, এমন কি ঝালচানা এটা সেটা কিনিয়া আনিত। ইনিই রুক্মিণীকে চরিত্রহীন এই শর্তে দেন যে যদি সে উহা পড়ে, কোথায় ভাল লাগে বলে, তাহা হইলে পথের দাবী দিবেন।…চরিত্রহীন পাঠের পর পথের দাবী দিতে তিনি ছাদে আসেন এবং আপন ব্লাউজের টিপকলগুলি খুলিয়া বইখানি বাহির করতে রুক্মিণীর দিকে অদ্ভুত ভাবে নেত্রপাত করিলেন। ইঁহার গৌর মুখমণ্ডলের নাসাপুট রক্তিম। রুক্মিণী অবাঙমুখ হইল।

রামপ্রসাদ গাহে, কেহ গাঁজা সেবনে ব্যস্ত, স্বল্পায়ু ষ্টিমারের আলোকে ভাস্বর হইয়াছে।

'...যত শালা বাড়িতে গিয়ে কাঁদ না...সেখানে বড় শক্ত ঠাঁই...কুকুর কাঁদন যত গঙ্গার ঘাটে...'

রুক্মিণী অতীব ব্যথিত হইল, ইহা তাহার কাছে নূতন নহে, ঘরে যাহাদের কাঁদিবার স্থান নাই, দিকে দিকে গঙ্গার তীরে অজস্র ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা কীর্ত্তনে যাহাদের কোন স্বাদ লাগে না...তাহারা এই মর্ত্ত্য জীবনের জন্য কাঁদে... কোথাও নিশ্চয়ই ইহা সৌন্দর্য্য, কোথাও অনিবার্য্য ইহা সুখ।...রুক্মিণী অবশ্যই বলিতে চাহে, তোমরা যাহারা কান্দিবার স্থান পাও না, আইস আমার আমাদের নির্জ্জনতায়, কাঁদ...

অধুনা কান্নার শব্দ ও সুরম্য হরিধ্বনি ও গঙ্গার রমণীয় বায়ু সংমিশ্রণ তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্রণবিরহিত করে, সে স্থির যে পুরুত মশাইকে কোন কথা প্রশ্ন করিবে না এবং সে ঘাট পরিত্যাগ নিমিত্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল; গ্যাসের আলোর দেওয়ালে পতিত অনেক ধর্ম্মকথা শ্রবণ ব্যাপৃতদের কম্পমান ছায়ার অন্ধকার পার হইতেই, শুনে সেই মহতী ঘোষণা যে, হে প্লবঙ্গ, আমি তোমার হৃদয়ের শুভাশুভ সব জানি...হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্। ইহা ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন। রুক্মিণীর গাত্রে সিঙ্কিড়া-চমক লাগিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুরুতমশাইয়ের গম্ভীর বদনমণ্ডল তাহাকে আকৃষ্ট করিল যে করযোড়ে সে গতিহীন হইবার, ইতিমধ্যে তিলেক নাসিকা কুঞ্চিত হয়—যে এই পুরুত মশাই অঘোরমণি নাম্নী বেশ্যাসক্ত এবং সেই অঘোরমণি পুরুত মশাইকে দানপত্র করে, ইতিমধ্যে আপনার কারণে সে ভাবে ঠাকুর বলেছেন মনের পাপ পাপ নয়। তুলসীদাসের দোঁহা— কলি কর এক পুনীত প্রতাপা। মানস পুণ্য হোই নহি পাপা।— গাহিয়াছে সম্ভবত, যে কলি যুগে মনের পাপ পাপ নহে অথচ মনের পুণ্য পুণ্য। ইতিমধ্যে সে মারাত্মক সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান শিখা দেখিয়াছে, অনর্গল শীষ উঠিতেছে অবলোকন হয়।

সে রাম-কথা শুনিতেছিল। সভা ভঙ্গ হইতেই পুরুত মশাই তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন, কিছু আগে তিনি তাহাকে দেখেন। কহিলেন...'হঠাৎ কি মনে করে...'

'আজ্ঞে তেমন মানে আজ্ঞে...এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম...আপনার রাম-কথা শুনব তাই...'

'...সে কি তোমরা আজকালের ছেলে...রাম-কথা...বটে...না না কি বলত...'

'...আজ্ঞে সত্যি কিছু নয়...'

জানালার সুন্দর আননখানি এবার তদীয় সমক্ষে উদ্ভাসিয়া উঠে, সত্য সে কি জানিতে আসিয়াছে, এক অপরিমেয় নির্ব্বুদ্ধিতা তাহাতে সংক্রামিত হইল।

পুরুত মশাই আপন কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিলেন, 'বাবা তেতলায় কাউকে দাও, একলাটি একেবারে, তবু পায়ের শব্দ কথাবার্ত্তা শুনব।' এবং ইতঃপূর্ব্বের দুইটি ভাড়াটে* উঠিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ তিনি বিদিত। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এ বাড়িতে বাসের পূর্ব্বে করিয়াছিলেন, পুনরায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন হইল; ছাদের ঘরের চাবি তাহার নিকট। কিন্তু একদা রাত্রে কন্যাকে ছাদ হইতে নামিতে দেখিয়া সবই বোধগম্য হইল। এখন, গঙ্গাতীরে রুক্মিণীর আনত মুখ দর্শনে গ্যাসের চাবি ঘুরাইতেই হঠাৎ অন্ধকার, বলিলেন '...আমার মেয়ে লবঙ্গ...' একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস গঙ্গার হাওয়ায় উধাও হইল। অতএব রাত্রে যে জানালা-বর্ত্তিনী হয় সে লবঙ্গলতা...!

রুক্মিণী কদাচ তর্ক তুলে নাই, মনেতে, যে লবঙ্গলতা একাকিনী কেন! কেন সে সম্পূর্ণ অসূর্য্যম্পশ্যা।†

পুরুত মশাই আর তাহার অবহিতির জন্য নানান কিছু বলেন।

সে তখনই বাড়ি প্রত্যাগমন করিল না, গঙ্গার ঘাটে বসিল। ইদানীং ঘাট বেশ লোকবিরল, শুধু এখনও আর অন্য একটি অথবা সেই বৃদ্ধা গ্রাম্য সুরে কাঁদিতেছে, চারিদিকে দেহেলা সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হওয়ত উহা সঞ্চারিত হয়। আপন বৈলক্ষণ্য লইয়া সে এখানে অবসন্ন, কেন সে ঘাটে আসিয়া বসিল, কোন সংজ্ঞা তাহাকে বিকল করে, তাহা সে অনুধাবনে সহজ নহে; কখনও আত্মগোপনের পন্থা চিন্তায়, আবিষ্কারে, বেসামাল তখনই চকিতে ইতস্তত দৃষ্টি নিরীক্ষণ করে, যখনই ষ্টিমারের আলোয় ওতপ্রোত; ঘামিয়া উঠে, কেননা অনন্তর দিদি সুকুমারী তাহার ফোটো তুলিতে চাহিয়াছিলেন; ইহার ঘোমটার ‡ হেয়ার পিনে— ঘোমটা যাতে আটকান থাকে— চমৎকার হিরোনডেল যাহা পান্নার, শুধু ডানাদ্বয় লাল চুনীর, এই উড্ডীয়মান মণিময়তা রুক্মিণীর কল্পনাকে

* এই বাড়িখানি আজ প্রায় দুই বৎসর হইল তাহাকে অঘোরমণি দিয়াছে।

† যদিও তখনকার সময় পর্দ্দানশীন ছিল।

‡ ১৯৩৫-৩৮ অবধি অবিবাহিত অরক্ষণীয়াদের ঘোমটা দেওয়া চলন ছিল।

বিমোহিত, ইহা এক বিশাল ক্লাসিসিজম্— সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীর দেহ চক্রবৎ ঘুরিয়া বিহগ ;— তাঁহার পার্শী শাড়ী সমন্বিত প্রোচ্ছলিত দেহলতা গাম্ভীর্য্য খেলাইয়া বলেন,* যে গাম্ভীর্য্য তাঁহার নিজের, অন্যান্য ইংরাজ কুমারী সহিত, গাউন পরিহিত অঙ্গে, তাঁহার মুখমণ্ডল কিছু সৌখীন ঈষৎ জাগতিক হইয়াছিল। রুক্মিণী অসম্মত হয়। কেননা ফোটো-তোলান তাহার পক্ষে অহিতকর, আয়না দেখা হইতেও মারাত্মক ; এমন কি শ্মশানবন্ধু হিসাবে কখনও সে ফোটো তুলায় নাই, গঙ্গামণির বড় সাধ ছিল সে অতীব সসম্মানে যখন বি-এ পাশ করে তখন ডিগ্রী-পত্র হস্তে গাউন পরা একটি ছবি…কিন্তু রুক্মিণী জাতক্রোধে কনভোকেশনে যায় নাই…কেননা, ছোটলাটের উপস্থিতি হওয়া তাহাকে বিকৃত করে।

এখন সে সওদাগরী জাহাজের মর্ম্মন্তুদ সকরুণ বাঁশরীর ধ্বনি শুনে, দূর বিসর্পী মণিময়তা তাহাকে আকর্ষণ করিল ; সে ঘাটের একান্তে এই বিরাট মায়াময় সুন্দরী শহরের প্রতি তাকাইল, নেড়ি কুত্তা হইতে ভিখারী, ঠগ বঞ্চক যেখানে সুন্দর; এখানে কেরানীর মত স্ত্রীর শাড়ী পরিয়া† রবিবারে দুপুরের ঘুমে আচ্ছন্ন হইতেই চাহে, অন্য শহর তাহার নিকট ভীতিপ্রদ, এখানে রমণীর গোপনতা আছে ; রাজেনকে হত্যার পর শ্মশানে, তাহার পর গৌরের বাড়ি, তাহার মার সঙ্গে দেখা করিতে মাতুলালয়ে, কারণ ডলিদির বিবাহ সম্পন্ন হইবে, মাতুল জসটিস্ কিরণ এস. মুখার্জ্জি, কে-সি-এস-আই (যতদূর মনে পড়ে) নাইটহুডলোভী বিদ্যোৎসাহী, ইংরাজ-দাস, ইঁহার বাড়িতে ফ্লাগ মাস্ট ও নানা আকারের ইউনিয়ন জ্যাক সযত্নে রক্ষিত আছে, কেননা ইনি স্বদেশী কেস সকল বিচার-অভিজ্ঞ, ইঁহার এজলাসে দাশ সাহেবকে যাইতে দেখে, জুতার হিলে পাইপ ঠুকিয়া দরজায় হাত দিলেন, ক্ষণেকে অন্তর্হিত…ডকে আসামী এই সূত্রে দৃশ্যমান হইল , সেও ভিতরে প্রবেশ করে ; বিচার চলিতেছে ; ডক সরিল, অদ্ভুত রহস্যময় আলোয় ঘুরন্ত সিঁড়ি, আর একজন আসামী উঠে ; রাত্রের উজ্জ্বল শহরের উপর বিদ্যুতের যে প্রভা সম্ভব হয়। রুক্মিণী ইঁহাকে ঘৃণা করিলেও মার জন্য সে মাতুলকে অসম্মান করে না।…বিবাহবাড়িতে এক বিষম অবস্থা ; বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা, ঝাড় লণ্ঠন, রসুনচৌকী. অজস্র পান সাজা, ট্রেতে উত্তম সিগারেটের টিন উল্টান, পদ্য সকল উড়িতেছে, দূরে নানা

* কেননা তিনি ইংরাজি স্কুল-কুম-কলেজের অধ্যাপিকা…তিনি বিলাতী ডিগ্রাপ্রাপ্তা।

† তখনকার সময় প্রায় লোকে স্ত্রীর বা মহিলার শাড়ী পরিত, সম্ভবত অবস্থার হেতু।

রকম মুখ (রেসিয়াল) অধোবদনে ঘোরাফেরা করিতেছে। 'টেলিগ্রাম' বলিয়া পিয়নের চীৎকার শোনা যায়। কেননা ডলিদি সাজিতে বসিতে বলে, বিবাহ করিবে না, এদিকে স্যার পি. সি. ব্যানার্জ্জির পুত্রের সহিত তাহার ঘণ্টা কয়েক পর বিবাহ। জসটিস্ কিরণ মুখার্জ্জি লজ্জায় উধাও। প্রথমেই মলির সহিত সাক্ষাৎ— মামীর ভগ্নীর কন্যা যে অল্প বয়সে মাতাপিতা হারাইয়াছে, এই বাড়িতে পালিতা···বলিল, 'কাল কোথায় ছিলে···কোথায় ঘুমিয়েছিলে···না' তারপর তাহার দিকে চাহিয়া '···বাড়ি চলে গিয়েছিলে'···ফোন আসিল। মলি উত্তর করিল, '···বাবা তুমি দেখছি পাগল হয়ে যাবে···কোথায় আছ বল, আমি···কেঁদ না···দিদি তাহলে আত্মহত্যা করবে·· স্যার···ভাববে লেডী··· সে নিজে কি···খবরের কাগজ···বার হত···তোমার বাড়িতে ৪০টা স্যর এসছিল এই ত···বড় সিলি' বলিয়াই সংযত ভাব ধারণ করিল ; কহিল···'না না কোন কথা নয়, তুমি বাড়িতে চলে এস···স্যর পি. সি. নিজে আর লেডীও এসেছিলেন···কোন অপমান হয়নি···' এবার সে টেলিফোন রাখিল ; টেলিগ্রাম সই করে···তাহার সুন্দর হাতখানি ওনিক্সের উপর বড় মনোহর প্রতীয়মান হয় ; রাশীকৃত না-খোলা টেলিগ্রামের সমক্ষ হইতে মুখমণ্ডল তুলিয়া কহিল, '···এখুনি জানা যায় বাবা কোথায় কিন্তু···' এইখানে পুলিশের নাম শ্রবণে সে অবাক ছিন্নভিন্ন হয়, অথচ যাহারা গতকাল এখানে মোতায়েন হইতে আসে। মলি সামলাইয়াছে, এই বিবর্ণ বাড়িতে সে-ই একমাত্র কর্ত্তব্যশীলা ; তাহাকে থাকিতে ও পিসিমাকে না লইয়া যাইতে অর্থাৎ গঙ্গামণিকে অনুরোধ করে* এইসব দিন সে ইচ্ছায় এখন স্মরণ করে, মলি একদা বলে··· 'ও ডিয়ার তোমাকে কদাকার আগলি দেখতে হয়েছে, বেয়ার্ড···ইচ্ছে করে এখুনি বাবার রেজর এনে—' একদা প্রশ্ন করে··· 'তুমি কি ভাব বলত···'

যাহা এতদিন তাহার নিকট অপরাধ, রসিকতা করা, তাহা ঐ ভয়ঙ্কর আঁৎকানর মধ্যেও আসে। ও মলি !

ইত্যাকারে ভাবনা এই হেতু যে নিশ্চয়ই সে ভীত, আবার হত্যা করিতে হইবে, আবার এই সুন্দর কলিকাতায় আত্মগোপন করিতে হইবে ;···তাই সে ইহার রাস্তা সমুদয়ে বেশ কিছু পরিভ্রমণ করে, কোথাও স্কুলের পাঠের

---

* তাহারা দীন ; মাসীমা তাহাদের আসা যাওয়া পছন্দ করিতেন না— মা তাহা বুঝিতেন : কিন্তু মামা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন, ৺বিজয়া বা দরকারে আসিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থাকিতে হয়— মলির সম্পর্কে তাহার আড়ষ্টতা তাহার অজানিতে নিশ্চিহ্ন।

উচ্চৈঃস্বর, কোথাও সাইকেলের ঘণ্টি, ফুটপাতের ঘুম, বৃহৎ কলেজ স্কোয়ারের মৎস্যদল, উনুনের সর্পিল ধূম, বৃদ্ধের গমন, ভিখারীর ভগবানের নাম, ডাস্টবিনের নিকট পরিত্যক্ত ভ্রূণ, রাস্তার কলে ডাগর রমণীদেহের সরমে স্নান, ভিস্তির জল লইয়া তৎপরতা, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, গড়ের মাঠ হইতে চৌরঙ্গী ট্রামবাসের মধ্যে আলো উদ্ভাসিত চৌরঙ্গী ইত্যাদি অনেক মায়া তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছে! ক্রমশ সে যেন কোথায় বায়ুচালিত হইতেছে।

ফলে যাহা তাহার পরিত্যাজ্য ; কুৎসিত নিন্দনীয় এতকাল ; যাহা দুশমনতা, তাহাই চক্র দিয়া উঠে, যৌবনাদের কথা, এখন ভাবে, সুকুমারীর গাম্ভীর্য্য মলি, কি পর্য্যন্ত সুচতুরা, এমন যে…সমিতির বারোয়ারী সরস্বতী প্রতিমা তাহাকে বিমোহিত করে, তৎসহ মামাবাবুর মোজা পরার মধ্যেও কি এক আভিজাত্য!…কখনও জীবনের স্বচ্ছলতা, কখনও দারিদ্রতা, এবং হাসপাতালের ম্লান মুখ, লৌহগরাদের অন্য পাশে চোখ, গরাদ-ধৃত হস্তের নখের ময়লা, বজ্র হানিয়াছে। লবঙ্গলতা নাম একদা উচ্চারণ করিয়াছে।

কাটারীটা লবঙ্গলতাকে অশরীর প্রমাণ করে, যা তাহার কাছে অসভ্যতা, অবশ্য চকিতে এতাবৎ জীবনধারা তাহাই বলিতে চাহে, যে লবঙ্গলতা নহে সকল রমণীই অশরীর! তখনই আত্মগোপনের সময় এই ঘটনার উল্লেখ হয়। ব্রজযোগিনী মেসে রাত্রের বাঁশীর শব্দ যখন শুনিতে থাকে সে তক্তপোশে শায়িত, সে সময় প্রসাদবাবুর মুখে নিজ সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণে লজ্জা হয়, তিনি তাহার আননে খানিক হেজলিন স্নো* মাখাইয়া দেন এবং তিনি তাহাকে…! তথাপি সে কাটারীটি কয়লার ডাঁইয়ের উপর ছুঁড়িয়া দেয়, গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়াছিলেন।

এখন সে চিলের ছাদে, চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকের নিম্নের রাস্তা দেখে ; এসময় ফ্লাইং ক্লাবের প্লেন নিম্ন আকাশে সঘোর আওয়াজে ; লবঙ্গলতা চোখ তুলিয়াছিল, দেখিয়াছিল অসহায় রুক্মিণীকুমার, যে মন্ত্রমুগ্ধ। রুক্মিণীকুমার বেশ খানিক পরে আপনার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে। যুগপৎ সচেতন হয় যে, উপেনের মৃত্যুতে অনেক স্কুলবালকও ধৃত হইয়াছে, আর যে গোপনতাই তাহার নিশ্বাস। এবং তখনই এই বাড়ির গা-উদ্ভূত ঝামরান অশ্বত্থ গাছের পাতার ফাঁকে পগারের

* অথচ তিনি অনুশীলন, বা যুগান্তর, পরে বিপিনবাবুর দলে যোগ দেন, ইদানীং ফটিকদার দলে ঘোর স্বদেশী ; হেজলীন ইংলণ্ডে প্রস্তুত।

দৃশ্য…যেখানে প্রায়ই ভ্রূণ পড়িয়া থাকে, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিল।… সেই রাত্রে মা তখন বাহিরে গিয়াছেন, জানালা খুলিয়া গেল, রুক্মিণী…পার্থিব শোভার সন্নিকট…। লবঙ্গলতা কহিলেন…'আপনি কি ভীত…তবে কেন দুঃখিত মানস দেখি?'

রুক্মিণীকুমার উত্তর দিয়াছিলেন, 'আমার আপনাকে বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।'

'সত্যই…আপনি ভীত নন…'

'না…আমি সবই শুনিয়াছি…দেখিয়াছি। (অর্থাৎ লবঙ্গলতা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা।)

নিশ্চয়ই রুক্মিণীর অবচেতনে ইহাই স্থিরীকৃত যে এই ভয়ঙ্কর, যদি সৌন্দর্য্য, তাহার দুশমনতা পাপকে বিধৌত করিবেক। (হায় উপেনের মৃত্যু যাহার গীতা-পাঠে শুদ্ধতা লাভ ঘটিবে, একদা এইরূপ সংস্কার ছিল।)

তখন রাত্র দুই ঘটিকা। এই পাড়ায় কুকুরের সঘন আওয়াজ উঠিল, মেথরদের সারেঙ্গীর রামধুন স্তব্ধ, পক্ষী কলরব করে, কেননা ভয়ঙ্কর বোমার আওয়াজ হয়; মর্ম্মন্তুদ চীৎকার উত্থিত হয়; আর্ম্ম পুলিশরা স্তম্ভিত—টর্চ্চের আলো চারিদিকে, রুক্মিণীকুমার নল বাহিয়া অশ্বত্থ গাছে, সেখানে দড়ি ছিল, ফেলিয়া নলের সাহায্যে নিম্নে পগারে…।

একদিন মরিয়া রুক্মিণী ঐ বাড়িতে উপস্থিত।

লবঙ্গলতাকে সে প্রশ্ন করে, 'আপনি যখন বোমার আওয়াজ…গুলির শব্দ শুনিলেন…তখন আপনার ভয় হইল না…'

'না ত, খুব ভাল লাগিয়াছিল, আমি পালঙ্কে শয়ান ছিলাম, আমি নিজেকে দেখিতে চাহিলাম, আমার দেহ নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল; মনে হইল কে যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে পলায়ন করিয়া আমার নিকট আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আমি বোমার আওয়াজে আনন্দিত হইয়াছিলাম, আমার ঋতু আরম্ভ হইয়াছিল। বুঝিলাম আমি পুত্রসম্ভবা হইব…তুমি কি আমায়…'

'আমার বাসনা হয়, আপনার ঐ দুরারোগ্য রোগের গভীরে, যেখানে অদ্ভুত দিব্য নীলিমা বিদ্যমান, সেখানে চলিয়া যাই, মহা শান্তিতে ঘুমাই—'

'একথা কি সত্য।'

'যেহেতু আপনি সশরীরে আমার সমক্ষে বর্ত্তমান অতএব এই মুহূর্ত্তে ইহা সত্য হইল।'

এতাবৎ নবজলতার স্বল্প স্থূল অবয়ব দণ্ডায়মান আছে, যাহার প্রতি বিন্দু রুক্মিণীকুমারকে শান্ত করিয়াছিল, ত্বকের তেজঃসম্পন্ন চিক্কণ উজ্জ্বলতা—তাহাকে কবিত্ব দিয়াছিল, সুবিশাল উরুদ্বয় তাহার বিজয়বার্ত্তা ঘোষিল—এতকাল সঞ্চিত গুপ্ত প্রেম উদ্ভিন্ন হওয়াতে সে কাঞ্চনবর্ণ।

একদা অন্ধকার কক্ষে সে বৃশ্চিকের সম্মুখে আপন হস্ত যাহা দেহের অংশ—যাহা ইন্দ্রিয়বান—তাহা আগাইয়া নিয়াছিল—কেননা সে আপনার অস্তিত্ব জানিতে চাহিয়াছিল।

অনেকদিন পর চেনা সকলের, দলীয় যাহারা তাহাদের, এড়ানতে সে আজ না কাল করিয়াছে, তথাপি কিন্তু ফাঁসীর সময়কালীন মৃদু স্মিত হাস্য তাহার নিকট ঐ রোগ হইতে মারাত্মক। সেদিন ইচ্ছা করিয়া চায়ের দোকানে প্রবেশ করিতেই সকলেই যেন আঁৎকাইল। সে আয়নায় দেখিতে সাহস করে নাই, প্রতি পানের দোকান ছাড়াইয়াছে···শো-কেসে ছেলেভুলানো খেলনায় সে বিভীষিকা প্রমাণিত হইল। না, কাঁচে নাসিকা তাহার নাই! লোক এখনই কি ভিক্ষা দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

এই কি আমি!

নিজের করপল্লব কর্কশ হইয়াছে; সে আত্মসমর্পণ করিতে দৃঢ়।

জমাদার (অর্থাৎ মেথর) তাহাকে সার্চ্চ করিল। বিশ্রী গন্ধ তাহার নাকে আসে।

পুলিশ অফিসার: 'আপনি রুক্মিণীকুমার···তার প্রমাণ কি (ইহাতে একটি ইঙ্গিত ছিল—কিন্তু রুক্মিণী ওষ্ঠ দংশন করে) কোন কিছু মিলছে—হ্যাণ্ড-রাইটিং মিলছে না···লেটারাল স্ট্রোক একেবারে আলাদা···একমাত্র কপালের দাগ···হাসুন···না টোল পড়ছে না···যদি···বুঝি···দরওয়াজা এই কুর্সি জমাদারকে লে জানে বল!'

ইহাতে তাহার মন ছিছি করিয়া উঠে, সে নবজকে ত্যাগ করিতে অগ্রসর! ধীরে ধীরে পথ অতিক্রমে, এখন সে লিণ্ডসে স্ট্রীটের রাস্তার প্রতি তাকাইল; তাহাকে সৌখীনতা আহ্বান জানাইল। নিউ মার্কেটে ফল কেক বস্ত্র ফুল ও চর্ম্ম মাখন চীজের গন্ধ, সে অবাকভাবে আপনাকে লাভ করিল; বারবার পরিক্রমণের পর এখন সে মধ্যবর্ত্তী স্থানের শো-কেসের সম্মুখে, যেখানে আয়না,

আপন মুখমণ্ডলের সমস্তটাই পরিলক্ষিত হয়।

সে আপনাকে সৌখীনতার অন্তস্তলে নিরীক্ষণ করে, যে সে 'ভয়াবহ' তৎ-সত্ত্বেও সে হয় গর্ব্বিত।

যে সে এখন লবঙ্গলতার সহিত রোগজীবাণুতে রক্তে মাংসে সে এক অদ্ভুত ইনসেস্‌চুয়াস বোধে সে চমৎকৃত।

প্রকাশ থাক, রুক্মিণীকুমারের এই কলিকাতার রাস্তায় রাইফেলের গুলিতেই মৃত্যু ঘটে!

লুপ্ত পূজাবিধি

শিশুমৃত্যু, এই পদ আমাতে, এই সঙ্গীনত্ব মুহূর্ত্তেই এক বিলাসের, সাধারণ ভাবে এক মজার আকর হয়; যাহার নিকট আলো অন্ধকার সমান, যাহা যে কোন জিনিসকে গোল বোধে আঁকড়িবে, যে সে চলকান রূপান্তরিত দুগ্ধ! আদতে সেখানে পরিচ্ছন্ন হরফে লেখা ছিল 'শিশুমৃত্যুর হার'— যাহাকে যে পদকে এক মসৃণ দীর্ঘশ্বাস অন্তে, নিরুপায়েই কথার খেলাতে আনীত হয়— এবং উপরে ছিল বাঙলা দেশে, সংখ্যা ছিল এক এবং অনেক শূন্য, যে এবং নীচেতেই বেশ বড় টেবিলে, যাহা প্রায় দশ ফুট লম্বা কেননা তাহারা অনেক-জন বালক সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চওড়ার দিকে দুই এক জন বালিকা কম ছিল, ঐখানে অসংখ্য ছোট ছোট চীনে মাটির পুতুল, ইহারাই মৃত শিশু! ব্যাখ্যাকারিণী ভদ্রমহিলা, বলিয়াছিলেন কিছু ইনটারেস্টিং করা মানসে অর্থাৎ তোমরা যাহাতে সহজে আন্দাজ করিতে পার ঐ ভয়াবহতা তাই পুতুল দিয়া বুঝান।

ভদ্রমহিলার চেহারা ইদানীং আর এক, এতক্ষণ যিনি বলিয়া চলিয়াছিলেন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা, অসাবধানতার কথা, মধ্যে মধ্যে তিনি থামিতে আছেন, এখন তাঁহার মুখে আর রূপ চরিত্র খেলিয়া থাকে যাহার নাড়ী আছে ঐ বন-স্থলীর অন্তরঙ্গ স্রোতের তলার যে কোন দুটি চকমকি যাহারা কখনও, কত ধারা বহিয়াছে, তথাপি, অগ্নিতত্ত্ব হারায় নাই! ইহাই কহিতে যে, 'বালকেরা ছুঁইও না, বালিকারা ছুঁইও না'।

এই উক্তিতে যে বালক অনবরত গাল চুষিয়া থাকে, সে অদ্ভুত রকমে মস্তক ঘুরাইল, উহার নিম্নেই অনেক পুতুল; কিছু বালিকাও বক্তার প্রতি চাহিয়া-ছিল তখনই, ইহাদের আহামরি কেশপ্রান্ত, কাহার বা কুঞ্চিত ঐ ঐ মৃতদের স্পর্শ করিয়াছিল; এই সময়েতে কাহারও, উহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় সতর্ক হইবার কারণে, অঙ্গুলি সকল ঐ পুতুলে লাগিয়াছে, যাহাতে এবং তৎকালেই কোন অচিন্তনীয় শব্দ ঘটিল, এখনও ইহা তন্ময়তা নহে! অল্পবয়সী চোখগুলি গভীর হইল, উদ্বেগ আসিল, এবং সুপরিকল্পিত চরিত্র লাভ করিল, অতএব ঐ

শব্দ হয় অপরাধ! কিন্তু আশ্চর্য্য যে ঝটিতি কেহই পশ্চাতের দিকে চাহিল না, —সেখানে কি অভিনব স্থাপত্য! কলিকাতার আলোতে উহা পরম সমাজ-বন্ধন সজীব নৈতিকতা হইয়াছে, যেখানে, করগেটের বেড়ার পাশে, উন্মাদিনী চৌরঙ্গী, গ্রাণ্ডহোটেল, লিপটনের বিজ্ঞাপন, হোয়াইটওয়েজ—ছোট বেড়া-বেণীর রিবনের ফুল (বো) গুলির যেমন চোখ আছে, তাহা সকলও ভয়েতে জড় হইয়াছে সমক্ষে—টেবিলের অন্য পার্শ্বের বালকদের দিকে তাকাইয়া; কিন্তু আশ্চর্য্য যে ঐ শব্দ ইতিমধ্যেই, নিশ্চয়ই সকলের অতীতে; এখানের শূন্যতা এক অমোঘ কাঠামো যাহা অবলম্বনে উহা ঐ শব্দ চমৎকার সঙ্গীত পদে আভাসিত হইল, ছোট দেহগুলিতে চোরা মাধুর্য্য চলকাইয়া আছে; পুনরায় ঐ শব্দ আওয়াজ শুনিতে ঔৎসুক্য সমবেততে আসিল। মৃত শিশুদের দিকে তাকাইল।

ভদ্রমহিলা, কিন্তু স্বীয় মুখখানিকে, ঐ পারিপার্শ্বিকতাতে, সাবানের সূক্ষ্মতা ধরিয়া দক্ষতার সহিত পূর্ব্বাবস্থাতে আনয়ন করিতে সময়, সপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, সপ্রতিভ হওয়ত নিজ বস্ত্র যাহা সুবিন্যস্ত আছে তাহাতেই ঠিক দিবার পরে, কণ্ঠ ঈষৎ সংস্কৃত করিয়া আরম্ভ করিলেন: ইহা অতীব দুঃখের যে প্রতি বৎসরে বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইতে আছে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে।

গ্রামাঞ্চল বলিতে ঐ বালকটি যাহার ভ্রূতে সুতীক্ষ্ণ দাগ, তাহার চোখের পাতা বারম্বার উঠানামা করিল—ইহাতে বুঝায় চিমনীর ধোঁয়া যাহা ক্রমে বিলীয়মান তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে; এবং তখন সে আঁকিতে আছে নদীতে নৌকা, গ্রাম, একটি কুঁড়ে, কিছু গরু, সূর্য্য এখন আছে; ড্রইং শিক্ষক এংলো ইণ্ডিয়ান বলিয়াছিল, 'সংস্থান বেশ, নৌকাটা আরও কালচে কর'।

বালকটি যাহার ভ্রূতে দাগ আছে, মুখখানি তুলিয়াছে, কণ্ঠের রেখা ধনুকের ন্যায়, এই ভঙ্গীতে অতএব উহারে বড় গরীব লাগে, অথচ কি চমক শার্টে, ত্বক কি বা রম্য, সে প্রশ্ন করিল, মহাশয় ইহা কেমনে ঘটে যে, আমি বলিতে চাহি যে, যেখানে আমরা সূর্য্য আঁকি, মানে প্রত্যূষের সূর্য্য, অবিকল সেইখান-টিতেই, একই স্থানে সন্ধ্যার সূর্য্য আঁকিয়া থাকি আমরা—শেষ পদটি তাহার অতি কোমল গীত প্রধান স্বর গঠিত হইয়াছে। ঐ বিরাট ক্লাশ রুমে যেমত কেহ নাই!

ইহাতে আর আর বালকগণ মাথা তুলিয়াছে আঁকা হইতে, যে এবং সকলের

ওষ্ঠেই স্মিত হাস্য — যাহা সঠিক বিচারে নির্ব্বুদ্ধিতার, ও তাহার লাগসই উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিল, ড্রইং শিক্ষক ঈদৃশ প্রশ্নে সোজা থাকা হইতে সহজ হইতে চাহিলেন, তাঁহার নজর সেই বালক আকৃষ্ট করিল, যে যাহার, এতাবৎ মাথা নীচু করত মনোযোগ সহকারে অঙ্কনের নিমিত্ত, ঘাড়ে অল্প বেদনা হওয়াতে এখন যে ঐ বেদনা আরামের জন্য ধীরে মস্তক সঞ্চালন করে; যে শিক্ষকের নজরেই গ্রীবা আড় অবস্থায় থামাইল; তবু আশ্চর্য্য শিক্ষক তেমনি একদৃষ্টে আছেন, সুতরাং এই বালক নিশ্চয়ই অস্বস্তিতে রহে; নিশ্চয়ই ইত্যাকার স্থিতির উপমাতে, কখনও বলিয়াছে, আমি বৃক্ষ নই! যে এবং তাহার মনে হইল তাহার সুন্দর কপালে ঐ প্রশ্নের সূর্য্য বিষয়ক উত্তর লিখিত আছে। লজেন্সওয়ালাকে কি অপরিমিত দেখিতে, যাহার ট্রে-র কোণে সোজা তারে বিদ্ধ আছে, অসংখ্য ছোট চৌকোনা কাগজ, স্লিপ, পয়সা দিয়া একটি স্লিপ ছিঁড়িতে হইবে, সাদা স্লিপ অন্য পার্শ্বে টিনে জল, স্লিপটি তাহাতে ফেলা হয়, কি তাজ্জব। যত নম্বর বা লেখা উঠিবে, যত নম্বর বা লেখা সেই অনুসারে জিনিস পাইবে। এখন ড্রইং শিক্ষক ঈষৎ ঠোঁট ফাঁক করিলেন, যে অবশ্যই এযাবৎ তাহাতে অবিনশ্বর ভ্রম হইতে, স্পষ্টতা আসিল, ইহা, কি মানে ঐ প্রশ্ন কি বৈজ্ঞানিক ছলনা!

ড্রয়িং শিক্ষক আপনকার ভ্রূ দ্বারা ধ্রুব যে কিছু বাছাই করিতে থাকেন, যাহা প্রথমত নিছক ঘটনা, যে তাহাদের মহল্লার বাঙালী পাদরী, নিয়মিত সন্ধ্যায় উহার অরগানে (টেবিল হারমোনিয়ম) গীত গাহে; যে চমৎকার বিবাহের জমায়েত, কনের মাথার ভেইল যাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেসের, ইহার মধ্যে কুমারীর মুখমণ্ডল, যাহার চাহনি, পদক্ষেপ, লজ্জা সমস্তই শাস্ত্রীয়, অর্থাৎ ঐ রমণী বা রমণীই নিজেই সমগ্রভাবেই শাস্ত্রীয় বিধি ইহা প্রকাশিত; যে পরক্ষণেই সাট-বাজারের কবরখানাতে, ট্রাম হইতে দেখা কত না সংস্থান, পাদরী গহ্বরে মাটি ফেলিতেছে! এই পর্য্যন্ততেই তিনি পরিশ্রান্ত, যে এবং স্বীয় কোটের বোতাম, খুলিতে গিয়া ইহা অশালীন, থমকাইলেন, কেননা প্রশ্নকারীর গলার লাইন তাঁহাকে, সম্পূর্ণ যদিও তাহার চোখে পড়ে না, — বিশেষ উৎচকিত করিয়াছে, যেহেতু উহা যারপরনাই ক্লাসিক! ভদ্রলোক ঐ প্রশ্নের সমক্ষে, সত্য এই বুঝিলেন যে আমি কলের পুতুল, যে তাই ভীত, তাহার মধ্যে আচারব্যবহার আছে কিন্তু অনুভব নাই, বৃত্তি নাই, ক্রিয়াতেই তিনি ধর্ম্ম জানিয়াছেন আধ্যাত্মিকতা নাই, ফলে ঐ সূর্য্য একস্থানেই সন্ধ্যা ও প্রত্যূষ, তিনি টরনার-এর

(বিখ্যাত ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপ পেইণ্টার) ছবিগুলি মনে দেখিলেন ; তবু কোন বস্তু যুক্তি তাহারে স্থিরতা দিল না তিনি এইরূপে স্বীয় অজ্ঞাতসারে নাস্তিক হইতে ছিলেন, 'কিছুরই কিছুই মানে হয় না,' 'সো-হোয়াট' 'ভালমন্দ' !

ভ্রূতে দাগ যাহার আছে সেই বালক লক্ষ্য করিতে আছে এখন অগণিত মৃতদের অন্তদিকে যে বালিকাটিকে তাহাকে, যাহার ঠোঁটের নীচেতে চকলেটের ঈষৎ দাগ, যে খুব মনোযোগ সহকারে ভদ্রমহিলার কথা শুনিতে আছে, নিশ্চয়ই কোথাও বক্তার মধ্যে মজার কিছু উহার নজরে আসিবে যাহা লইয়া মানে অনুকরণে বন্ধুদের এবং বাড়ির বড়দের আনন্দ দেওয়া যাইবে ; মধ্যে মধ্যে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইতেছে অর্থাৎ যেখানে তাহার অনভ্যস্ত একসেণ্ট ভদ্রমহিলা হইতে আসিতেছে। ভদ্রমহিলা অতীব সহজ করিয়া স্বাস্থ্যকথা, প্রসূতি-পরিচর্য্যা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন যে কিছু চেতনা জাগে, কিছুটা অবহিত ইহারা হইতে পারে, কিছু অল্পবয়সীদের একমাত্র অবাক করিয়াছে—সংখ্যা ! এক অতিকায় সংখ্যা, ইহাদের মস্তক বৃত্ত ধরিয়া ঘুরিয়াছে ; এখনই পুনরায় চীনেমাটির মৃদু শব্দ উত্থিত হইল।

ওঃ কে সে যে পুতুলগুলি ছুঁইতেছে, শিশুরা, এস টেবিল হইতে দূরে থাক।

আমি তাজ্জব হই কে সে যে করিল ! ইহা বালিকাদের মিস আপন কব্জিস্থিত ঘড়ি দেখিতে কালে, সিকস্থ পিরিয়ডের ক্লান্তকণ্ঠে কর্ত্তব্য সম্পাদন করত, তৎক্ষণাৎ হোয়াইটওয়েজ-এর ঘড়ি দেখিলেন। আঃ হোয়াইটওয়েজ ! এক দারুণ গন্ধ ! মা বলিতেন লেইডল, আমাকে বলিতেন তুমি সেই লেডল'র বাড়ির নেভী স্যুট পরিবে ! আমি সমস্ত লেডল যেন পরিতাম—বর্ষীয়সীরা বলিতেন 'লেটলা' এইখানে বঙ্কিমবাবুকে একবার পাঁচুবাবু দেখিয়াছিলেন !

লাভলি আমি না ; প্রিটি, আমি না, আমি না, কি মিষ্টি আমি না।

না, কখনই তোমরা ঐরূপ করিবে না আমি বড় রাগান্বিত হইব ! ইহাও মিস ব্যক্ত করিলেন।

ছুঁইও না পুতুলগুলিকে ! ভদ্রমহিলা কহিলেন, এই স্বর ভারী দম্ভপূর্ণ কর্ত্তৃত্ব-ব্যঞ্জক, অনেক বালিকা কেহ আপন জামার পিতলের স্কুলের ক্রেস্ট করা ব্রোচে কেহ চুলে হাত দিয়া, আপন স্বর শুধু চকলেট লাগা বালিকাটি নীচেকার ঠোঁট উল্টাইয়া কোন দাগ সেখানে আছে কি না জানিতে, দৃষ্টি সেখানে রাখিয়া ঐ কণ্ঠস্বরে আপন গলা মৃদুভাবে পরিষ্কার করিল।

ছুঁইও না ঐ সকল মৃত শিশুগুলি !

এখনও সকলের, অল্পবয়সীর, বেদনা দেহ মাংস অস্থিতে মনে হইতে সঠিক প্রবেশ করে না। এতক্ষণ পুতুল আখ্যায় সমবেত শিশুদের চোখ ছোট বড় হইয়াছে, আমরা জানি সুকুমারমতি বালিকাবৃন্দ প্রত্যেকেই পুতুল শ্রবণেই অনেক বিশেষ সহকারে অস্বীকার করিয়াছে শব্দ ঐ ব্যাপারেতে। বালকদের নিকট ঐ উক্তিতে যে এবং আদত মৃত্যুসংখ্যার অতিকায়তা বিনষ্ট হইয়াছে। যে বালকের উরুদ্বয় সুমহৎ সে পার্শ্বস্থিত সহপাঠীকে কহিল, এস ম্যান, যাই চল ঐ দিকে, এখানে আমি দেখি, কিছুই নাই যাহা খুব মজার···

মোটা কণ্ঠে আসিল, করিও না ত্যাগ ঐ স্থান, শোন, কি উনি বলেন, ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি উহাদের হতভাগ্যদের মধ্যে একজন নও, মানে শিশুমৃত্যুর সংখ্যার একটি, ইহা কি হয় পরিষ্কার, এখন শোন!

কিন্তু মহাশয় উহা সকল পুতুল···। যে ইহা কহিল, অর্থাৎ ঐ সুমহৎ উরুবিশিষ্ট বালক, সে যদি বালিকা হইত, ঐ কথা বলিতে তাহার লালা আসিত।

মৃত শিশু – মৃত শিশু!

এই বালক শিক্ষক কথিত পদে একাগ্র, যে নিশ্চয় তাহার মধ্যে ঐ রহস্যময় পদ শব্দিত হইতে আছে! কিন্তু তাহার অহঙ্কার মরিবার নহে, যে সে ঝটিতি প্রকাশিল, কেন মারা যায় তাহারা! চকিতেই বুঝে অসাবধানতা বশতঃ ঐ নির্ব্বুদ্ধিতা তখনই সে হন্তে হইয়া হাঁতড়াইল সঠিক পদ ও ডাক্তার! ডাক্তার! নার্স! আশ্চর্য্য কেহ কোথাও নাই, এ কি তাজ্জব স্থান, এখানে যেখানে প্রতিধ্বনি নাই! অবশেষে হতাশায় যে এবং এই সময়েতে পুতুলগুলির প্রতি নেহারিয়া মন্তব্য করিল, বেচারা! বেচারা!

ভগবানের ইচ্ছা! শিক্ষক উত্তর করিলেন।

ও ভগবান! উহার মুখনিঃসৃত হইয়াছে অথচ ভদ্রমহিলা বলিতে আছিলেন, আমরা যদি সজাগ হই, পরিষ্কার রাখি স্থান-সকল, ডাক্তারের সাহায্য লই, দেশী ধাত্রীরা নোংরা, তাহারা কিছু জানে না ডাক্তার ডাক্তারই সব। শিশুমৃত্যুহার রোধ করা যায় এই সৎযুক্তি সে শুনে নাই। কেননা ঐ দারুণ চরিত্র এই সময় ইহাও উপদেশ দিলেন, অবশ্যই 'মায়েরা এসব জানিবে' নিশ্চয় এবং আপনাকে সম্বরণ করিতে অক্ষম হওয়ত যোগ দিলেন, একদিন তোমরাও মা হইবে!

চপলমতি বালিকারা যাহারা পুতুল ভালবাসে এই ইঙ্গিতে, অল্প ফিক্‌ফিক

করিয়া হাসিল ; অথচ কি বিস্ময়কর নিম্নে অগণিত মৃত ! যাহাদের কারণে উহারা সকলেই কত দুঃখের কত দুঃখের বলিয়াছে, সুষমামণ্ডিত মুখে বেদনা ছাইয়াছে যে নয়ন সজল হইয়াছে হায় এখন তাহারাই আর অন্য !

যে বালক মা দিদি, পিসীমা বা মহিলা আত্মীয়দের সংস্পর্শ লজ্জার অপৌরুষেয় মনে করে সে খুব প্রায় ঐ স্মিতহাস্য দর্শনে অনুচ্চ স্বরে কহিল, 'কি এক গাব্‌বে হাউস' (জু-তে বাঁদর যেখানে থাকে সেই বাড়ির নাম) যে এবং তখনই শিক্ষক-কের উপস্থিতি বোধে দক্ষিণ দিকে আড়ে নজর লইল! মন্তব্য করিল 'সিলি'।

ভগবানের ইচ্ছা বাক্যে যে ছেলেটি মনে এখনও গুম্ হইয়া আছে, বেচারী সে ফিকে হাসির অর্থ নির্ণয় করিতে উৎসুক হয় না, বরং তাহার চোখে ইহা আভাসিত হইয়াছিল যে তদীয় পিতামহ স্যর ডি-টি সকালের কাগজে পড়িতে থাকিয়া মন্তব্য করেন, আশ্চর্য্য এখনও মানুষে তাহাদের ভালবাসার লোককে মনে করে মৃতদের ভুলে নাই— আঃ কেমন বড় দুঃখের কথা, ক্যর্নএল···প্রথমে জীবনে···আর্ম্মির, কাল হইয়াছে ; সমক্ষের প্রাতঃরাশের সরঞ্জামে, এমনও যে খিদমৎগারের মস্তকস্থিত পাগে, কোমরবন্ধের পিতলের তকমাতে (!) বালক বাতির শীষের তুল্য হাইলাইট দেখিয়াছিল, যে হাইলাইটে ডৌলত্ব বাস্তব হয়, এই পৃথিবী মধু মধু মধু ! ঐ সাদা হাইলাইট, এই স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী হইতে গিয়া মানে এই টেবিলের অসংখ্য মৃত শিশুদের যাহারা আনুভূমিক যাহারা সাদা তাহারা এক হইয়াছে ; এক বয়সী প্রান্তর উহাকে, উহার দেহকে, কম্পিত করিল, সে জানিতে চাহিবে, 'আচ্ছা দাদু ইহাদের কথা কেহ কি কাগজে দিয়াছে' ও ! নিজেই বিচার করিল কি বোকাম ঐ জানিতে চাওয়া ! এবং এখনই সে সচকিত হয়, কোনও শব্দে ! যাহা অসভ্য যাহা হয় নোংরা অথচ তখনই অর্থান্তর হইলে হইত ভাবুকতাতে যে ঐ অগণনরা কান্দিতে আছে !

এখানে ঐ চীনেমাটির পুতুল নেহারিয়া তাহার বড় কষ্ট হয়, এবং এখন যখন সকলেই বালিকারাও অতীব ধীরে মুখমণ্ডল সঞ্চালনে, বলিতেছিল, 'কি পর্য্যন্ত দুঃখের, কি দুঃখের—' যথার্থ সে যেমত লেহন ক্ষমতা চাহিল ; এইক্ষণে এই বালক, দুঃখে বিদীর্ণ হইতে আছিল সেই বালকের নিমিত্ত যে হয় জড়, যে অদ্ভুত বিকলাঙ্গ ভঙ্গী সহকারে পার্কেতে ঘোরাঘুরি করিতেছিল, যাহার পোশাক স্নিগ্ধ সিল্কের। ইহার বেল্ট কুমীরের চামড়ার, পায়ে জুতা বাক্‌স্কিনের মনে হয় দারুণ খেলোয়াড় ! মুখশ্রীতে ও ত্বকে হাজার বৎসরের অভিজাত বংশমর্য্যাদা ! ইহাকে এই বিকলাঙ্গকে ঐ বালক টিটকার দিল, ইহাতে তদীয় মুখ বিকৃত

হয়, এই জাতীয় কাণ্ডর সঙ্গেই সুদীর্ঘ এক ভদ্রলোক আসিলেন, তাহার চোখে প্যাঁসনে, তিনি করুণস্বরে কহিলেন, খোকা, এই বালক যদি তোমার ভাই হইত! ঐ স্বর ইদানীং ইহাকে ফারফোর করিল— সবেমাত্র দেহটি হায় হায়তে ভরিল; নিমেষেই, এই বালক, কিছু চতুরতার ইহা নহে, উহার ভাইয়ের বোর্ডিঙের প্রত্যহ প্রাতে পাঠ্য লেখা স্মরণ করিল যাহা শুধু গম্ভীর স্বরমাত্রা হইয়া তাহাতে আসিয়াছে, 'অনেককেই অহিতকর অমঙ্গলের বিশ্রী যাহা তাহা আকৃষ্ট করে, আমি ব্যতিক্রম, যেহেতু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি আমি বিভ্রান্ত হইব না, সমস্ততে সৌন্দর্য্য আছে যেখানে আলো পড়িবে তাহাই সুন্দর। তাহা ভগবান!' পুনরায় বালক পুতুলগুলি দেখিয়াছিল।

খুবই আলতো স্বরে পার্শ্বস্থিত ছেলেটি সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ক্রন্দন নকল করিয়াছে, ইহা এইজন্য নিশ্চয়, যেহেতু বালিকাদের অমুচ্চ হাস্য উজ্জ্বল হয়। অথচ ইহা যে বালিকাগণ টেবিলের প্রতি এমতভাবে দৃষ্টিপাত করে যাহাতে এই অর্থ হয় যে মহা করুণায়, অসংখ্য পুতুলকে তাহারা দেখিল উহাদের চোখ প্রকাশিল, বেচারী মৃত শিশু সকল।

বালিকারা তাজ্জব যে ঐ অসভ্যতা নিশ্চয় বুঝিল তৎপ্রযুক্ত তাহারা ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চনে মুখ ফিরাইয়াছে, কেননা এমন অভিব্যক্ত করাই শোভনীয় ভদ্রবংশ সম্ভূত ধর্ম্ম! তাহারা আবার সকলেই বক্তার দিকে মুখ ফিরাইল, এমতভাব দর্শাইয়াছে যে ঐ সদ্যঃপ্রসূত ক্রন্দন তাহারা শুনিতে পায় নাই, যে এবং তাহারা এতই উচ্চ অভিজাতশ্রেণীর যে ঐ ইতরতার তাহাদের স্পর্শ হওয়া, অসামাজিক, বিধেয় নহে! অবশ্য যাহাদের মুখে লজেন্স ছিল তাহাদের পক্ষে ঐ ব্যাপার এড়ান ভারী সহজ হইল!

সদ্যঃপ্রসূত ক্রন্দনে প্রায় বালিকারা যেমত এক হইয়াছে; অবিকল বিপরীত ভাব আসিয়াছে বালকগণের মধ্যে, ইহাদের ছোট দেহ সকল বিভিন্ন রূপে নড়িতে আছিল; যে বালকটি সব কিছুতেই গ্রাণ্ড বলে, গ্রেট বলে, গুড শো বলে, তাহারে দেখ, সে কি কিম্ভূত ভাবে অস্বস্তি বোধ করে, সে তাহার বাজুর মাদুলিগুলি নাড়িতেছিল কেননা সকলই গম্ভীর, সকলের দায়িত্ব ছিল নিজ স্কুলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবায়, যে তাহাদের স্কুল কলিকাতার সেরা; ফাদাররা, ইঁহারা তপশ্চারী, যেখানে নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য আপ্রাণ! কি ভয়ঙ্কর ভাবে— তাহাদের ক্লাসেই আসিয়া, যাহা অভাবনীয়— বেত মারিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে, ঐ ফাদার তদীয় গললগ্ন ক্রুশটি আঙরাখা মধ্যে রাখিলেন,

সেই বালকটিকে যে তাহার অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছে, যে ডাস্টবিনের নীচে-তেই ছাই সেখানে, ঠিক রায়ে স্ট্রীট-এর পাশে দক্ষিণে যে রাস্তা আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে রাস্তা সেখানে প্রায় লান্সডাউন রোড বরাবর সেখানে,…সেই ছাইগাদাতে কাপড় মোড়া গোলাপী রঙ ইন্দুরের বাচ্চার যেমন রঙ হয়, কি কালো চুল, কত লোক, সবাই বলিল কোন বড়লোক বাড়ির মেয়ের বা বিধবাই বলিয়া যে এবং প্রসবের অসভ্য সমার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, ইহা ঐ শব্দ, সে ঐ রাস্তাতেই শুনিতে পায়; যাহারা তামাশা করিতেছিল ইহারা সবাই বাঙালী, যাহারা হিহিতে মত্ত ছিল; আমাদের বেয়ারা যাহার সহিত সে স্কুলে আসে কহিল, তুমলোক কো সরম নেহি আতা হাস্‌তা! (হায় উহাদের কি নিষ্ঠুর কেহ বলে নাই!)

এখন সেই বালক মাদুলিতে অঙ্গুলি প্রদান করত ঐ টেবিলের প্রতি দেখিল, ইহাতে মানে করা যায় সেই পরিত্যক্ত গোলাপী রঙ কি এখানে একজন! যে সে সভয়ে শিক্ষকের দিকে তাকাইল— যিনি হুইসিল লইয়া, এ অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলি করিতে আছেন। সেই গোলাপী রঙ এমত হয় যে একদা কান্দিয়াছিল, আর এবং যেরূপে উহা কান্দিতে থাকে তাহারই অনুকরণ ঐটি যাহা সেই বালক করিয়াছে, আমরা সকলেই কি ঐরূপ নকল করিতে পটু, সত্যিই আমরা কি আশ্চর্য্যের যে আমরা নকল করিতে পারি; আঃ হা এস আমরা সকলে সমস্ত ক্লাস ঐরূপ নকল করি! সত্যিই সে কি সকলকে ঐ অনুরোধ করিয়াছে, ইহা বেশ হয়, যে কাব-এর (cub) জমায়েতে ঐরূপ ইয়েল (yell) দিবে—খুব মজা হইবে! তখনই বলিতে চাহিল, মনে করিও সেই বেতের ব্যাপার! বালক বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের চিকণ সীমারেখায় উপস্থিত তাহার চোখ চাহিয়া থাকিলেও পরিদৃশ্যমান অনেক কিছু অবলোকন করে না।

ভদ্রমহিলা এখন অনুরোধ করিয়া বলিলেও যাহা আজ্ঞার মতন শুনাইল—'এস, আমরা যাই ঐ ঘেরাতে,' ইহা শ্রুত হইবার সঙ্গেই শিক্ষক হুইসিল দিলেন, গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'বালকেরা প্রস্তুত!' এবং এই সময়তে কে একজন চীনা-মাটির পুতুলগুলিতে অদ্ভুতভাবে ঝটিতি অঙ্গুলি চালিত করিল, জলতরঙ্গ না পিয়ানোর শব্দের মত কতক পাশাপাশি পর্দ্দা বাজিয়া উঠিল, যে বকুনির ভয়ে সকলেই অন্যত্রে মুখ এবং হস্তদ্বয় সামলিয়া রাখিতেছে। একজন মাত্র বোকার মত মৃত শিশুদের প্রতি তির্য্যকে দেখে, দেখিল, একটি চমৎকার অভিজাত হাত, কোনও বালিকার, এক মৃত শিশু আঁকড়িয়াছে যে এবং ঐ শূন্যস্থানে অন্য

মৃত শিশুরা কি অবাকভাবে পূরণ করিল !

যুগপৎ আতঙ্কে বালকের চক্ষু স্ফীত, ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত হইয়াছে, সে দারুভূত ! অভিজাত হাতের পিঠের চমৎকার ত্বক ভেদিয়া নীল শিরা সকল ওতপ্রোত হইয়াছে, মানসিকতা, সঙ্কল্প যে কি অবধি দৃঢ়, তোয়াক্কাহীন, তাহার দ্বারাই উহা ঘটিয়াছে যে এবং ঐ পারিপার্শ্বিকতা যে দেখিতে পায় তাহাতে দুস্তর ঘৃণার উদ্রেক করিল, যদিও তখনই প্রত্যক্ষদর্শীর চোখেতে উৎকৃষ্ট লেস ঘেরা রুমালের কিছুটা পড়িয়াছে কেননা রুমাল প্রথমে মৃতদের উপর পড়ে, তবু ঐ শান্ত সৌন্দর্য্য তাহারে নৈতিকতায় ক্ষমার আভাস দিল না, সম্প্রতি ঘৃণায় তদীয় নাসিকা কুঞ্চিত হইয়াছে— যেমন যে মৃতদের উৎকট গন্ধ তাহার ঘ্রাণকে আক্রমণিয়াছে, এমনও যে অন্য বালককে দেখ দেখ বলিয়া সজাগ করিবার মত সংজ্ঞা তাহাতে নাই; শুধু তীব্র গন্ধ সে আলোড়িত হইতেছে যে সে স্থির ছিল, অতএব তাহার পরবর্ত্তী বালক যখন তাহাকে হঠাৎ ঠেলা দিয়া 'চল কি তুমি করিতেছ' বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে, এখন সে সত্তিত্ব পাইল, যে এবং তৎক্ষণাৎ সে সম্মুখের ও পশ্চাতের বালকদ্বয়কে জানাইল, দেখ ঐ বালিকা হ্যাঁ ঐ মনে হয় ঐ বালিকা একটা পুতুল তুলিয়াছে…

কি তোমার তাহাতে…

মানে সে চুরি করিয়াছে।

তাই…ও ভগবান…তুমি বলিতে চাও ঐ মৃতদের মধ্যে একটি…

অবশ্যই! কি চতুর প্রথমে রুমালটি ফেলে তাহার পর তুলিয়াছে আমি নিজের চোখে দেখিলাম। চুরি, ম্যান !

অদ্ভুত! কিন্তু ঐ…হে হে…মৃত শিশু দিয়া কি করিবে…খেলা যাইবে না।

কিন্তু মানে পুতুল কি মরে ? ছিঁড়িয়া যায় ভাঙিয়া যায় আমার ভগ্নীর একটি ঘুমন্ত পুতুল ছিল— সেটা এখন যেটি আছে সেইটির হইতে ঢের…কিন্তু চুরি করিল কেন !

তুমি বলিতেছ ঐ বালিকাটি ঐ বালিকাটি…

হ্যা হ্যা মনে হয়।

পাগল! উহারা খুব বড় লোক জান উহাদের রোলস আছে।

কি করিয়া জানিলে। যে বালক সম্প্রতি রায়েটের (১৯২৫) পরই এই স্কুলে আসিয়াছে সে প্রশ্ন করিল।

আমি দেখিয়াছি।

কিন্তু সে চুরি করিয়াছে…জানি না কেন…

অসম্ভব…সে মৃত চুরি করিবে কেন!

এখন টিটেনাসের আড্ডা (বুথ); ভদ্রমহিলা হাতে এক ছড়ি লইয়া, একটি চার্টে উহা স্পর্শ করত আরম্ভিলেন, ইহাকে কহে 'হুক ওয়র্ম্' ইহা স্বভাবত ঘাসে, ঘোটকের ময়লাতে থাকে, ইহা ভয়ঙ্কর, বালকেরা তোমরা যাহারা খেলা কর মাঠে জানিয়া রাখ কাটা বা ছড়িয়া যাওয়ার স্থান দিয়া ইহা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, বালিকারা শোন তোমরা ধনুষ্টঙ্কারের কথা বলিয়া—ফিরিয়া দেখিলেন কোন বালিকাই নাই,…মন্তব্য করিলেন, আশ্চর্য্য বালিকারা গেল কোথায়…

যে বালক মৃত শিশু চুরি দেখিয়াছিল, তাহার চোখ-মুখ দেখিলে বুঝায় যে উৎসাহিত হইয়াছে, তাহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, পাশের বালকের সম্মতি জানিতে চাহিল—বলিয়া দিব যে উহাদের একজন চুরি করিয়াছে।

থাম—তাহাতে তোমার কি!

কিন্তু চুরি এবং চুরি করা পাপ! বিবেক বলিয়া ত—এখন বিবেক শব্দ আরোপে, ইহা বড়দের নিকট হইতে শ্রুত, সে নিজেই উজ্জ্বল হইল।

ওঃ তুমি একেবারে সাধু!

খুব সাধুগিরি ফলাইতেছ, ইহা লালছেলে নামে বিদিত, স্কুলমহলে পরিচিত, বালক যোগ দিল।

সাধু সাধুতা নয় শুধু চুরি মানে…মানে সত্যই সাধুতার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী কিছু লজ্জা পাইল, বারবার বলিতেছিল ঠিক সাধুতা নয় শুধু!

আমার লক্ষ্য ছিল সেই বাইবেলীয় উক্তিকে এই ব্যাপারে ঠারে খাটান, কিন্তু কোন সূত্রে পারিলাম না একবার মনে হয় প্যারডি হইবে, কখনও ভাবিয়াছি জোর করিয়া হইবে—আর কিছু লাইন বাকি, দেখিব পারা যায় কিনা, বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই ঠিক আছে—অথচ কেন যে হইতেছে না। ঐ উক্তি এইরূপ যে: মৃতরা মৃতদের কবর দিক!

মোটাকণ্ঠে আসিল, কে কথা কহিতেছে এইখানে কোন কথা নয়! শোন।

এখন চারজন বালক ছুটিয়া আসিল একজনের মুখে জল। ইহারা ঈষৎ হাঁপাইতেছে। তবু কোনমতে হুক ওয়র্মের ছবির প্রতি নজর রাখিয়া শিক্ষককে আড়ে নেহারিতেছিল। উহাদের প্রতিটি মুখে চোখে দারুণ এক খবর ফুটিতে আছে শুধু একজন কোনমতে কহিল, আমরা মৃতশিশু চোরকে দেখিলাম,

সঙ্গে সঙ্গে আর তিনজন সায় দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে মুখ উচ্চ করত উদ্‌গ্রীব হইয়া বক্তৃতা শোনার সময়তে ফিসফিস গলায় কহিতে লাগিল, যে আমরা যখন জল খাইতে যাই দেখিলাম, তিন-চারটি মেয়ে এক কাট্টা হইয়া…।

বালিকারা পাখীদের মত গ্রীবা আন্দোলন করত কথাতে উন্মত্ত রহিয়াছে, একজন পুতুলটি নিবিড়ভাবে দেখিতে থাকিয়া চুম্বন সহকারে বলিল কি মিষ্টি ভাই, ইহার পর আপন হস্তের ফিকে রুমাল পুতুলকে পরাইয়া সকলকে প্রদর্শিয়া কহিল—দেখ এখন কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! আর আর মেয়েরা সকলে দেখিল কি সুন্দর, লাভলি, ঈস খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে কি মিষ্টি! ইহা প্রায় নাচিতে থাকিয়া ঘোষণা করিল এবং যে ইহাও যে কি নিষ্ঠুর ইহাকে ঐ মৃতদের মধ্যে রাখিয়াছিল, কি নিষ্ঠুর! কি ভাগ্যবতী তুই ভাই! সত্য কি ভাগ্যবতী। আমি কখনও উহারে মানে সকল সময়ে উহারে বুকে রাখিব, এক মুহূর্ত্ত ছাড়িব না, একটু বড় হইলে মানে পরে উহার বিবাহ দিব গায়-হলুদ লাঞ্চে তোমরা আসিবে। আমার মা না তাহার পুতুলের বিবাহ দিয়াছিলেন, খুব ছোট ছোট লুচি হয় পুতুলের বিবাহের লুচি, আমি কখনও উহাকে ছাড়িয়া থাকিব না—ইহাতে সকলে খুব উল্লসিত হইয়াছে এক চমৎকার সমাজবন্ধন খেলায় আহ্লাদিত; আমরা বলিব যে ভাগ্যবতী তাহাতে এখন অন্যমনস্কতা আসা উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু সে অল্পবয়সী তাই আসে নাই; কালিম্পঙে পিতার সহিত ভ্রমণের সময় এক ভদ্রলোকের বাগানের অনেক ফুলের মধ্যে অপূর্ব্ব এক প্রস্ফুটিত ফুল দেখে ইহা ক্রিসেনথিমাম বা গোলাপ, বালিকা বড়ই আকৃষ্ট হইল, ফুলটি যাচ্ঞা করিল গৃহস্বামী বালিকাকে ফুলটি উপহার দিলেন। ফুলপ্রাপ্তিতে সে উন্মাদ হইল, পিতা এবং গৃহস্বামী দুইজনে স্বীকার করিলেন বালিকাটি ফুল ভালবাসে—যে এবং গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সে এ হাত অন্য হাত করিল, আরবার বলিল, কি সুন্দর, প্রায় পথই নৃত্যপদক্ষেপে চলিতেছিল, এক সময় কখনও যে উহা ভার হইল, ঐ রম্য বন্ধন জগদ্দল হইল তাহা সে অজ্ঞাত, সে ফুলটি আর উঁচু করিয়া ধরিয়া নাই, পিতাকে অনুরোধ করিল, ইহা তুমি রাখ; পিতা উত্তর দিলেন আমার হাতে ছড়ি, পাইপ, দূরবীন, কুকুরের চেইন, তুমি রাখ, সুন্দর ফুল! কন্যা অনুজ্ঞাতে কহিল আমি আর বহিতে পারি না। অন্যমনস্ক ভাবে পিতা বলিয়াছিলেন, আমি পারিব না। তাহা শ্রবণে কন্যা কহিল, তবে ফেলিয়া দি। পিতা উত্তর দিলেন, সে তোমার ইচ্ছা। তখনই বালিকা উহা ফেলিয়া দিল, নিশ্চয় ঐ ফুল বক্র বা সরলরেখা ধরিয়া পড়ে নাই, জিগজাগ

ভাবে পতিত হয়, অজস্র যুক্তির গায়ে আঘাতের দরুণই তাহা ঘটে। এবং সে ফুলটি ফেলিয়া দিয়াছিল, আমার ধারণায় বালিকা পরক্ষণে মরিয়াছিল, বাস্তবতায় তাহার অংশ নাই—কি অনাসক্ত! এখন সে সগর্ব্বে কহিল আমি ম্যাজিক জানি; সে বলিল মৃতশিশু আমার হাতের যাদু আছে এখন ইহা সজীব ইহার বিবাহ দিব—তোমরা সকলে প্রথম টারমিনালের পর আসিবে, আমি উহাদের (অন্য দলীয়দের) গায়ে হলুদ লাঞ্চে বলিব না···কি সুন্দর কি সুন্দর!

যে বালকের মুখে জল এখনও শুকায় নাই যে বালক বাবাকে, বাপী সম্বোধন করে, সে বলিল, মেয়েরা চুরি করে আমি জানিতাম না! আশ্চর্য্য! সেই চারজনের মধ্যে একজন কহিল, তুমি বলিলে না যে উহারা পুতুলটির বিবাহ দিবে?

তাহা আমি শুনি নাই—

বিবাহ! তাহলে, ভাল বেশ ত, একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

প্রত্যক্ষদর্শী, যে সাধু হইতে চাহে নাই সে মহাভ্রমে পড়িল, সেই ভ্রম নিশ্চয়ই যাহা এই সকল পদ প্রসূত যে মৃত্যুর হার, শিশু মৃতশিশুসকল পুতুল-বিবাহ! সে নিশ্চয়ই যখন নাসিকা কুঞ্চিত করে গলিত গন্ধে তখন ধ্রুবজ্ঞান হয় যে উহারা মৃত উহারা ভূত হইতে পারে। যদি এই দৃশ্য, ঐ চারজন বালকদের দর্শনের সৌভাগ্য হইত, যাহা এই হয় যে ঐ বালিকারা অভাবনীয় এক ঘুমপাড়ানী গীত গাহিতে আছিল। যে গীত ইহা: আসিয়াছে পরীরা পাখাতে ভর করিয়া, আনন্দে পাতারা কাঁপিতেছে···। এবং ইহা অতীব মৃদু কণ্ঠে, আর যে বালিকা ঐটি অপহরণ করে তাহারই হাতে সেই পুতুল দোল খাইতেছিল, বালিকার ওষ্ঠে ইহা স্ফুট হয়, লক্ষ্মী ঘুমাও, সোনা ঘুমাও! যেমন উহার কোলেতে মানে হাতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই পুতুল এখন যাহার ঘুমের জন্য ঐ গান হয়; এইখানে যদি পার্ক হইত, বা মাঠ হইত তাহা হইলে সুনিশ্চিত যে বালিকারা ঐ মাকে বেড় করিয়া নাচিত, ফলে যে এবং ক্রমে নৃত্যরতদের ঐ স্কুলের ফ্রক্ হাল্কা সিল্ক ফলসা রঙে পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু এখানে অনেক লোক; আজ গভর্নর আসিবেন এখানে শালু সেখানে পাম, লোকের হাতে জলের ঝারী—অদ্য বেবী কম্পিটিশনের প্রাইজ দেওয়া হইবে এই কারণে, মাননীয় গভর্নরের স্ত্রী ঐ পুরস্কার দিবেন, একটি ছোট ওজন 'এ্যাভারী' লেখা টেবিলে আছে। এখন ঐ নৃত্যের ব্যাপার দেখিলেও উহা কহিলে সে আরও উৎক্ষিপ্ত হইত, একে চুরি তাহার উপর ইহা লইয়া সোহাগ, আনন্দ! আরও মরীয়া হইত যদি শুনিত যে চোর যখন উত্তর করিল, মা যদি

জিজ্ঞাসা করেন বলিব গভর্নর আমারে দিয়াছেন। অন্য বালিকা ত্রস্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, জানিতে চাহিল, বল না কি বলবি? বালিকা, পুতুলটি এখন যাহার চোখ বুজাইয়া কহিল, বলিব তুই প্রেজেণ্ট করিয়াছিস! ভাগ্যে বালকেরা এই কথাবার্ত্তা শুনে নাই! টিটেনাসের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে, হুইসিল বাজিল, এবং কড়া মেজাজে ঘোষণা হইল লাইন কর, যাহারা নিজের গাড়ীতে যাইবে, যাহারা ট্রাম! ফলে ট্রামে মাত্র চার পাঁচজন, ইহাদের প্রায় তিনজন ট্রাম ভ্রমণের লোভে বাড়ির গাড়ী মানা করিয়াছে। শিক্ষক আজ্ঞা করিলেন, এখন লাইন ধরিয়া চল, যে এবং শিক্ষক, যাহারা গাড়ীতে যায়, তাহাদের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন, এখানে তাহারা রহিল যাহারা ট্রামে যাইবে, সহসা এমত সময়ে যে বালক বালিকাদের আতিশয্য দেখিয়া থাকে, সে প্রকাশিল, ঐ যে সেই বালিকা! যে পুতুল লইয়াছে।

ঐটি ত রোলস নহে, ডেমলার, হ্যাঁ ডেমলার! বালিকা কি ফেলিল, দেখ দেখ! চকলেট-মোড়ক!

তাহা ত উড়িত; সাদা! নিশ্চয় সেই পুতুল! যাইব? মহাশয় ত নাই, যাইব! বালক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল, মুখচোখ রক্তবর্ণ এতবড় অপরাধ ঘটিতে পারে তাহা কল্পনাতে সে ভাবে নাই হাত খুলিয়া প্রদর্শিল কি অনুপস্থিতত্ব! এক পুতুল। অন্যান্যরা পরস্পর বলিতে লাগিল, কি নোংরা, কি ঘৃণ্য, কি নিষ্ঠুর—সত্যি কি সুন্দর! বেচারী! অতঃপর হতাশায় এমনভাবে ভ্রূ-কুঞ্চিত হয় দু একের যে বালিকা যেমন মরিয়া গিয়াছে। যে বালক রোজ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নকথা বর্ণনা করিয়া থাকে যে সে বিকল হইয়া আছে।

শিক্ষক ফিরিতেই উহারা লাইন ভাঙ্গিয়া রুদ্ধশ্বাসে ভাঙা ভাঙা সব তত্ত্ব দিতে আরম্ভিল, প্রস্তাব ছিল—ঐটি মৃতদের মধ্যের একটিকে ফিরত দিয়া আসিব কিনা, শিক্ষক হাতে হাত মুড়িয়া সব শুনিবার পর, হুইসিল বাজাইলেন, লাইন কর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও মৃত শিশুকে…ত্বরা কর।